...গ্রন্থাবলী।

...ভাগ।

...বিশ্বাস প্রণীত।

...ED BY
...AS & BROTHERS.
...d, *Baghbazar*; *Calcutta.*

...াল।

মূল্য ২৲ টাকা।

PRINTED BY G. C. LAHIRI AT THE "POORAN PRESS."
21, Baloram Ghose's Street,
CALCUTTA.

উৎসর্গপত্র।

—০:০:০—

অনারেবল

শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কাপুর

বাহাদুর শ্রীকরকমলেষু।

রাজন্,

আপনার অকৃত্রিম স্নেহযত্নে আমি চিরদিনই মুগ্ধ, তাই আজি আন্তরিক প্রীতি ও ভক্তির উপহার স্বরূপ এই গ্রন্থখানি আপনার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম। আশা করি, এখানিকেও স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আমায় সুখী করিবেন।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস।

সূচীপত্র।

প্রচার নির্দ্দেশ।

১। পরলোক। ইহা এই প্রথম প্রকাশিত হইল।

২। রাঙ্গা-বৌ। ইহারও প্রথম প্রচার।

৩। নৈশবিহার। ইহা প্রথমে সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়। তাহার পর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া সার্ এস্‌লী ইডেন বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্‌টনেণ্ট গভর্ণরকে, উপহার প্রদত্ত হয়। তাহার পর ইহার আরও দুইটী সংস্করণ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এইবার ইহা পঞ্চমবার প্রকাশিত হইল।

৪। কমলকুমারী। ইহা প্রথমে "আদরিণী" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহার্ পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইবার ইহা পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত আকারে তৃতীয়বার প্রকাশিত হইল।

৫। চঞ্চলা। পূর্ব্বে ইহা একটী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সুতরাং এইবার ইহা দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইল।

৬। নারী-সঙ্গীত। ইহা প্রথমে "আদরিণীতে" প্রকাশিত হয়, পরে পূর্ব্ব প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এবার পরিবর্ত্তিত আকারে তৃতীয়বার প্রকাশিত হইল।

৭। রমণী। ইহা প্রথমে "আদরিণীতে" প্রকাশিত হয়, তদ্‌পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তাহার পর পূর্ব্ব প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবার ইহার চতুর্থ প্রচার হইল।

তারকনাথ-গ্রন্থাবলী।

দ্বিতীয় ভাগ।

পরলোক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আত্ম-পরিচয়।

আমার নাম অক্ষয় কুমার বসু, পিতার নাম ৺ রামধন বসু, নিবাস [illegible]িকাতা। আমি ধনী-সন্তান। পিতা প্রচুর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া [illegible]লোক গমন করিলে, আমরা তিন সহোদরে তুল্যাংশে সেই সমস্ত বিষয় [illegible]ভবের উত্তরাধিকারী হই। আমার ভাই গুলি ভাইয়ের মত ভাই,—আজ[illegible]াল সাধারণতঃ যেমন ভাই ভাই দেখিতে পাই,—তেমন নয়। বড়র নাম [illegible]াধাবিনোদ এবং কনিষ্ঠের নাম নিত্যানন্দ। আমরা প্রত্যেকে পাঁচ বৎসরের ছোট বড়। নিত্যানন্দের কোলে প্রাণপ্রতিমা সহোদরা, নাম—গোলাপসুন্দরী।

আমার ভাই দুটী দিব্য শ্রীসম্পন্ন, গোলাপ—পরমা সুন্দরী; কিন্তু আমি আবার সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্। ঘরে বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী কুসুমকুমারী, দুইটী পুত্র প্রবোধ ও সুশীল এবং ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া ও তাহাদের সন্তান সন্ততি প্রভৃতি বর্ত্তমান। বাটীটী প্রকাণ্ড, দাস দাসী অপর্য্যাপ্ত। গাড়ী ঘোড়া সকলি আছে। অর্থের অভাব নাই;—আত্মীয়েরও অভাব নাই,—প্রাণাধিকা স্ত্রীর স্নেহ, যত্ন, ভালবাসার অবধি নাই। আজকাল যার তার মুখে শুনিতে পাই যে "আমার স্ত্রীর মত স্ত্রী আর নাই" এ কথায় চিরকালই আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে। ভাবি, তবে কি আমার স্ত্রীর মত স্ত্রীও অপরের আছে নাকি? বস্তুতঃ বলিতে কি, আমার বিশ্বাস, আমার কুসুমের মত স্ত্রী আর কাহারও নাই।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী,—এম, এ, পাস করিয়াছি। আইনেরও পাস দিয়াছি, কিন্তু এমন অভাব নাই যে দশটার সময় ভাত খাইয়া তাড়াতাড়ি আদালতে যাই; অনিচ্ছায় হাকিম বাবুদের মন যোগাই, মনে যাহাকে হয় ত ঘৃণা করি, মুখে তাহার প্রশংসা করি; তাই ওকালতি করি নাই। নিজেদের বিষয় বিভব যথেষ্ট, ঈশ্বরেচ্ছায় তাহারই তত্ত্বাবধান করিতে সময় কুলায় না।

ছেলে দুটীর প্রতি আমার বড়ই স্নেহ। তাহাদের এক দণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারি না। তাহারাও অবিরত "বাবা বাবা" করিয়া কাছে ঘোরে। আহা, যাঁর পুত্র নাই, তাঁর জীবন কি অসার? যাঁহার স্নেহময় পুত্র বর্ত্তমান, তাঁহার সুখের বুঝি অবধি নাই।

হৃদয়ে দাগাও পাইয়াছি। অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়াছি,—গোলাপের কোলের ভাইটী নাই। আমার তৃতীয় পুত্রটীও নাই। এক একটী শোকে হৃদয় চুরমার হইয়া গিয়াছে। সংসার অসার বলিয়া বোধ হইয়াছে। হায়, কত পাপে লোকে যম-যন্ত্রণা সহ্য করে? বস্তুতঃ সংসারে চিরসুখ নাই। পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রের চক্ষে বারিধারা বহিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকে যদুবংশের ধ্বংস দেখি হইয়াছে,—মনুষ্য কোন্ ছার! যাহাই হউক সে সকল যন্ত্রণা কথঞ্চিত বিস্ম হইয়া আমি এখন ঘোর সংসারী। শুধু সংসারী নয়—মহাসুখী। মাতার য প্রিয়তমার প্রেম, পুত্রের ভক্তি, আত্মীয় স্বজনের ভালবাসা, অর্থের সাচ্ছল আমার মত কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? সেজন্য ঈশ্বরের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ এমন দিন নাই, যেদিন আমার সুখ সম্পত্তির জন্য বিশ্ব-স্রষ্টার নিকট আন্ত রিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বিরত হই। জগতে তিনিই ধন্য;—আর ধন্য,—যিনি তাঁহাতে অনুরক্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রোগ।

একদিন রাত্রে আহারান্তে শয়ন করিয়া আছি,—পার্শ্বে প্রাণাধিকা পত্নী; এমন সময় সহসা ভেদ বমি আরম্ভ হইল। রাত্রে কিছু বেশী পরিমাণে গ্র্যাম্‌ফেড্ মাটন্ খাইয়াছিলাম, মনে হইল সেইজন্য এরূপ হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ এক ফোঁটা পাল্‌স্‌টীলা খাইয়া ডাক্তার ডাকতে পাঠাইলাম। ডাক্তারে বাটী ভরিয়া গেল; ঔষধের পর ঔষধ চালাইতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফল

দর্শিল না। ক্রমে আত্মীয় স্বজনের উৎকণ্ঠা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। আমিও বুঝিলাম গতিক ভাল নয়। আহা, তখন সেই শিশু সন্তান দুটীর বিশুষ্ক মুখমণ্ডল, সেই ছল ছল নলিন নয়ন, সেই কাতর ভাব দেখিয়া প্রাণ বড়ই বিচলিত হইল। শয্যা পার্শ্বে প্রাণাধিকা স্ত্রী উপবিষ্টা, সে মুখের মলিন ভাব আমি কেমন করিয়া বুঝাইব? সে হৃদয়ের উৎকণ্ঠা আমি কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? সে মুখভাব দেখিয়া হৃদয় যেন কেমন করিয়া উঠিল। শিয়রদেশে বৃদ্ধা জননী, আমার যে আর কথা বাহির হয় না, সে বিশুষ্ক বদনের ভাব কে বুঝে? সে হৃদয়ের যাতনা কে অনুভব করিতে পারে? মার কাতরতা দেখিয়া বড়ই অস্থির হইলাম, ভাবিলাম "মা এইজন্যই তুমি স্বর্গাদপী গরিয়সী!" সকলকে আশ্বাস বাক্যে সাধ্যমত তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। মা পাগলিনীর মত অধীরা হইলেন। চক্ষু স্থির,—সঘন নিশ্বাস,—বিশুষ্ক অধর,—আলুথালু কেশ;—মার আমার আজি একি ভাব! হায় মা, তোমার এ যাতনা যে আর আমি দেখিতে পারি না। আমার মৃত্যু-যাতনা ইহার নিকট তুচ্ছ, কিন্তু উপায় নাই,—আমার যে সাধ্যের অতীত। চক্ষু জলে ভরিয়া গেল,—প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল, মার দিকে আর চাহিতে পারিলাম না। কেবল ভাবিতে লাগিলাম "মা মর্ত্ত্যধামে তোমা হেন স্বর্গ বর্ত্তমান থাকিতে আমি কোথা যাই মা?"

ক্রমে আমার অবস্থা আরও মন্দ হইয়া উঠিল। শক্তি হ্রাস হইয়া আসিল, জ্ঞানও লোপ পাইতে লাগিল। তখন মনে বড় ভয় হইল। এ দেহ হইতে যে আমার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইবে, তাহাত কখন ভাবি নাই। চিরকাল ভাবিয়াছি—আমি অজর, অমর! কিন্তু আজ একি? আমি যে আমার সাধের, অতি সাধের সংসার ছাড়িয়া যাইবার মহা উদ্যোগ করিতেছি! হা ভগবান একি? আমি যে বড় সুখী, আমি যে অতি কোমল দেহ লইয়া সংসারে জন্মিয়াছি, আমারও মৃত্যু? মা সাম্‌নে বসিয়া না খাওয়াইলে যে আমার উদরের তৃপ্তি হয় না, পত্নীর যত্ন ভিন্ন আর কিছুতে যে মন উঠে না। সন্তানের সেই আধ আধ কথা ভিন্ন আর কিছুতেই যে আমার প্রাণ গলিয়া যায় না। আমি যে এক দিনও একাকী কোথাও থাকিতে পারি না। ভগবান, তুমি সেই আমায়, কোথায়—কোন অনির্দ্দিষ্ট মহাদেশে লইয়া যাইতেছ। আমি সেখানে একাকী কি করিয়া থাকিব দেব?

আর ভাবিতে পারি না। মায়া পাশ ছেদনের এত যন্ত্রণা? এক দণ্ডে, এক

মুহূর্ত্তে আমার আমিত্ব ঘুচিবে,—ইহ জীবনের মত সমস্তই ফুরাইবে; তবু চিন্তার নিবৃত্তি নাই কেন ?

তখন মনে হইল,—"বিদ্যুচ্চলং কিং ?—ধন যৌবনায়ু।" * তবে মরিতেই ত হইবে, তবে এত ভয় কেন ? সেই ত সেই সৌম্যমূর্ত্তি পিতৃদেবকে মরিতে দেখিয়াছি। সেই ত প্রাণাধিক কনিষ্ঠ সহোদরের মৃত্যু দেখিয়াছি। আহা তাহার উপর আবার প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃত্যুও স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সে সকল অতি কোমল, অতি পবিত্রও যখন দেহ ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তখন আমি কোন্ ছার, যে মরিতে পারিব না ?

এমন সময় স্পষ্ট দেখিলাম যেন পিতৃদেব আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান! আমি "বাবা—বাবা" বলিয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিলাম।

জননী শিয়র দেশ হইতে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া আমার বাম দিকে দাঁড়াইলেন। আমার বুকটীতে সস্নেহে হাত দিয়া বলিলেন "অক্ষয়, অমন কর কেন বাবা ?"

আমি আর সে কথা শুনিব কেন ? যে মূর্ত্তি আজ বিংশতি বৎসর দেখি নাই। যে মূর্ত্তি একবার দেখিবার জন্য কত লালায়িত হইয়াছি, যাঁহাকে দেখিবার জন্য কতবার উদাস প্রাণে আকাশের দিকে চাহিয়াছি, ঘোর অন্ধকারে খুঁজিয়াছি, কিন্তু কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই;—আজ আমার সম্মুখে সেই মূর্ত্তি! যে মূর্ত্তি দেখিতে নয়ন পলকহীন হয়, যে মূর্ত্তি হৃদয়ে অর্চ্চনা করি, যে মূর্ত্তি আমার জগৎ মাঝে প্রত্যক্ষ দেব-স্বরূপ, আজি সেই মূর্ত্তি আমার নয়ন সম্মুখে দণ্ডায়মান! আমি আর অন্য কথা শুনিব কেন ?

আমি ভাবিলাম "আর কেন, আর ভয় কি, আমিত আর একা নই। এইত আমার সুখ দুঃখের নিয়ন্তা, কর্ম্মফলের বিচারপতি, নরনারায়ণ! আমি চক্ষু বুজিয়া, ঐ পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া, আমার অহিক পারত্রিকের মঙ্গলসাধন করি না কেন ? তাহার এইত সময়,—মনে হইল—

"উপস্থিতে প্রাণ হরে কৃতান্তে কিমাশু কার্য্যং সুধিয়া প্রযত্নাৎ ?
বাক্‌কায়চিত্তৈঃ সুখদং যমঘ্নমীশস্য পাদাম্বুজমেব চিন্ত্যম্॥" †

---

* বিদ্যুতের মত ক্ষণস্থায়ী কি ?—ধন, যৌবন ও পরমায়ু।

† মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে সেই অনন্ত সুখের আকর স্বরূপ, শমন-দমন জগদীশ্বরের পাদপদ্ম ধ্যান করা উচিত।

তখন সেই ভগবৎ বাক্য গীতার কথা মনে আসিল।—মুক্তির কি সহজ উপায়!—এ অন্তিমে একবার বিষয় চিন্তা ভুলিয়া নিবিষ্ট চিত্তে তাঁহাকে চিন্তা করিলে তাহার যম-যাতনা ঘুচিয়া যায়। আমিত জন্মের মত যাইতেছি। হায়, তবুকি এ সময় সংসার চিন্তা হইতে বিরত হইয়া একবার—এক মুহূর্ত্তের জন্যও একাগ্র চিত্তে সেই অনাথনাথের চিন্তা করিতে পারিব না?

আমি কাতর কণ্ঠে বলিলাম "বাবা, এতদিন কি করে ভুলেছিলেন?"

মার দেহে আর প্রাণ নাই, বলিলেন "অক্ষয়, ও কি কথা?"

আমি। কেন মা অমন কথা বল, ঐ যে বাবা।

মা। কোথায়?

আমি। আমার সাম্‌নে, তুমি দেখ্‌তে পাচ্চ না মা, ঐ যে বাবা মৃদু হাস্‌চেন, আমাকে ডাক্‌চেন।

তখন দেখিলাম বাবার হাত ধরে আমার ছোট ছেলেটী আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। তাহার নাম ছিল বসন্ত। আমি বলিলাম "মা, দেখ দেখ আমার সাধের বসন্ত, বাবার হাত ধরে আমার দিকে চেয়ে হাস্‌চে।"

মা তখন আছাড় খাইয়া পড়িলেন, ভগ্নী গোলাপ ও কনিষ্ঠ ভাই আসিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, আমি সে সব বেশ স্পষ্ট বুঝিলাম। তাঁহারা বলিলেন "রোগীর সাম্‌নে অমন করে কাঁদ্‌তে নেই।" বুঝিলাম, আমার অবস্থা বড় খারাপ। আমিও ত এমনি সময়ে এই কথা কত লোককে বলিয়াছি! পত্নী কুসুম আমার দিকে চাহিয়া নয়নজলে বক্ষ ভাসাইতেছিলেন, কিন্তু আমার আর অন্য কথা নাই; আমি বাবার সঙ্গে, আমার বসন্তর সঙ্গে, কথা কহিতে লাগিলাম। ক্রমে দেহ আরও ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, হাত পা অবশ হইতে লাগিল, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি রহিত হইতে আরম্ভ হইল। মনে হইল, এতদিনে আমার দেহ প্রকৃত বিশ্রাম লাভ করিতেছে। এ বিশ্রাম ত নিদ্রায় নাই। নিদ্রায় স্বপ্ন আছে, কিন্তু ইহাতে ত তাহা নাই,—এ যে প্রগাঢ় বিশ্রাম!

তখন একটী কান্না গোল আমার কাণে গেল। স্পষ্ট বুঝিলাম সকলে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর কেহ কাহারও কথা শুনে না। প্রবোধ ও সুশীল কাতর কণ্ঠে "বাবা বাবা" বলিয়া ডাকিতেছে। ইচ্ছা, উত্তর দি, কিন্তু পারিতেছি না। তখন স্ত্রী—"ওগো তুমি আমার কি কর্‌লে গো" বলিয়া চিৎকার করিয়া আমার পদতলে আছাড় খাইয়া পড়িলেন, কখন পালঙ্কে

মাথা কুটিতে লাগিলেন। সন্তান দ্বয় দুঃখের উপর নূতন দুঃখের অবসান মানসে তাহাদের জননীকে ধরিল। ভগ্নী মাকে ধরিল, সে এক ভীষণ ব্যাপার! আমি তখন ভগবানের চিন্তা ভুলিয়া আবার ভাবিতেছি "হায়, আমায় কি সত্যই এসব ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মৃত্যু।

প্রাণের ভিতর তখন যেন কেমন এক প্রকার গোলমাল হইয়া উঠিল, নিশ্বাসটা কেমন যেন পলাইবার চেষ্টায় রহিল। মস্তিষ্ক কেমন বিকৃত ভাব ধারণ করিল। আমি যেন তখন সকল ভুলিলাম, মনে হইল আমার কি যেন কোথায় যাইতেছে, কি যেন হৃদয়ে ছিল না, তাই আসিতেছে। ঐ গেল, আমার সব গেল, কোথা যায় জানি না,—তবু যে যায়!—কি যেন হিমানি রাশি বুকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। মস্তিষ্কের যেন একটি আবরণ ধীরে ধীরে উঠিতেছে,—আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার কি যেন চলিয়া যাইতেছে। মনে হইল প্রাণ যেন কিসের মধ্যে কুণ্ডলিকৃত অবস্থায় ছিল, তাহা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইতেছে। সাংখ্যদর্শনে কোষময় প্রাণের কথা পড়িয়াছিলাম, ভাবিলাম এখন কি সেই সকল ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে। * আর কিছু বুঝিলাম না, আমার চিন্তা বুঝি স্থির হইল, আমার যাহা কিছু ছিল তাহা বুঝি ফুরাইল!—ফুরাইল, কিন্তু আমার আমিত্ব ঘুচিল কি? বস্তুতঃ এই আমিত্বের জন্য আমি ব্যাকুল হইয়া

---

* Dr Barth, a recent writer says :—

"Death is the result of an arrest of cellular nutrition, the protoplasm either becoming incapable of giving rise to the double movement of assimilation and disassimilation, or the medium in which the cells exist undergoing modifications that render exchanges impossible.

The arrest of nutrition is a general phenomenon that is applicable to all creatures. With all it takes place by one of the two mechanismas indicated above, but in the higher organisms it is produced in more and more complex conditions, corresponding to the increasing complexity of the apparatus charged with keeping up the activity of the protoplasm and with the renovation of the organic environment.

উঠিয়াছি, আমি যে সংসারের একজন, সে "আমি" কোথায় যাইব? আমার বাল্যকালের অতি যত্নের শিক্ষা দীক্ষায় শোভাময় যে আমি সে "আমি" কি করিয়া হারাইব? যৌবনে প্রিয়তমার প্রেমরসে যে হৃদয় অমিয় ধারায় সিক্ত করিয়া রাখিয়াছি, তাহার কি হইবে? তাহার উপর ছেলেরা "বাবা" বই যে জানে না, ভগিনী দাদা বলিতে যে পাগলিনী। আমার মুখ দেখিলে যে ভ্রাতাদের স্নেহ উৎস উথলিয়া উঠে, তাহার উপর কথা—বৃদ্ধা জননীর কি হইবে, এ বয়সে পুত্র শোক! অহো কি পরিতাপ! এত সুখ, এত অর্থ-সাচ্ছল্য সাত্ত্বেও যে আমার আমিত্ব ঘুচিয়া যায়? পৃথিবী ঘুরিতেছে, দিনের পর দিন ঘুরিতেছে, চন্দ্র, সূর্য্য ঘুরিতেছে—আর ঘুরিতেছে আকাশের নক্ষত্র-মালা। যাহা ঘুরিয়া যায়, তাহা আবার ঘুরিতে পারে; কিন্তু জীবন গেলে তাহা আর বুঝি ঘুরে না! তাই বলি "কম্মাদ্ভয় মিহ?—মরণাৎ।" *

সহসা আমার ঘুম যেন ভাঙ্গিয়া গেল, সে সকল চিন্তাও যেন থামিয়া গেল। দেখিলাম, আমার দেহের পার্শ্বে আমি দাঁড়াইয়া আছি। দেখিলাম, আমার দেহ যেন অতি ক্ষুদ্র আকার ধারণ করিয়াছে। অতি ক্ষুদ্র চীনের পুতুল যেমন, আমি তেমনি হইয়াছি। অঙ্গে বস্ত্র নাই, সঙ্গে অর্থ নাই,—দাস দাসী নাই, অথচ আমি রহিয়াছি। পূর্ব্বে ভাবিতাম মরিতে না জানি কত কষ্ট, কত যাতনা, কিন্তু এখন দেখি তাহা নয়। আমার চিত্ত যেন শান্তিময়। আমি তখন ধীরে ধীরে, অতি ধীরে কিছু উর্দ্ধে উঠিলাম, যেন গৃহের ছাদে গিয়া ঠেকিলাম। দেখিলাম, আমার সেই পূর্ব্ব দেহের পা দুখানি ধরিয়া আমার প্রাণের প্রবোধ ও সুশীল রোরুদ্যমান। স্ত্রী কখন আমার সেই প্রাণ শূন্য কায়ার বুকে মাথা রাখিয়া, কখন বা আছাড় খাইয়া কাঁদিতেছেন, লোকলজ্জা নাই—বাহ্যজ্ঞান নাই; কিন্তু মার আমার আর সংজ্ঞা নাই। ভগ্নী মাকে অন্যত্র লইয়া যাইতে ব্যস্ত, সে ঘরে থাকিলে ব্যাধি হইতে পারে এই ভয় যেন বড় বেশী। আপন পুত্রদের সে দিকে আসিতে দিতেছেন না। কেহ দ্বারে কৌতূহল পরবশ হইয়া উঁকি মারিলে, সেই রোদনশীলা ভগ্নী তাহাদিগকে চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভ্রূকুটী করিতেছেন, সেথান হইতে ইঙ্গিতে যাইতে বলিতেছেন। ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়াদেরও তাই।—কেবল মার বিকার নাই,—পুত্রদের বিকার নাই,—আর দেখিলাম বিকার নাই—কুসুমের।

---

* জগতে লোকে মৃত্যুকেই মহাভয় করিয়া থাকে।

তখন মনে বড় হাসি পাইল। হাসিলামও, কিন্তু তখনি আবার স্ত্রী, পুত্র, জননীর কাতরতা দেখিয়া মন কেমন করিয়া উঠিল। মনে হইল—ঐত সেই আমি, উহার মধ্যে কি আর যাওয়া যায় না? মৃত দেহের আশে পাশে ঘুরিলাম, কিন্তু কই আর তাহার মধ্যে ত প্রবেশ করিতে পারিলাম না! তখন পুত্রদের মাথায় হাত বুলাইলাম, জননীর চরণ ধুলি লইলাম, প্রিয়তমার মুখ চুম্বন করিলাম, বলিলাম "এই যে আমি।" কিন্তু কেহই কিছু অনুভব করিতে পারিলেন না। ক্রমে আমার সেই অতি সাধের দেহ উঠাইল, সৎকার করিতে লইয়া চলিল, চিৎকার ধ্বনি আরও প্রবল হইল। তখন আমার মন যে কি করিতে লাগিল, তাহা কি করিয়া বুঝাইব? আমার এত সাধের দেহ, যে দেহে একটী কণ্টক বিদ্ধ হইলে যন্ত্রণায় অধীর হইতাম। যে দেহ কত সাধে সাজাইতাম। যে রসনা কত তৃপ্তিকর দ্রব্য আহার করিত,—আর সকলের উপর দুঃখ—যে দেহ আলিঙ্গন করিয়া প্রিয়তমা অনন্ত সুখ অনুভব করিতেন, সে দেহ আমার কঠিন কাষ্ঠে দগ্ধ হইবে। ইহা ভাবিতেও প্রাণ কেমন করিতে লাগিল।

তখন দেহ গৃহের বাহির হইল, দেখিলাম সে দেহ স্পর্শ করিতেও আজি সকলে কত অনিচ্ছুক। ভাবিলাম সত্য বটে যে—

"যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে
কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে।
গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে
ভার্য্যা বিভেতি তস্মিন কায়ে॥" *

হায়, হায়, ঐ দেহের আবার গর্ব্ব করিয়াছিলাম? উহা যে নিমতলায় চিতানলে ভস্মীভূত হইতে চলিল। আমার বলিতে সংসারে যে নিদর্শন ছিল তাহা এতদিনে ফুরাইল! আমার এ দেহ আর কে দেখিবে, কে আর তাহাকে চিনিবে, আমার কথা আর কে শুনিবে?

দেয়ালে আমার একটী ফটোগ্রাফ ঝুলিতেছিল। স্থিরদৃষ্টে তৎপ্রতি অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম, তাহার পর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম "ঐ আমি—আর এই আমি!"

---

* যতদিন লোকে জীবিত থাকে, ততদিন সকলেই কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, কিন্তু যখন প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়, তখন অন্যের কথা দূরে থাকুক, নিজের প্রিয়তমা ভার্য্যাও সেই মৃতদেহ দেখিয়া ভীত হন।

অনেকক্ষণ ঐ চিন্তায় মগ্ন রহিলাম, তাহার পর ভাবিলাম, "যাই না—একবার নিমতলায় যাই না,—আমার কি হইতেছে, একবার দেখিয়া আসি না।" তখন মনে হইল "সেই মহাশ্মশানে দিন দিন লক্ষ লক্ষ প্রাণীর যাহা হয় তাহাই হইতেছে, তাহার আর দেখিব কি? আমি এক দিন অপরের যে অবস্থা দেখিয়াছি, অপরে আজি আমার সেই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতেছে, আবার পরিণামে তাহাদেরও সেই অবস্থা ঘটিবে।" কিন্তু মন মানিল না। একবার, এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার সেই সাধের দেহ দেখিবার ইচ্ছা বড় বলবতী হইল। আমি সেই মহাশ্মশানে, সেই ইহজীবনের শেষ পথের নিকট উপস্থিত হইলাম, কিন্তু হায় যাহা দেখিতে আসিলাম তাহাত দেখিতে পাইলাম না। তাহা তখন চিতানলে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে—ধূমরাশি উর্দ্ধে উঠিতেছে, তাহার আর দেখিব কি? এ দৃশ্যে ত নূতনত্ব নাই। তখন ভক্তিভরে একবার সেই পতিতপাবনী জাহ্নবীকে প্রণাম করিলাম, বলিলাম "মা, আমার দশায় কি হবে মা?" কিন্তু দেখিলাম তরঙ্গিণী তেমনি রঙ্গসহ ক্রীড়োন্মত্তা,—বায়ু হিল্লোলে তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা মার সুবিস্তৃত বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে—তেমনি দাঁড় ফেলিয়া নৌকা চলিতেছে,—সকলই তেমনি আছে, নাই কেবল আমি! প্রাণ বড়ই উদাস হইল। এই সসাগরা পৃথিবীতে আমি একা এমনি ছুটাছুটি করিব,—কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে পাইব না, একি কম যাতনা! ভগবান, তবে এই কি নরক যাতনা। দেব, ইহা হইতে কি আর অব্যাহতি পাইব না?

মরিবার পূর্ব্বে পিতা পুত্রকে দেখিয়াছিলাম, এখন তাঁহাদের কত খুঁজিলাম, কিন্তু কই তাঁহারা? কেহ ত নাই, হায় হায় জীবনে মরণে যাতনা! সেই চন্দ্র! সূর্য্য, সেই নক্ষত্র নদ নদী কোলাহল-পূর্ণ ধরিত্রী, সকলই বর্ত্তমান। কিন্তু হায় আমি আজ সংসারে একা! তখন ভাবিলাম কত মানুষ যে দিন দিন মরিতেছে তাহারা যায় কোথায়?

কোথা যায় তাহা কেমন করিয়া বলিব?—আমি যে আমি, এখনও সেই আমি, সেই ভালবাসা সেই আকাঙ্ক্ষা সেই সব বর্ত্তমান, কিন্তু আমি একা!

আমি আবার বাটীতে ফিরিলাম। সংসারের সকল সুখ হইতে বঞ্চিত, কিন্তু কই তবু বাটী ছাড়িয়া ত যাইতে পারি না। আমার যে মায়া সেই মায়া রহিয়াছে, তবে আমি একা হইলাম কেন? ওঃ একি যাতনা, আমি সকলকে দেখি, সকলের সঙ্গে কথা কই, কিন্তু আমায় কেহ দেখে না, আমার সঙ্গে কেহ কথা কয় না। তখন ভাবিলাম কি করি কোথায় বিশ্রাম লাভ করি। স্ত্রীর

বক্ষে গিয়া শুইলাম, ভাবিলাম কুসুম, তুমি না বলিতে আমার ছায়া দেখিলে আমায় চিনিতে পার, কিন্তু কই আজ ত আমায় চিনিতেছ না। চেনা দূরে থাক্, আজ সেই স্ত্রীই না বুঝিয়া পাশ ফিরিয়া আমায় ফেলিয়া দেয়। আমার শোকে বুক চাপড়াইয়া আমাকেও বক্ষ হইতে তাড়াইয়া দেয়। মাতৃচরণেও তাই। স্থান ত পাইলাম না, তবে থাকি কোথায়?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আত্তায়ী দেহ।

হায় হায়, এই আমার আত্তায়ী দেহ! যে দেহ কেহ দেখিতে পায় না, কাহাকেও দেখান যায় না, আজ আমার সেই দেহ। তখন মনে হইল দশ পিণ্ড দানের সঙ্গে নাকি এদেহ বিনাশ হইবে? হায় কুসুম, তবে কি এমন করিয়াও আর তোমাদের দেখিতে পাইব না। এমন করিয়া এত ক্লেশ সহিয়াও কি আর যাহাদিগকে ভালবাসি তাহাদের দেখা পাইব না। তবে কি আমার মৃত্যুর উপর আবার মৃত্যু হইবে। মন বড় খারাপ হইল। ভাবিলাম তাই ত বটে—

"পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জাননীজঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষঃ কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥"

তবে আর কেন, কাহার জন্য এত। যাহা হইবার তাহাই হউক, সেই অতি মহানের মহান ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তখন গৃহ হইতে বাহির হইলাম। গমনের ক্ষমতা অসীম। আহারের আবশ্যক নাই, স্নানের প্রয়োজন নাই, এ এক নূতন ভাব। সেই ভাবে বিভোর হইয়া বাহির হইলাম, মনের সাধে কখন উড্ডীয়মান পারাবতে চাপিলাম, কখন ঘুড়িতে শুইলাম, কখন জাহাজের মাস্তুলে, গঙ্গা-তরঙ্গে, টেলিগ্রাফের তারে, সাহেবের টুপিতে, মুসলমানের দাড়িতে, বিবিদের নেক্‌লাসে, কুলকামিনীর খোঁপায়, বসিয়া নাচিয়া গড়াইয়া প্রাণে এক অতুল সুখ পাইলাম। পাখা নাই, কিন্তু বায়ুভরে, কি যেন মনের ইঙ্গিতে যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতেছি। মনে হইল এমন করিয়া মানুষ কেন উড়িতে

* পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু ও গর্ভযন্ত্রণাভোগ করিতে হয়, ইহা সংসারের একটী প্রধান দোষ। হে মানব। এইরূপ ভয়ানক দোষ থাকা সত্ত্বেও সংসারে কিরূপে তোমার সন্তোষ জন্মিয়াছে!

পারে না। পাঠক, ঘুমের ঘোরে যদি কখন স্বপ্নে—বায়ুভরে উড়িয়া থাকেন তবে আমার উড়া কিরূপ তাহা অনুভব করিতে পারিবেন, সে উড়ার বেগ নাই, যেন বায়ুভরে হেলিতে দুলিতে নাচিতে নাচিতে যায়, কিন্তু আমার বেগ অসীম, এক মুহূর্ত্তে যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারি, আমার গতির সঙ্গে দ্রুতগামী মেলট্রেনের গতিরও তুলনা হয় না।

দুই একজন প্রেত-তত্ত্ববিদ নাকি স্বপ্নে এইরূপ উড়িয়া গিয়া প্রকৃতই আপন বন্ধুবান্ধব দেখিয়াছিলেন। * যোগবলে নাকি যেখানে ইচ্ছা যাওয়া যায়। তবে কি আমি যোগ না শিখিয়াও যোগী হইলাম ?

পাশ্চাত্য সভ্যজগতে নাকি প্রেতাত্মার পরিচালনা হয়, সে সকল কেমন কেমন ঠেকিল, কই আমাকে ত কেহ ডাকে না? গোলাপের পদ্যলেখার রোগ,—আমার মৃত্যু সম্বন্ধে শোকসূচক একটী কবিতা লিখিয়া "বামা বোধিনী"তে পাঠাইবার জন্য নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতেছিল। তখন চক্ষে জল নাই—কিন্তু চেষ্টা করিয়া জল আনিয়া মনের গতির পরিবর্ত্তন চেষ্টা করিতেছিল, ভাবিলাম উহার কলম আমিই কেন চালাইয়া দিইনা। এমন ত হয় শুনিয়াছি। † কিন্তু কই পারিলাম না ত? তখন ভাবিলাম তবে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে সে সমস্তই কি কল্পনা? আর কল্পনা না হইলে আজি আমি একা কেন? মৃত্যু মাত্রেই ত আমি সহস্র সহস্র প্রেতদেহীদের মধ্যে বিরাজ করিতাম, ‡ কিন্তু কই তাহার একটীও ত দেখিলাম না।

তখন মনে হইল আমি কি এখন ভূত হইয়াছি, যে ভূতের নামে, মুখে ভূত মানিনা বলিলেও, মনে মনে শিহরিতাম, আমি কি আজি সেই ভূত? মানুষ কি ভ্রান্ত! নতুবা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রকেও কি ভয় করে? ভূতে নাকি ঘাড়ভাঙ্গে, কিন্তু তাহা কি সম্ভব? আমি সহস্র চেষ্টা করিয়া কাহাকে স্পর্শ করিলেও, তাহা ত কেহ অনুভব করিতে পারে না,—আমার দুঃখই ত তাই। §

---

* Read Devis' Harmonia. Vol. I.

† Mr. W. T. Stead, famous editor of "The Review of Reviews" writers :—

"Automatic writing is a writing that is written by the hand of a person who is not under the control of his conscious mind. The hand apparently writes of itself, the person to whom the hand belongs having no knowledge of what is it about to write."

‡ Read "Invisible Helpers" by Mr. Leadbeater.

§ See Letters from Julia page 3.

শুনিয়াছি গঙ্গায় চিতাভস্ম পতিত হইবা মাত্র মনুষ্যের উদ্ধার হয়, তবে আমি ভূত হইব কেন?—আমার ভূত হইবার কথা নয়,—গঙ্গাহীন দেশের লোক মরিয়া ভূত হোগ—লোকের ঘাড় ভাঙ্গুক, কিন্তু আমার ভূত হওয়া অসম্ভব। এ চিন্তায় মনের একটু শান্তি হইল।

আমি মনের আবেগে গড়েরমাঠের উপর উড়িতেছি, পথে অশ্বযানের সহস্র সহস্র আলোক যেন ছুটাছুটী করিতেছে, আকাশে অগণ্য নক্ষত্রমালা নয়ন বিস্ফারিত করিয়া যেন সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। গাছের পাতাগুলি ধীরে ধীরে দুলিতেছে, তাহাতে আবার খদ্যোৎমালার মনোরম শোভা। এ শোভার জগতে সর্ব্বত্রই শোভা। তবে আমরা বুঝি সকল সময়ে তাহা দেখিতে পাই না। দূরে ইডেন্‌গার্ডেনে সামরিক ব্যাণ্ড বাজিতেছে, কখন কখন কান পাতিয়া তাহাই শুনিতেছি, এমন সময় কে আসিয়া আমার অঙ্গ স্পর্শ করিল, আমি চমকিয়া উঠিয়া দেখিলাম আমার প্রিয়বন্ধু করালী বাবু! করালীরও আমারই মত দেহ, মনে বড় আহ্লাদ হইল, হাসিতে হাসিতে ক্ষুদ্র করতল দিয়া করমর্দ্দন করিয়া বলিলাম "তুমি কোথা থেকে?"

করালী। দেশ থেকে।

আমি। মলে কবে?

করালী। আজ ৯ দিন।

আমি। কি সর্ব্বনাশ, তোমারও যে পিণ্ডদানের কাল উপস্থিত।

করালীর সংসারে বড় আনুরক্তি ছিলনা, বলিল "তা হ'লেই বা।"

আমি। এ দেহ ত থাক্‌বে না।

করালী। নাই থাক্‌লো।

আমি। সেকি করালী, সংসারের আত্মীয় স্বজন হয় ত আর দেখ্‌তে পাবে না।

করালী। তাতেই বা দুঃখ কি।

আমি। তোমার মনে কি কষ্ট হচ্চে না?

করালী। কিছুমাত্র না। আর কষ্টের কারণই বা কি?

"কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয় মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥" *

---

* কে তোমার স্ত্রী? কে তোমার পুত্র? এই সংসার অতি অদ্ভুত। তুমিই বা কাহার? কোথা হইতেই বা এই সংসারে আসিয়াছ? ভ্রাতঃ! তুমি এই সমস্ত বিষয় একবার চিন্তা

আমি ত কাঁদিয়া ফেলিলাম, ভাবিলাম তাই ত বটে, তবে এ কথা এতদিন বুঝি নাই কেন?

আমি আর তাহার কোন উত্তর দিলাম না। কেবল ভাবিতে লাগিলাম "তবে ত আমাকেও সকলে ভুলিবে।" কিন্তু আমিও যে ভুলিব তাহা তখনও ভাবিতেছি না। রাত্রে আর বাড়ি গেলাম না। দুই বন্ধুতে মনুমেণ্টের উপর শুইয়া রহিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমরাই কি ভূত?

রাত্রি প্রায় ১টা বাজিল, কলিকাতা এখনও নীরব নয়। দূরে গাড়ি চলিতেছে। দুই একটা সাহেব বাড়িতে পিয়োনো বাজিতেছে। দূর ছাই, এত অশান্তি ভাল লাগিবে কেন?—সুতরাং ঘুম আসিল না। তখন বলিলাম "হাঁ করালী, আমরাই কি ভূত?"

করালী। কি করিয়া বলিব?

আমি। তবে আমরা কি?

করালী। তাহাও জানি না।

আমি। মৃত ব্যক্তির আত্মাই ত প্রেত আত্মা,—তবে আমারই ত ভূত?

করালী। ভূত হইলে ত আগে আমি মনুমেণ্ট ভাঙ্গিতাম, হাইকোর্টটা ফুৎকারে উড়াইতাম, কিন্তু তাহা পারি কই? ভূতের ক্ষমতা যে অসীম। ভূত ইচ্ছামত দেহ ধারণ কর্‌তে পারে, আমরা যদি সেই ভূত হই, তবে তাহা পারি না কেন?

আমি। আমিও ত তাই ভাব্‌চি।

করালী। আমার ভূতে বিশ্বাস ছিল না,—এখনও নাই।

আমি। আচ্ছা, তুমি কখন ভূত দেখেছিলে?

করালী। না,—তুমি?

করিয়া দেখ। স্বপ্নে যেমন অলীক বস্তু সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, ঐন্দ্রজালিকগণ যেমন মায়াবলে অসত্য বস্তুকে সত্যের ন্যায় দেখাইয়া থাকে, জীবগণও মায়াবশে সেইরূপ এই অলীক জগৎকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। অভিনিবিষ্টচিত্তে একটু ভাবিয়া দেখিলেই প্রকৃত তত্ত্ব, অর্থাৎ জগতের অসত্যতা উপলব্ধি হয়।

আমি। আমি ভাই দেখেছি,—তাইত আমি কেবলই আমাদের অবস্থা ভাব্‌চি। তুমি জান যে আমি একবার আগ্রা যাই। সেখানে একটা বাসা ভাড়া নি। বাড়িটীর উপরে গুটিচার কুঠারি, কিন্তু সাম্‌নে মস্ত খোলা ছাত। সে বাসায় গেলে পাড়ার লোক জন বল্‌লে "বাবু বাড়িটেয় ভূত আছে।" আমি ত কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলাম। একদিন দুদিন করে প্রায় চার পাঁচ দিন কেটে গেল, কোন ভয় পেলাম না। আমি যে ঘরে শুতাম, সেটা ছাদের ধারে, আমার ঘরে আর একটী লোক্ থাক্‌তেন। রাত্রি প্রায় ৩টা, জ্যোৎস্না ফুট্‌ফুট্ কর্‌চে,এমন সময় সহসা আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, তখন একবার ছাতে বেড়াতে ইচ্ছা হল। ঘরের লোকটীকে ওঠালাম না, একাকী বাহিরে এলাম। সহসা খোলা ছাদের কোণে দৃষ্টি পড়িল। দেখি যে, একটী পরমা সুন্দরী রমণী। আমি ধীরে ধীরে তাহার নিকটে গেলাম, বলিলাম "তুমি কে?"

উত্তর নাই। রমণীর অধরে মধুর হাসি যেন ক্ষণেক উছলিয়া উঠিয়া আবার নিবিয়া গেল। তখন মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে, উহার কাহারও সহিত বোধ হয় প্রসক্তি আছে, তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমরা যে এখানে আছি তাহা বোধ হয় জানে না। মনে মনে বড় আনন্দ হইল, ভাবিলাম এতদিনে বাড়ীর ভূত ধরা পড়িল।

আমি তখন তাহার আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলাম "বল তুমি কে, নতুবা ছাড়িব না।"

রমণী আবার একটু সরিয়া গেল, কোন উত্তর দিল না; কিন্তু আমি দিব্য চক্ষে সেই কুটিল কটাক্ষ—সেই প্রাণ ভুলানি হাসি দেখিতে পাইলাম। আমি তখন তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিলাম। শেষ ছাদে হাসিতে হাসিতে ছুটাছুটী আরম্ভ হইল। এই ধরি ধরি আর পারি না। এইরূপ কতবারই হইল, শেষ একবার যেন ধরিয়া ফেলি। দেওয়ালের কোণের দিকে আনিয়া ফেলিয়াছি, আর যায় কোথা, গায়ের ওড়নায় যেন হাত ঠেকে ঠেকে, এমন সময় সহসা সেই রমণী-মূর্ত্তি দেয়ালে মিশাইয়া গেলে, আর দেখিতে পাইলাম না! ভয়ে অভিভূত হইয়া চিৎকার করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছাও হইল। সেই পর্য্যন্ত আমার প্রেত যোনিতে বিশ্বাস। তুমি একথার কি উত্তর দাও?

করালী তাহার কোন উত্তর না দিয়া "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিল। শেষে বলিল, "ও সব স্বপ্নের কাজ।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম "স্বপ্ন?"

করালী। তাহা নয় ত কি? রাত্রে লোক বিছানা থেকে উঠে যায়। ইচ্ছামত বেড়ায়, আবার আপন অজ্ঞাতে ঘরে ফিরে এসে ঘুমোয়। জাগ্রত অবস্থায় যে সকল সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়ে চল্‌তে ভয় হয়, সে অবস্থায় সেখান দিয়ে অবলীলাক্রমে চলে যায়, বিন্দুমাত্র ভয় হয় না। একটা রোগ বিশেষ। ইহাকে ইংরাজিতে Somnumbulism বলে। মানুষের এই অবস্থার কত গল্প আছে, তোমারও যে সেইরূপ কোন একটা ঘটনা হয় নি, তার প্রমাণ কি?

আমি তাহার আর কোন উত্তর দিলাম না। ভূত সম্বন্ধে নানা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে শেষে নিদ্রাভিভূত হইলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নূতন ঘটনা।

রাত্রি নানাকথায় অতিবাহিত হওয়ায় অনেক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা হইল, উঠিবামাত্র গা কেমন টল্ টল্ করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। উভয়েই ভয় পাইলাম, মনে হইল আবার বুঝি সেই ভূমিকম্প! ছুটীয়া মনুমেণ্ট ত্যাগ করিয়া বাহির হইলাম, কিন্তু সেভাব ঘুচিল না। সমগ্র ধরাতল যেন তমসাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল, দিগন্ত যেন আরও বেশী বলিয়া বোধ হইল, সংসারে আমি যেন কিছুই নয় বলিয়া মনে হইতে লাগিল! জীবিত অবস্থায় আকাশ পানে চাহিয়া, সেই দিগন্তপ্রসারী শূন্য—মহা শূন্যের প্রতি চাহিয়া যেমন এক এক দিন কেমন বিষণ্ণ হইতাম, মনে করিতাম হায়রে, আমাকেও কি মরিতে হইবে, ঐ শূন্যে ঐ মহাশূন্যে, ঐ অন্ধকারে কোথায় যাইব, এ সাধের প্রাণ কেমন করিয়া সেই অনির্দ্দিষ্টের উদ্দেশে উৎসর্গ করিব? পরলোক কি? প্রভৃতি কত ভাবনা হইত। আজ সহসা মনোমধ্যে তেমনি একটা বিষম ভাবনা আসিল, করালী হাসিয়া বলিল "ভাব কি?"

আমি আর তাহার কোন উত্তর দিতে পারিলাম না, রঙ্গমঞ্চে পরীস্থান দেখিবার সময় যেমন ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘুচিয়া আলোক দেখা দেয়, কি এক সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া পুলকিত হইতে হয়, আজ তেমনি ধীরে ধীরে যেন ধরাতলের তামস ভাব ঘুচিতে লাগিল, ধীরে ধীরে উষা সমাগমের ন্যায় মৃদু মন্দ সুখকর স্নিগ্ধ আলোক দেখা দিতে লাগিল। দিগ্‌দিগন্ত যেন কি

এক অপূর্ব্ব সৌরভে আপ্লুত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে আততায়ী দেহ খানি অদৃশ্য হইয়া গেল, এবং আমি এক অভিনব জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করিলাম। সে দেহের আকুঞ্চন বিস্ফারণ হয়, সে দেহের ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন হয়, মনের অভিরুচিমত শ্রীধারণ করা যায়, অথবা কোন মূর্ত্তি ধারণ না করিয়াও আপন অভিনব তৃপ্তিকর অদৃশ্য দেহের অস্তিত্ব ভাবিয়া আপনা আপনি পুলকিত হইতে হয়। তখন দেখিতে দেখিতে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ জ্যোতির্ম্ময় দেহ দৃষ্টিগোচর হইল, সকলেরই বদন প্রসন্ন, মুখভাব মধুর,—হাস্যময়। যেন কোন জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ প্রাণীর রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেস্থান নর নারীতে পূর্ণ, বালক বালিকায় পূর্ণ। আমি বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইলাম, কাহাকে কি বলিব ভাবিয়া পাই না, এমন সময় কতকগুলি লোক আসিয়া আমাদের বেষ্টন করিলেন। আমি আর থাকিতে পারিলাম না সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলাম "অপনারা কে ?"

আমার কথায় সকলে হাসিয়া উঠিলেন। তন্মধ্যে এক জন বলিলেন "পরিচয় দিব বই কি, এখন এদিকে এস।"

এই বলিয়া আমাদিগকে যেন আরও কত উর্দ্ধে লইয়া গেলেন। সর্ব্বত্রই একভাব, লোক পূর্ণ। সে শান্তিময় স্থানের বর্ণনা কি করিয়া করিব ? তখন দেখিলাম আর দিন রাত্ নাই, পৃথিবীর প্রকাণ্ডত্ব নাই, দূরে পদতলে যেন একটী মানচিত্র মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। ভারত, ইংলণ্ড, জর্ম্মাণী আমেরিকা একবারে দেখা যায়, একবারে সহস্র সহস্র লোককে দেখা যায়, তাহাদের হৃদয় ভাব জানা যায়। আ ছি ছি সংসার কি! আমি এই সংসারে সংসারী ছিলাম ? যেখানে ভ্রাতায় ভ্রাতায় প্রবঞ্চনা, পিতা পুত্রে প্রবঞ্চনা, স্বামী-স্ত্রীতে প্রবঞ্চনা, হায় আমি এমন জঘন্য সংসারে সংসারী ছিলাম। তখন পৃথিবীতে যেন পুতুলের খেলা দেখিতে লাগিলাম। দিনের পর দিন যেন মুহূর্ত্তে আসিতে যাইতে লাগিল, মুহূর্ত্তে আছে, মুহূর্ত্তে নাই—মনে এক মহা আনন্দ হইতে লাগিল। পুতুলে যেন কোথাও বক্তৃতা করিতেছে, পুতুলে যেন আপনাকে ধার্ম্মিক প্রতিপাদন করিতেছে। রাজা রাজ্য অহঙ্কারে ব্যস্ত, দরিদ্র আপন দারিদ্র্য যাতনায় কাতর, বিরহিনী বিরহে ব্যথিত, কেহ বা শোকে তাপে জর্জ্জরিত। হো হো, সকলি ফাঁক, সকলি অসার! আর এক বিচিত্র বস্তু দেখিলাম। সংসারে যাহাদিগকে অতি অপদার্থ অতি হেয় বলিয়া ভাবিয়া ছিলাম, তাহাদের অনেকে দেখি অতি পবিত্র, অতি মহান! আর যাঁহাদিগকে বড় ভক্তি করিতাম, দেবতার মত পূজা করিতাম

যাঁহাদের সংসর্গে যেন কত পবিত্রতা আছে বলিয়া ভাবিতাম, তাঁহাদের হৃদয় দেখি বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবঞ্চনা এবং ঈর্ষায় ভরা; মনে হইল সংসার কি অসার! ধন, অর্থ পদমর্য্যাদা এ সব কি? স্বপ্ন, স্বপ্ন বই কিছুই নয়। এ জগতে সে সকলের মূল্য নাই, সে সমস্ত অপদার্থ অসার! এখানে রাজার সম্মান নাই, আছে সত্যের; জ্ঞানীর সম্মান নাই, আছে ধর্ম্মের। হায় একি দেশ! সে জীবনে এ জীবনে কি প্রভেদ! তখন একবার নিজের বাটীতে দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম কুসুমের আর তত কাতরভাব নাই, পুত্রদের সে দারুণ মর্ম্মব্যথা নাই, নূতন সংসারে নূতন সংসারী হইয়াছে। আ ছি ছি, আমি ইহারই জন্য মত্ত হইয়াছিলাম, এই অসার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ছিলাম!

ক্রমে দিব্যচক্ষে কোটী কোটী রাজত্ব দেখিলাম, জলে স্থলে অনিলে কোটী কোটী সংসার দেখিলাম। বায়ুতে কত প্রাণী, কত রাজত্ব, কত সংসার! বায়ু-ভরে সংসারীরা ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছে, তাহারা ভাবে আমরা স্থির ভাবে আছি, কিন্তু তাহা নয়। কোটী কোটী কীটাণু মধ্যে রাজাধিরাজ দেখিলাম। বঞ্চনা প্রবঞ্চনা দেখিলাম, অহঙ্কার মাৎসর্য্য দেখিলাম, বিরহ আহ্লাদ দেখিলাম। মানব ও সেই ক্ষুদ্র কীটাণুতে কোন প্রভেদ দেখিলাম না। মনোভাবের কোন বৈলক্ষণ্য নাই, ভাবিলাম "ছি ছি, সংসারের পাগলামীতে আমি কেন মজিয়া ছিলাম?"

তখন একজন বলিলেন "এখনি এত বিস্ময়, এ দিকে এস, আরও কত কি দেখিবে।"

তাঁহার অনুগমন করিলাম, দেখিলাম কি সর্ব্বনাশ! লক্ষ লক্ষ প্রাণী সংসার ত্যাগ করিয়া আসিতেছে, আর কৌতূহলাক্রান্ত সেই জ্যোতির্ম্ময় দেহীরা তাহাদের বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। কেহ হয়ত সমাগত স্ত্রীকে বলিতেছেন "আহা তোমার কি ভালবাসাই ছিল, আমাকে বঞ্চনা করিয়া কত উপপতি করিয়াছিলে। আহা ভালবাসার কি প্রতিদান!" কেহ হয়ত বলিতেছেন "আমি তোমায় পুত্রের মত লালন পালন করিয়াছিলাম কিন্তু আমার সন্তানগণকে একমুষ্টি অন্ন হইতেও বঞ্চিত করিয়াছিলে। ছি ছি জীবন কয় দিন, অর্থ আবার কি? ইহার জন্যও এত করিতে হয়?"

কি লজ্জা কি ঘৃণা! আর বঞ্চনা চলে না। চক্ষের জলে, দীর্ঘনিশ্বাসে, প্রাণ ভুলালি কথায় আর ভুলান চলে না। কত স্বামী সোহাগিনী স্ত্রী আজি লজ্জাবনমুখী, কত প্রবঞ্চক আজি হেঁটমুণ্ড, কত স্বার্থপর আজি ম্রিয়মান!

এখন চিত্ত বিবেকে পূর্ণ—তাই লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্ষোভের সীমা পরিসীমা নাই। এ কি কম যাতনা!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আকাঙ্ক্ষা।

তখন মনে আর এক চিন্তা আসিল। করালীকে চুপি চুপি বলিলাম "ভাই, সকলেরই ত আত্মীয় স্বজন দেখিতেছি, আমাদের কই?"

করালী। আমাদের আমরা।

আমাদের সঙ্গিটী আমাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন "কাহাকে দেখিতে চাও?"

আমি। আমার পিতাকে,—আমার পুত্রকে।

তিনি বলিলেন "দেখিয়া আর কি করিবে?"

আমি। পিতাকে দেখিয়া কি করিব!

তিনি হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন "মহাভারত ত পড়িয়াছ, অর্জ্জুন পরলোক গত অভিমন্যুকে দেখিয়া কত তৃপ্তি পাইয়াছিলেন জান ত?"

আমি। সেটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

তিনি। সম্পূর্ণ।

আমি। তবে আপনারা এখানে কেন?

তিনি। কর্ম্মফলে। সকলে সকল স্থানে আশ্রয় পায় না। পাইলেও তাহা সময় সাপেক্ষ।

আমি। আমার পিতা কোথায়?

তিনি। নিতান্তই কি দেখিবে?

আমি। দেখিতে বড় বাসনা।

তখন তিনি আমাদিগকে লইয়া বায়ু গতিতে আবার ছুটিলেন। যে জীব পৃথিবীর সর্ব্বত্র অনায়াসে দেখিতে পায় তাহাকে ছুটিতে হইতেছে। তবে সে কোন দেশ? ক্রমে রাশি রাশি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী অতিক্রম করিয়া চলিলাম। যে নক্ষত্রগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক খণ্ডবৎ দেখিয়াছিলাম, তাহা মহান—অতি

মহান, অতি সুন্দর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ক্রমে আমরা একটী নক্ষত্রের অতি নিকটবর্ত্তী হইলাম। মরি মরি কি সুন্দর দৃশ্য! দেখিয়া যে আশা মিটে না,—হৃদয়ের তৃপ্তি হয় না।

আমি বলিলাম "আমরা কোথায় আসিলাম?"

তিনি বলিলেন "শুক্রগ্রহে, ইংরাজ যাহাকে Mars কহে।"

তখন কি যেন এক অপূর্ব্ব মৃদু-মধুর বায়ুর সঞ্চারণে দেহ অপূর্ব্ব তৃপ্তি অনুভব করিল, ক্রমে ক্রমে সেই পূর্ব্বশ্রুত শুক্রগ্রহে উপনীত হইলাম। এযে আবার সেই শস্য শ্যামলা ধরিত্রী, এযে আবার সেই জন-সঙ্কুল দ্বিতীয় পৃথিবী। সেই পুণ্য সলিলা-তরঙ্গিণী প্রবাহমানা, সেই ফুল ফলাবনত মহিরূহ, লতা-বল্লরী, সেই নক্ষত্র খচিত আকাশ। তবে ঋতুর পরিবর্ত্তন নাই, চির-বসন্ত বিরাজমান। বৃক্ষে সলিলপাত হয়, কিন্তু মনুষ্য অঙ্গ সিক্ত হয় না। দুইটী চন্দ্র দুই দিকে উদয় হইয়া থাকে। সূর্য্যের রশ্মি প্রখর নয়—সলিল স্নিগ্ধ, শীতল ও স্বচ্ছ। তরঙ্গিনীর তলদেশ পর্য্যন্ত পরিদৃশ্যমান, তাহাতে কতই বিবিধ বর্ণের মৎস্যরাজি খেলিয়া বেড়াইতেছে। মৃত্তিকা কোমল, বৃক্ষ চিরদিন ফলশালী, মাঠে পৃথিবীর মত শস্য-সমাকীর্ণ ক্ষেত্র, কিন্তু পঙ্কিল নয়। পথ, ঘাট যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গৃহাদিও তেমনি মনোহর। সমস্তই দ্বিতল, তৃতল বা তদূর্দ্ধ। দেশে দরিদ্র নাই, শস্য তুলিয়া লও, ফল পাড়িয়া লও, তাহার পর দিন আবার সে গুলি শস্যে পূর্ণ, ফল ভরে অবনত।

মনুষ্য দেহ চারি হস্ত পরিমাণ। কি সুন্দর বর্ণ কি সুন্দর মুখভাব, কি সুন্দর গঠন পারিপাট্য। রমণীমূর্ত্তি দেখিলে চক্ষু পলকহীন হয়। বেশভূষার সীমা নাই। মানবগণ বিদ্বান, ধনবান ও মহাজ্ঞানী। আমরা সেখানে যাইবামাত্র সকলে মহা সমাদর পূর্ব্বক আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। রমণীকুল মৃদু হাসিয়া মধুর সম্ভাষণে আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া কি এক অভিনব ভাবে, এক অভিনব স্বরে গীত গাহিলেন, আমরা সে মধুর স্বরে বিমোহিত হইলাম।

তখন আমার নূতন পরিচিত লোকটীকে বলিলাম, "কই, আমার পিতা কোথায়?"

তিনি। ব্যস্ত কেন?

আমি। পিতাকে দেখিতে যদি ব্যস্ত না হই, তবে আর কিসে হইব?

তিনি। শীঘ্রই দেখিবেন, কিন্তু একটী কথা আছে?

আমি। আদেশ করুন।

তিনি। এক পক্ষ কাল তোমাদিগকে এদেশীয়ের মত থাকিতে হইবে,—এই স্বাধীনতা ঐ সময়ের জন্য নষ্ট হইবে।

আমি। কেন?

তিনি। মনুষ্য আপন কর্ম্মফলে নানা স্থানে জন্মগ্রহণ করে, তোমরা জন্ম-গ্রহণের ফলভোগ ভিন্ন তৎপ্রদেশস্থ প্রাণীগণের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণে কৃতকার্য্য হইবে না।

আমি। সম্মত আছি, আমার পিতার সহিত পরিচিত করিয়া দিন।

তখন তিনি আমাদিগকে একটী বাগান বাড়িতে লইয়া গেলেন। বাগানে সুন্দর বাটী, চতুর্দ্দিকে সুন্দর ফলমূলের বৃক্ষ। অগণিত দাস দাসী ও সন্তান সন্ততিতে গৃহ পূর্ণ। আমি বলিলাম "এ বাটী কার?"

তিনি। তোমার পিতার।

আমি। সন্তান সন্ততি?

তিনি। তাঁহারই।

আপনা হইতে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস বহিল, লোকটী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "এখনও দীর্ঘনিশ্বাস?"

আমি কিছু লজ্জিত হইলাম, এমন সময় দেখিলাম একটী দিব্যশ্রী সম্পন্ন যুবা পুরুষ আমাদিগের দিকে আসিতেছেন। তখন লোকটী বলিলেন, "ঐ আপনার পিতা।"

আমি শশব্যস্তে তাঁহার চরণ প্রান্তে প্রণত হইলাম।

পিতা বলিলেন "আপনি কে?"

আমি। আপনার পুত্র।

পিতা। বটে,—কোথায় তোমার পিতা ছিলাম বাপু?

আমি। পৃথিবীতে।

পিতা। তা হতে পারে, আবার হয়ত এককালে বুধগ্রহে তুমি আমার পিতা ছিলে।

আমি স্তম্ভিত হইলাম। ভাবিলাম "তবে কি স্নেহ মমতা বৃথা।"

পিতা তখন আমাদিগকে সেদিন তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে কহিলেন। আমরা থাকিলাম বটে, কিন্তু যে পিতা দেখিব বলিয়া ভাবিয়া ছিলাম, এ যেন সে পিতা নন। আমার সেই স্নেহময় পিতৃ মুখ ত দেখিতে পাইলাম না। সে আদর সে যত্ন ত আর পাইলাম না। এ যেন তারকেশ্বরের স্বপ্ন দেখিয়া পূর্ব্ব

জন্মের পিতার প্রসাদ খাইতে আসা। তাহাতে যেন সে পূর্ব্ব যত্ন নাই, সুখ নাই—তৃপ্তি নাই। ইহাও সেইরূপ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্নেহের প্রখরতা।

পরদিন প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখি আমাদের সে সমভিব্যাহারী বন্ধুটী আর নাই। প্রথমে মনে হইল কোথাও গিয়াছেন, এখনি আসিবেন, কিন্তু সে আশা নিষ্ফল হইল। করালী বলিল "চল দেখি, একবার অন্তরীক্ষে দেখিয়া আসি।"

ঊর্দ্ধে উঠিবার ইচ্ছা করিলাম। যে ইচ্ছায় ক্ষণমধ্যে কোথায় উড়িয়া যাইতাম, আর তাহা হইল না, হতাশ হইলাম।

করালী বলিল "কাজ ভাল হয় নাই, না আসিলেই হইত—লোকটিকে আমার আর ভাল বলিয়া বিবেচনা হইতেছে না। তিনি এ দেশের আড়কাঠি নয় ত?"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম "ভয় নাই,—এ দেশের লোক হয় ত চা খান না। এ দেশে চা-বাগান নাই।

করালী। চা-বাগান না থাক, অন্য কিছু আছে। একবারে কোথায় আনিয়া ফেলিল দেখ দেখি। সেখানে কত কি নূতন বস্তু দেখিতে ছিলাম, আরও না জানি কত দেখিতাম।

আমি আর কোন উত্তর দিলাম না, কিন্তু মনে মনে বড় বিষণ্ণ হইলাম। নানা প্রকার চিন্তার উদয় হইতে লাগিল।

এমন সময়ে বাটীর এবং অন্যান্য বাটীর অনেকে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। কত কথাই হইতে লাগিল, কিন্তু অধিকাংশই পৃথিবী সম্বন্ধে। তাঁহাদের মধ্যে বৃদ্ধ দেখিলাম, যুবা দেখিলাম, বালক দেখিলাম, বালিকা দেখিলাম, যুবতী দেখিলাম, কিন্তু বৃদ্ধা দেখিলাম না। তখন একটী যুবতী মধুর হাসিয়া বলিলেন "কি ভাবিতেছেন?"

আমি বলিলাম "আপনাদের দেশে কি বৃদ্ধা নাই?"

সহসা একটী হাসির তরঙ্গ উঠিল, তিনি পুনরপি বলিলেন "পৃথিবীতে কি বৃদ্ধা আছেন?"

"প্রচুর।"

"আমাদের দেশে তাহা নাই। প্রসবান্তে মাতার মৃত্যু হয়, যাঁহার যত পুত্র তাঁহার তত স্ত্রী ছিলেন বলিয়া বুঝিবেন।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম "কেন?"

"এইরূপ বিধি লিপি। পুত্র হইলে রমণীর ভাবান্তর হয়, প্রণয়ের ব্যভিচার ঘটে, যৌবনের নবমিলনের যে সুখ, তাহা তিরোহিত হয়। তাই এই মধুর নিয়ম।"

করালী বড় খুসী হইল, বলিল "বেশ বটে, আমিও অনেক দিন একথা ভাবিয়া ছিলাম। পৃথিবীতে এ নিয়ম হইলে বড় ভাল হয়।"

আমি বলিলাম "এদেশে স্ত্রীলোকদের কত বৎসর বয়সে বিবাহ হয়?"

"পঞ্চদশ বৎসরের পর।"

"ইহার কারণ কি?"

"তাহার পূর্ব্বে স্বামী নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা জন্মিবে কেন?—বিশেষ রূপে স্ত্রী-প্রতিপালনে সক্ষম না জানিলে, সে পুরুষকে কেহ বিবাহ করে না।"

"তবে কি ভালবাসার জন্য বিবাহ নাই?"

রমণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"এখানে ছায়াবাজি নাই। অর্থহীন আবার ভালবাসা কি? অর্থ ভিন্ন ভালবাসাকে স্থির রাখিবে কে? অর্থচিন্তার কাছে ভালবাসার চিন্তা বিড়ম্বনা।"

"এদেশে জাতিভেদ আছে কি?"

"না।"

এইরূপ নানা কথায় দিন কাটিয়া গেল। পিতৃদেবের যত্নে তিন দিবস তথায় অতিবাহিত করিলাম। চতুর্থ দিবসে তিনি বলিলেন "তবে তোমরা অন্যত্র যাও।"

সহসা যেন মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কোথায় আসিয়াছি তাহার স্থিরতা নাই, আবার যাইব কোথায়! বলিলাম "কোথায় যাইতে আদেশ করেন?"

পিতা। এখানে অপরিচিতকে কেহ স্থান দেয় না। যদি দেয়, তিন দিনের বেশি নয়, এ রাজ্যের নিয়মই এই। এখানে আলস্য বড়ই ঘৃণ্য।

মন বড় উদাস হইল, ভাবিলাম "এ কি? পিতার ত কিছুমাত্র স্নেহ যত্ন দেখিলাম না, তবে আমি কেন এখনও সংসার ভুলিতে পারিনা। তবে কি আবার এ ভাব পরিবর্ত্তিত হইবে? আবার কি নূতন করিয়া মৃত্যু হইবে? আবার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে? নতুবা স্মৃতি বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না। সকলই হারাইয়াছি, কিন্তু স্মৃতি যায় না কেন? আমিও যে সংসারের সংসারী,

পিতৃদেবও তাই ; তবে মরিয়াও তাঁহাতে আমাতে এ পার্থক্য কেন? যাহাই বলি কিন্তু আমি সে পিতাকে ভুলিতে পারিব না, মাতাকে ভুলিতে পারিব না, প্রাণের কুসুমকে ভুলিতে পারিব না, আর আমার সেই নয়ন তারা ননীর পুতলিদের ভুলিতে পারিব না। ইহাতে পাপ হয় হউক, চিরান্ধকারে থাকি, উত্তম,—মোহের তাড়নায় জর্জ্জরিত হইতে হয়, তাহাও ভাল, কিন্তু সে মধুর স্মৃতি,—যে স্মৃতি এখনও আমায় পুলকিত করে,—হৃদয়ে শান্তি দেয়, তাহা আমি কখন বিসর্জ্জন দিতে পারিব না।"

করালী বলিল "ভাব কি?"

আমি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম "কই কিছু নয়।"

আমি আর কোন কথা না কহিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। তখন সেই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে দৃষ্টি পড়িল। আহা কি সুন্দর পথ ঘাট, কি সুন্দর অট্টালিকা শ্রেণী। অদূরে কি নয়ন বিমোহন দৃশ্য! নগরের এক প্রান্তে সমুদ্র, কিন্তু অধিক বিস্তৃত নয়,—পর পার দেখা যায়। অপর পারে সমুদ্র বক্ষ হইতে পর্ব্বতমালা ক্রমে ক্রমে কেমন ঢালু হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে, কেমন যেন মেঘে ঠেকিয়া আকাশে মিশিয়াছে। সমুদ্রে সহস্র সহস্র তরণী, সহস্র সহস্র অর্ণবযান। মেঘের গায় চিল উড়িতেছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টে কখন একটী পাখা উঁচু করিয়া আর একটী কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া নামিতেছে, কখন যেন প্রমত্তমনে বায়ু-সাগরে সাঁতার দিতেছে। সমুদ্র বেলায় কত সুন্দর প্রস্তরমালা, তাহাতে তরঙ্গ আসিয়া প্রতিঘাত হইতেছে। ধীরে ধীরে বালুকা রাশি সিক্ত করিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। প্রচণ্ডতা নাই,—যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে বিভোর! ক্ষণেক আমারা নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিয়া আবার চলিলাম, সে সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া দেখিবার যেন পূর্ণ প্রবৃত্তি নাই।

ক্রমে আমরা রাজধানীতে উপস্থিত হইলাম। রাজধানী বটে! লোকে লোকারণ্য, সকলেই মহাব্যস্ত, সকলেই কার্য্য তৎপর। বড় বড় আফিস, পথে রাশি রাশি অশ্বযান, সবই পৃথিবীর মত, তবে পথ ঘাটে রমণী অনেক দেখিলাম। অনেক রমণী রাজকর্ম্মচারী আছেন, অনেক কেরাণী আছেন। আমেরিকা হার মানিয়াছে। আমরা কপর্দ্দক শূন্য, যাই কোথায়, খাই কি? আবার যে ক্ষুৎপিপাসার তাড়না ভোগ করিতে হইতেছে।

ক্রমে এইরূপ চিন্তাকুল ভাবে যাইতে যাইতে দেখিলাম একটী বাটীর মধ্যে খুব গোলমাল হইতেছে। ব্যাপার জানিবার জন্য ভিতরে প্রবেশ করিলাম

দেখিলাম তাহা লোকে লোকারণ্য, অন্ধ খঞ্জে পূর্ণ। জিজ্ঞাসায় জানিলাম সেটী দরিদ্র নিবাস। চক্ষে জল আসিল, ভাবিলাম হায় পৃথিবীতে আমার এত সুখৈশ্বর্য্য থাকিতেও আজ আমি দীনহীন ভিখারী। চাহিতে হইল না, তাঁহারা আপনারাই আমাদিগকে প্রচুর আহার্য্য প্রদান করিলেন। দেখিলাল এ দেশে ফল মূলেরই আদর বেশি, মাংসের প্রচলন নাই। আদর গাভী দুগ্ধের, মিষ্টান্নও প্রচুর। সুধু এখানে বলিয়া নয়—বাজারেও তাই দেখিলাম।

খাদ্যাদি খুব সুলভ, কিন্তু স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন। সোণার দাম আমাদের দেশের রূপার সঙ্গে সমান। ভাবিলাম হায় ইউরোপ, কেবল তোমার কাছেই আমাদের রূপা মাটী হইয়াছে!

নবম পরিচ্ছেদ।

শুক্র-নগর।

রাজধানীর নাম শুক্র-নগর। ইহা দীর্ঘে-প্রস্থে ১০ ক্রোশ। এদেশে রেলগাড়ি নাই। তবে অশ্বগণ ষ্টীম এঞ্জিন অপেক্ষাও দ্রুতগামী। নগরের মধ্যস্থলে একটী নদী। গঙ্গার মত চওড়া, কিন্তু পরিসর সর্ব্বত্র সমান। দুই ধার শ্বেত প্রস্তরে বাঁধা। আমরা সন্ধ্যার সময় তাহারই একটী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ভাবিতেছি কি করি, কি করিয়া জীবনধারণ করি। এদেশে আসিয়া কি অন্যায় কাযই করিয়াছি। ভিক্ষা করা ঘৃণ্য, কিন্তু ঘৃণ্য হইলেও তাহা দুষ্প্রাপ্য, এদেশে অন্ধ খঞ্জ ভিন্ন অন্য কেহ ভিক্ষা পায় না। তাহারা বলে সামর্থবান পুরুষকে ভিক্ষা দিলে দেশের অকল্যান করা হয়। তখন আমাদের দেশ মনে পড়িল, হায় হায় সে কি সোনার দেশ, কোন কষ্ট নাই এক বার "জয় রাধে কৃষ্ণ" বলিলেই হয়, অমনি ভিক্ষা। পয়সা দিয়া মজুর মিলে না, কিন্তু "জয় রাধে কৃষ্ণে" ভরা। সামর্থ অসামর্থ বিচার করিব কি, অতিথি বিমুখ হইলেই যে পাপ!

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে সস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন, আকাশে তারারাজি ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতেছেন। তাহার মধ্যে দুইটী পূর্ণ শশী যেন পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীতা দেখাইতে উৎসুক। জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছে। কোথায় লাগে বৈদ্যুতিক আলোক। এ যুগল শশীর স্নিগ্ধ কিরণের বুঝি আর তুলনা নাই।

এখানকার পাখী সব স্বাধীন। অবিরত উড়িয়া উড়িয়া ডাকিয়া ডাকিয় দিগন্ত পরিপ্লুত করিতেছে। কেহ তাহাদিগকে ধরে না, তাহারাও কাহার ভয়ে ভীত নহে। সোহাগে মাতিয়া কখন কাহারও নিকট আসিতেছে, অঙ্গে বসিতেছে, আবার ডাকিয়া ছুটিয়া উধাও হইয়া যাইতেছে। গতির কি মাধুরী, ঝাঁকে ঝাঁকে এই সরল রেখার ন্যায়, এই বর্ত্তুলাকারে, এই উর্দ্ধে, এই নিম্নে উড়িয়া কখন সঙ্কুচিত হইয়া, কখন ছড়াইয়া পড়িয়া দর্শকের মনপ্রাণ হরণ করিতেছে। মরিমরি কি সৌন্দর্য্য, তার কি বর্ণচাতুর্য্য, রজতে হেমে মাখামাখি। কোথাও একটু আধটু অন্য বর্ণ, কাহারও ইন্দ্রধনু তুল্য, কাহারও বা হরিতে পীতে এক অপূর্ব্ব বর্ণবৈচিত্র।

মানবগণের কি বেশভূষা, কি পারিপাট্য, নারীগণ যেন মোহিনী। গৃহে গৃহে প্রান্তরে প্রান্তরে যেখানে সেখানে জনতা, যেখানে সেখানে সঙ্গীত-লহরী, যেখানে সেখানে নৃত্যগীত আনন্দ কোলাহল। নিরানন্দ কি তাহা দেখিলাম না। কেবল নিরানন্দ আমরা, তাহাও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া। আমরা কত স্থানে দাঁড়াইয়া তাহাদের কতই আহ্লাদ আমোদ দেখিলাম। মনোহর গীত শ্রবণে বিমোহিত হইলাম। মনে হইল জীবন ধারণ করিয়া ইহারাই সুখী! কিন্তু এত স্ত্রীস্বাধীনতার অর্থ বুঝিলাম না। মনে দ্বিধার নাম মাত্র নাই। এমন সময় কে আমার পশ্চাদ্দিক হইতে আমার অঙ্গ স্পর্শ করিল। ফিরিয়া দেখি একটী পরমাসুন্দরী রমণী। তিনি মধুর হাসিয়া বলিলেন "কি ভাবিতেছ, স্ত্রী-স্বাধীনতা?"

আমি অবাক্ হইলাম, বলিলাম "হ্যাঁ।"

রমণী। যাঁহারা স্বাধীন হইবার উপযুক্ত, তাহাদের স্বাধীন হইবার আপত্তি কি?

আমি। চরিত্রদোষ ঘটিবার সম্ভাবনা।

রমণী। যার প্রাণ আছে তার দোষ নাই।

এই বলিয়া তিনি আমার মুখের দিকে তীব্রভাবে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "আর বলা হইল না, তোমার চিত্তবিকৃতি জন্মিতেছে, আমি চলিলাম।"

রমণী চলিয়া গেলেন। আমরা ভাবিলাম "এ কি?—ইহারা কি প্রাণের কথা বুঝিতে পারে?"

আমি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া গেলাম।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। তখন আমরা সেই দরিদ্র-নিবাসে যাইয়া আহার করিলাম; কিন্তু কোথাও রাত্রি যাপনের স্থান পাইলাম না।

বড় কষ্টে নদীর ঘাটে রাত্রি কাটাইলাম। নিদ্রা হইল না বলিলেই হয়। প্রাতে আবার সহরের ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলাম। কি পাপ! এ দেশেও মানুষ আসে।

দশম পরিচ্ছেদ।

পরিণাম।

উমেদারির চূড়ান্ত করিলাম কিন্তু চাকরী জুটিল না! অর্থ থাকিলে ব্যবসা করিতাম, কিন্তু তাহারও উপায় নাই। এখন কি করি, ইহাই বড় বিষম ভাবনা হইয়া উঠিল।

যোগবলে এ দেশের অধিকাংশ কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিচারালয় আছে, উকিল নাই। তার নাই, টেলিগ্রাফ আছে। প্রেম আছে, বিচ্ছেদ নাই। পরিতৃপ্তি আছে, নৈরাশ্য নাই। সুখ আছে, দুঃখ নাই। ইন্ধন নাই কিন্তু রন্ধন হয়। ধরিত্রী চিরদিন শস্যশ্যামলা কিন্তু কর্ষণ করিতে হয় না। পুলিস আছে কিন্তু অত্যাচার নাই। ভণ্ড নাই কিন্তু ধার্ম্মিক আছে। ফলে, যোগ জানা ভিন্ন এদেশে কার্য্য পাওয়া যায় না। এ এক বিচিত্র দেশ!

প্রাতঃকাল হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া দরিদ্রনিবাসে উপস্থিত হইলাম। দরবান আর ভিতরে প্রবেশ করিতে দিল না, বলিল "তিন দিন আহার পাইয়াছ আর পাবে না।"

কি সর্ব্বনাশ! এখন করি কি। বলিলাম "বাপু তবে কি হবে?"

"অরণ্যে যান, সেখানে যথেষ্ট আহার্য্য আছে।—সংসারে বেকার অকর্ম্মণ্য লোক থাকিলে সংসার উশৃঙ্খল হইয়া যায়। পাপ চিন্তা আসে, ঐহিক পারত্রিক উভয় দিক নষ্ট হয়।"

অগত্যা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তথা হইতে ফিরিলাম। দেখিলাম, দূরে একটী রমণী সহাস্য-আননে আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন, মন বড় প্রফুল্ল হইল—মনে যেন নূতন আশার সঞ্চার হইল। দ্রুতপদে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। রমণী মধুর হাস্য সহকারে বলিলেন "আসুন, আমি আপনাদেরই জন্য অপেক্ষা করিতেছি।"

আমি আগ্রহ সহকারে বলিলাম "কেন?"

রমণী। আপনাদিগকে বনে লইয়া যাইবার জন্ম।

মাথা ঘুরিয়া গেল, প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, তালু শুষ্ক হইয়া গেল, বলিলাম "সে কোথায়?"

রমণী। কোন চিন্তা নাই, আমার সহিত আসুন।

আমি। আপনি কে?

রমণী। পুলিশ কর্ম্মচারিণী।

একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম "কতদিন সেখানে থাকিতে হইবে?"

রমণী। তাহা কি করিয়া বলিব?

আমি। সেখানে কি আরও লোকজন আছেন?

রমণী। থাকিতে পারেন।

আমি। গৃহাদি?

রমণী। বৃক্ষমূল বা পর্ব্বতগুহা।

আমি। হিংস্র জন্তু?

রমণী। প্রচুর।

আর শুনিতে হইবে কেন, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। পা আর উঠে না, ভাবিলাম পলাইলে হয় না? কিন্তু কোথায় পলাই? এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় রমণীটী ইঙ্গিত করিবামাত্র দুইটী লোক আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া চলিল। খানিক দূরে গিয়া হাত ছাড়িয়া দিল, কিন্তু আমরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলাম। বাক্‌শক্তি রহিত হইল। অবশেষে তাঁহারা আমাদিগকে সেই নদীর তীরে আনিলেন। তথায় একটী নৌকা ছিল, আমরা চারিজনে তাহাতে আরোহণ করিলাম, তখন নৌকা খানি আপনা আপনি তীব্র-বেগে ছুটিতে লাগিল। সে গতির কথা আর কি বলিব? কূলের দিকে ক্ষণেক চাহিয়াই মাথা কেমন ঘুরিতে লাগিল। জ্ঞান আপনা হইতে লোপ পাইল। আমরা উভয়ে সংজ্ঞাশূন্য হইলাম। কতক্ষণ সে অবস্থায় ছিলাম তাহা বলিতে পারি না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জ্ঞানের বিকাশ।

যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখি একটী বাঁধাঘাটে আমরা উভয়ে শায়িত। সম্মুখে আর নদী নয়,—মহাসমুদ্র ধূ ধূ করিতেছে। উত্তালতরঙ্গ যেন বিকট বদন বিস্তারিত করিয়া ভীমা মাতঙ্গিনীর ন্যায় তাধেই তাধেই করিয়া নৃত্য করিতেছে। ভীম হুঙ্কারে যেন প্রভঞ্জন সলজ্জ; উর্ম্মির উপর উর্ম্মি, তাহার উপর উর্ম্মি— অমনি আবার ভাঙ্গিয়া যেন খল খল হাসিয়া উঠিতেছে এই যেন নামিতেছে আবার যেন সবেগে মস্তক উত্তোলন করিয়া কি এক ভীষণভাব ধারণ করিয়া স্তম্ভিত করিতেছে। শুভ্র ফেনরাশি স্তূপাকারে নাচিয়া নাচিয়া দুলিয়া দুলিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। সমুদ্র বক্ষ যেন ভীম আন্দোলনে আন্দোলিত। সে বিকট দৃশ্য অবলোকন করিলে চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে।

নীল, কেবল নীল, তাহাতে নীল আকাশ মিশিয়া যেন সমুদ্রের বর্ণেরই প্রগাঢ়তা দেখা যাইতেছে। পশ্চাতে প্রকাণ্ড প্রান্তর। ভীমকায় মহীরুহ যেন মহাযোগীর ন্যায় যোগপরায়ণ। মস্তক উন্নত কবিয়া, যেন কি এক মহান প্রকাণ্ডের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে। বৃক্ষশিরে রাশি রাশি কাক আর চিল বসিয়া এক বিকট রব করিতেছে। ভীষণ—সর্ব্বত্র ভীষণ দর্শন, আমরা কোথায়?

করালীর তখনও জ্ঞানের উন্মেষ হয় নাই। তাহার ছোট ছোট দাড়িগুলি বাতাসে মৃদু মন্দ উড়িতেছে। ডাকিলাম—"করালী"?—উত্তর নাই। তখন সজোরে তাহার অঙ্গ স্পন্দিত করিলাম।

করালী চমকিয়া উঠিয়া বসিল। দুই হস্তে চক্ষু দুটী মর্দ্দিত করিয়া আবার চাহিয়া দেখিল। যে ভীম দৃশ্য তাহার নয়ন পথে পতিত হইল, তাহা যেন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। আবার দেখিল, আবার আমার দিকে চাহিল, বলিল "একি?"

আমি। যাহা দেখিতেছ।

করালী। উপায়?

আমি। ঈশ্বর।

করালী। কি আশ্চর্য্য, মরিয়াও ত্রাণ নাই।

আমি একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম "না।"

তখন আমরা ধীরে ধীরে ঘাটের উপরে উঠিলাম। দেখিলাম ঘাট হইতে একটী সরল পথ গিয়াছে। কোথায়, তাহা কে জানে। আমরা অগত্যা সেই পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম, কোথায় যাইতেছি তাহা জানি না, তথাপি চলিলাম।

দেখিলাম পথের দুইধারে কতশত সুন্দর ফলের বৃক্ষ, প্রাণ পুরিয়া আহার করিলাম। কতশত হরিণ হরিণী আমাদিগকে বেষ্টন করিয়াছে,—কেহ হয়ত সেই প্রশান্ত নয়ন বিস্তারিত করিয়া আমাদের দিকে চাহিতেছে,—কেহ হয়ত পশ্চাৎ পদদুটী বায়ুতে প্রক্ষিপ্ত করিয়া লাফাইয়া এক অভিনব নর্ত্তন কুন্দন করিতেছে। এই আমাদের কাছে ছুটিয়া আসিতেছে, আবার লাফাইতে লাফাইতে দূরে—আরও দূরে চলিয়া যাইতেছে। আমরা তাহাদিগের সহিত কত রঙ্গে কতই খেলা করিলাম। তখনও বেলা বড় বেশী হয় নাই।

ক্রমে রবির কিরণ প্রখর হইতে লাগিল। বৃক্ষতলে আশ্রয় করিব ভাবিতেছি, এমন সময় দূরে একটী সুন্দর অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম, মহা উৎসাহের সহিত তদ্দিকে ধাবমান হইলাম। অট্টালিকাটী একতল, কিন্তু উচ্চতা বড় বেশী। আমাদের দেশের ত্রিতল বাটীর সমান। চতুষ্কোণ,—ব্যবধান প্রায় এক মাইল। সমস্তই পাথরের। এক এক খানি প্রস্তর প্রায় চতুষ্কোণে ৬০ ফিট, ঘরটী তেম্নি পাথরে গাঁথা। জোড় প্রায় টের পাওয়া যায় না, অনেক কষ্টে বুঝা যায়। প্রস্তরেব দরজা জানালা, কলকব্জা পাথারের, লোহা বা অন্য কোন ধাতুর নাম মাত্র নাই। এখন ভাল মন্দ যাহা দেখি, তাহাতেই ভয় হয়;—মনে হয়, না জানি আবার কি বিপদে পড়িব। মনুষ্য জন্মেও বিপদ পদে পদে, কিন্তু এত ভবিষ্যৎ ভাবনা থাকে না,—যাহা থাকে তাহা আশার সুমধুর সৌন্দর্য্যে ভরা, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের ঘোর ভাবান্তর উপস্থিত—আমাদের ভবিষ্যৎ যে ভীতি ও বিভীষিকা পূর্ণ। সুতরাং আমরা ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম একটি মাত্র হল, ও তাহার দুই পার্শ্বে অনেক কক্ষ। দ্বারের সম্মুখেই একটী শুভ্রবর্ণা প্রস্তরময়ী রমণীমূর্ত্তি। বসন ভূষণ সমস্তই শুভ্র। মুখভাব রমণীয়। এক চক্ষে কটাক্ষ, অপরে অশ্রু। দক্ষিণে উন্নত পীন, বামে অবনত। কটি ক্ষীণ, স্থূল নিতম্ব। কখন হাসি, কখন কান্না মাথা—এমন সুন্দর মুখভাব আর কখন দেখি নাই। তাহাকে বালিকা কি যুবতী বা বৃদ্ধা বলিব তাহা স্থির করিতে পারি না। যখন যে ভাবে দেখি, তখন তাহাই দেখিতে পাই। রমণী বাম হস্তে একটী শিশুর হাত ধরিয়া তাহার

দিকে কি এক বিশ্ববিমোহিনী ভাবে চাহিয়া আছেন। বালক যেন পিপাসাতুর, তাহারই অনতি দূরে স্বচ্ছ নির্ম্মল বারিপূর্ণ পাত্র দেখা যাইলেও বালক সে দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, পিপাসা তৃপ্ত করিতে পারিতেছে না, মনে হইতেছে তাহা হইলেই যেন রমণীটী পলাইবে। বালকটী এক একবার বারিপূর্ণ পাত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে আবার রমণীর দিকে চাহিতেছে। রমণীর নিতম্বের বসনে সুকৃষ্ণ অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—"মায়া।" আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলাম,—"অনেক দিন হইতে আপনাকে ছাড়িয়াছি, আবার কেন মা?"

তাহার পর দক্ষিণদিকের প্রথম কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণ সম্পন্ন একটী সুন্দর পুরুষ দণ্ডায়মান—বয়সে প্রৌঢ় হইলেও সৌন্দর্য্য অনুপম। তাঁহার সম্মুখে একটী যুবক এক অঞ্জলি কপর্দ্দক লইয়া সেই মুখের দিকে চাহিয়া আছে। পার্শ্বে একটী সুবর্ণ মুদ্রাপূর্ণ পাত্র, যুবক কপর্দ্দকগুলি ফেলিয়া সুবর্ণ মুদ্রা লইবার আশায় যেন দণ্ডায়মান, কিন্তু ফেলি ফেলি করিয়া ফেলিতে পারিতেছে না। প্রৌঢ়টী তাহা দেখিয়া মৃদু হাস্য করিতেছেন। তাঁহার ওষ্ঠে হীরক অক্ষরে লেখা—"দীর্ঘসূত্রতা।"

পর কক্ষে দেখিলাম, গৌরবর্ণ একটী পুরুষ একটী যুবককে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিতেছেন, যুবকের পদতলে যেন কত হীরা মণি মুক্তা ছড়ান রহিয়াছে। যুবক কোনটী তুলিতেছে কোনটী ফেলিতেছে। হৃদয়ের তৃপ্তি হইতেছে না, কেবল অতৃপ্ত হৃদয়ে সেই পুরুষটীরই অনুসরণ করিতেছেন। তাঁহার চক্ষুপল্লবে লেখা—"আকাঙ্ক্ষা।"

তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, তথায় এক ষোড়শী সুন্দরী দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িতা। দুই পার্শ্বে দুইটী দাসী বীজন হস্তে দণ্ডায়মান। যুবতীর অধরে হাসি, চক্ষে কটাক্ষ, বক্ষবাস ঈষৎ স্খলিত, নিতম্বেরও অর্দ্ধ উলঙ্গ ভাব। চিকুর চাঁচর কেশদাম উরুদেশ স্পর্শ করিয়াছে। পদযুগল সুন্দর, সুন্দর নাসা, সুন্দর কর্ণ, সে সৌন্দর্য্যের যেন কি এক দাহিকা শক্তি আছে! আমরা সবিস্ময়ে সেই মোহিনী মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিলাম। তাহার জঘনপার্শ্বে যে মেখলা স্খলিত ভাবে পড়িয়া আছে তাহাতে লেখা রহিয়াছে—"কাম!"

করালী কামের এই মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

নারীস্তনভরণাভিনিবেশঃ
মিথ্যা মায়া মোহাবেশঃ।

এতন্মাংসবসাদি বিকারং
মনসি বিচারয় বারম্বারম্ ॥ *

আমি মনে মনে ভাবিলাম করালীর বুঝি প্রকৃতই তত্বজ্ঞান জন্মিতেছে।

পর কক্ষে দেখিলাম, একটী ভীমা ধূম্রবর্ণা রমণী। চক্ষু ঘূর্ণায়মান, যেন অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। দন্তে দন্তে সংঘর্ষিত হইয়া ওষ্ঠ বহিয়া শোণিত ঝরিতেছে। হস্তে বজ্রমুষ্টি, কেশপাশ আলুলায়িত, অঙ্গ ধূলি ধূসরিত, কলেবর কম্পিত। তাঁহার বক্ষে শোণিত অক্ষরে লেখা—"ক্রোধ।"

তাহার পরকক্ষে গলা ধরিয়া দুইটী যুবক দণ্ডায়মান। একটীর হস্তে সুবর্ণ পাত্রে হীরক হার, অপরের হস্তে লোহ পাত্রে রজত মালা। হীরার হার সত্বেও যিনি অপরের হস্তস্থিত রজত মালার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া যেন ভাবিতেছেন কি করিয়া উহা আত্মসাৎ করিব, তাঁহার কপালে লেখা "লোভ।"

তাহার পরের ঘরে একটী বৃদ্ধ দণ্ডায়মান। তাঁহার বামপার্শ্বে একটী যুবক তৃণ শয্যায় শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, আর তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে সুবর্ণ পালঙ্কে সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আর একটী যুবক যেন ছটফট্ করিতেছেন। বৃদ্ধের বাম করতলে লেখা "তৃপ্তি", দক্ষিণে—"অতৃপ্তি।"

এক দিকের সমস্ত কক্ষগুলি দেখা হইল। অপর পার্শ্বের দ্বার দেশে দেখি একটী শ্যামাঙ্গিনী রমণী মূর্ত্তি,—স্থিরা গম্ভীরা। মলিন বস্ত্র, পদতলে হীরা মণি মুক্তা। রুক্ষ কেশ, বদনে হাসি, চক্ষে শান্তি, তাঁহার পদতলে লেখা "নিবৃত্তি।"

তখন অপর পার্শ্বের ঘরগুলি দেখিবার বাসনা হইল। একটী ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম দ্বারদেশে লেখা "যোগাশ্রম" এবং তথায় একটী সুপুরুষ ধ্যান করিতেছেন। চক্ষু অৰ্দ্ধ নিমীলিত, মুখভাব মধুর স্বর্গীয়। তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিব ভাবিতেছি এমন সময় বহির্দ্দেশ হইতে কি যেন এক অশ্রুতপূর্ব্ব মধুর শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সে শব্দ যে কি মধুর তাহা আর কি করিয়া বুঝাইব। আমরা উভয়ে দ্রুতপদে ঘরের বাহিরে আসিলাম, কিন্তু কোথা হইতে সেই স্বর্গীয় শব্দ আসিতেছে তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। বোধ হইল, দূর হইতে আসিতেছে। আমাদের আর যোগাশ্রম দেখা হইল না—

* মোহান্ধ হইয়াই জীব যুবতীর পীনোন্নতপয়োধরে অনুরক্ত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে উহা মাংসবসাদির বিকার ভিন্ন আর কিছুই নয়। মনে মনে ইহা বিচার করিয়া তৎপ্রতি অনুরাগশূন্য হওয়া উচিত।

গীতিমুগ্ধ হরিণীর ন্যায় তদ্দিকে ধাবিত হইলাম। তখন দেখি যে একটী প্রাচীর রহিয়াছে এবং তাহারই অপর পার্শ্ব হইতে সেই বিশ্ববিমোহন গীতিশব্দ হইতেছে। প্রাচীরটী উচ্চ, তাহাতে কি করিয়া উঠিব ভাবিয়া পাই না। দেখিলাম একটী বৃহৎ বৃক্ষশাখা প্রাচীর পর্য্যন্ত লম্বমান। বৃক্ষে উঠিয়া সেই শাখা দিয়া প্রাচীরে উঠিলাম,—যাহা দেখিলাম তাহা আর বলিবার নয়, লেখনী তাহা বর্ণনায় অপারগ, ভাবিলাম এই বুঝি স্বর্গ। লম্ফ দিয়া উভয়ে সেই দিকে পড়িলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এ আবার কি ?

মধু ঝরে—সখী সুধা ঝরে,
পিও পিও প্রাণ সুধা পিওরে।
প্রাণ মাতোয়ারা, কাঁহা প্রাণ পেয়ারা,
সুখ নিশি আসে, আয় ঘুরে।
চখে চখে রাখি, চাঁদ মুখ দেখি
চেপে রাখি বুকে সুধাকরে॥

মরি মরি একি ? সহস্র কোকিলকণ্ঠী স্বর্গীয়া নিরুপমা সুন্দরীর কলকণ্ঠ হইতে ঐ গীতটী বাহির হইতেছে। তাহার উপর কি নাচ, কি ভঙ্গি, কি হাসি! সোহাগ ঢলিয়া পড়িতেছে, ভালবাসা উছলিয়া উঠিতেছে, কটাক্ষের লহরী খেলিতেছে, তাহার উপর মন্মথের ভীষণ তাড়নার জ্বলন্ত নিশান উড়িতেছে। গৃহি, সন্ন্যাসী, যোগী, কে কোথায় আছ ছুটিয়া এস, একবার এই সুধাসাগরে ডুবিয়া জীবনের অস্তিত্বের সুখানুভব কর। অসারতা ভুলিয়া যাও, প্রাণের অজেয় মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এক মুহূর্ত্ত—আর একটী মুহূর্ত্ত বাঁচার কাছে পৃথিবীর রত্নময় সিংহাসন তুচ্ছ বলিয়া বিবেচনা কর। এখানে বুঝি দুঃখ নাই, অভাব নাই—যাতনা নাই। আছে সুখ,—আছে শান্তি,—আছে সুধা। তাহাদের মধুর আস্বাদনে বুঝি মর মানব অমর হয়।

মরি মরি একি ? মণ্ডলাকারে বিস্তৃত সমতল তৃণাচ্ছাদিত ভূমি, কমনীয় নবদূর্ব্বাদল, তাহার উপর কত কি পুষ্প ছড়ান। গোলাপ—ছি ছি, তাহার সৌন্দর্য্য কোথায় ? মল্লিকা—না না,—চামেলি—তাও নয়,—এ ফুল বুঝি স্বর্গে ফুটে, এ ফুলের সৌরভে বুঝি মানবজীবন দীর্ঘ হয়।—এই সেগুলি পদতলে দলিত, আবার

তখনি নূতন, তখনি প্রফুল্ল।—তৃণদামের পার্শ্বে সুন্দর পথ ভূমিখণ্ডকে ঘিরিয়াছে, তাহাতে প্রস্তরের পরিবর্ত্তে মুক্তা ছড়ান। সাধারণতঃ মুক্তা বলিলে যাহা বুঝায় এগুলি তাহা নয়। নানাবর্ণের মুক্তা! দেখিলাম, কোনটী পীত, কোনটী লোহিত, কোনটী সাদা, কোনটী বা হরিদ্রা বর্ণ। বিবিধ বর্ণের মুক্তারাজিতে এক অভিনব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে আলো জ্বলিতেছে, হীরার পাত্রে মাণিকের দীপ্তি বিকাশ পাইতেছে। জ্যোতিঃ অসীম, কিন্তু চক্ষু ঝলসিয়া যায় না। আর তাহারই মধ্যে মোহিনীমূর্ত্তি সম্পন্না রমণীকুলের নৃত্য গীত। কি মাধুরী! কি সৌন্দর্য্য! এই কি কিন্নরীকুল?—এই কি গন্ধর্ব্বকন্যার বিলাস-কানন?

আমাদিগকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাদের গান থামিল না। আরও সোহাগে, আরও যত্নে—আরও রঙ্গে—আরও মাধুরী সহ সঙ্গীত লহরী ছুটিতে লাগিল। পুষ্পাভরণা অর্দ্ধবিবসনা রমণীকুল আমাদিগকে ঘেরিয়া আবার গাহিলেন—

প্রেম পিপাসিনী আমরা সকলে,
এস নাথ বসো হৃদয় কমলে।
দল দল চঞ্চল মৃণাল অবিরল
থর থর জর প্রাণ মদনেরি অনলে।
তুমি নব ঘন বারি পিপাসায় প্রাণে মরি
ঢাল ঢাল, ঢাল বারি ভাসি সুখ-সলিলে।

আবার হাসি, আবার নাচ, আবার রঙ্গ। বক্ষ কাঁপিতেছে, চক্ষু হাসিতেছে,—নিতম্ব দুলিতেছে, বক্ষবাস ক্ষণে উড়ে, ক্ষণে পড়ে।—কি মাধুরী—কি সৌন্দর্য্য—কি বাহার! ভাবিলাম আকবর সাহ কি ইহারই অনুকরণে খোস্‌রোজের সৃষ্টি করিয়াছিলেন? আবার ভাবিলাম কিসে—আর কিসে!

আর মুখে কথা সরে না, মন আর মানে না, এবার করস্পর্শের অপূর্ব্ব সুখানুভব হইল। প্রাণ আর নাই—সংসার ভুলিয়াছি। এতদিন যে জননী যে দারা যে সুত যে ভ্রাতা যে ভগিনী হৃদয়ে জাগিতেছিলেন, আজ আর তাহা নাই। সব ভুলিয়াছি, মুহূর্ত্তে সমস্ত বিস্মৃতির অতলতলে বিসর্জ্জন দিয়াছি, এখন আমরা আত্মহারা। তখন সকলে আমাদিগকে ঘিরিয়া বলিলেন "বল তোমরা আমাদের কাহাকে চাও?"

যাহাদিগকে উপাসনা করিয়া মিলে না তাঁহারা আমাদিগকে যাচিতেছে। এত সেই দেশ দেখিতেছি যেখানে—

"না করিতে সম্ভাষণ দেয় প্রেম আলিঙ্গন,
না কহিতে কথা ধ্বনি আগে কথা কয়।'

একি মধুর দেশ, মধুর রাজত্ব,—তাহার উপর চাহিব কাহাকে?—সকলেই সুন্দরী—সকলেই যুবতী—কাহার মান রাখিয়া কাহার অপমান করিব?—এ যে আবার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল।

যিনি আমার হাত দুটী ধরিয়াছিলেন, তাঁহার মলিন বদনভাব যেন বলিয়া দিতেছিল যে, "বল আমায়।" করালীরও ঠিক আমারই দশা। আমার মুখে কথা সরিল না। করালী কিন্তু তাহাই বলিল। তখন সেই দুইটী ব্যতীত অন্যান্য অসংখ্য সুন্দরী বেণী খুলিয়া ফেলিলেন, বসন ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, বিষম দুঃখে কপালে করাঘাত করিলেন, শেষে দারুণ মন-বেদনায় অধীর হইয়া কে কোথায় চলিয়া গেলেন। আমরা কেবল চারি জনে রহিলাম। মন সহসা কেমন উদাস হইল।

তখন আমাদের সঙ্গিনী রমণীদ্বয় আমাদিগকে কত সোহাগ—কত আদর করিলেন। তাঁহাদের পুলক দেখিয়া যেন মন কিছু স্থির হইল। বলিলাম "উঁহারা কি রাগ করিলেন?"

আমার সঙ্গিনী বলিলেন "না রাগ কিসের—তুমি আমার, সকলের ত হইতে পার না। লক্ষ লক্ষ লোক হয়ত তোমায় চায়—আর আমার মত মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। পারিলেও কি তুমি তাহাদের হইবে, কেন না তাহারা তোমায় চায়?"

আমি। তা কেমন করে হব।

রমণী। তবে চিন্তা কেন, যে যার সেই তার। আর এক কথা, এ দেশে সৌন্দর্য্যের অভাব নাই—আমার অপেক্ষা আরও কত সুন্দরী আছেন। তাঁহাদের দেখিয়া আমায় ভুলিবে না ত?

আমি। আমার আর বেশী আশা নাই।

রমণী। আশা কি মানুষের কমে?—আমি কি এত দিন তোমার আশা করেছিলাম,—না পূর্ব্বে ভেবেছিলাম যে, তোমার জন্য আবার প্রাণ কাঁদ্‌বে?

তখন একবার মনোমধ্যে কুসুমের সেই মুখখানি জাগিয়া উঠিল, ভাবিলাম তাইত বটে, আশার ত নিবৃত্তি নাই।—কিন্তু রমণীটী তখনই মৃদু মধুর হাসিয়া বলিলেন "কি ভাবিতেছ?"

আমি। কই কিছুত নয়।

রমণী তখন মুখখানি ঘুরাইয়া, ঘাড়টী বাঁকাইয়া, চক্ষু দুটি ঈষৎ কাঁপাইয়া বলিলেন "এখনি বঞ্চনা!—তবে ত তুমি আমার হবে না।"

আমি চিন্তিত হইয়া বলিলাম "কই বঞ্চনাত করি নাই।"

আবার আমার দিকে ফিরিয়া ঘাড়টী নাড়িয়া অল্প হাসিয়া বলিলেন "তুমি ভাব্‌চ কোথাকার কে কুসুমকে,—তবে তুমি ভালবাস্‌বে কেমন করে? এক প্রাণে আমার না হলে, আমার ভালবাসা ত পাবে না। আমি ত তোমার হব না।"

আমি সাগ্রহে বলিলাম—"আমি তোমায় চাই, আর কিছুই চাহি না।"

রমণী প্রেমভরে বাহুলতা আমার স্কন্ধদেশে স্থাপিত করিয়া বলিলেন "আমিও তাই চাই।"

তখন আমি বলিলাম "আপনারা কে?"

রমণী। নির্ব্বাসিতা মহিলাকুল।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম "নির্ব্বাসিতা?"

রমণী। এ দেশের নিয়ম—কাহারও ব্যভিচার দোষ হইলে তাহার নির্ব্বাসন হয়।

কথাটায় প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল। আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী রমণীটী তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রেমভরে আমার হাত দুটী ধরিয়া গাহিলেন ;—

তুমি অধিনী জীবন,
পূজিব যাবত প্রাণ তব শ্রীচরণ।
চাঁদের কিরণ নিয়ে মাথাইব প্রেম দিয়ে
চরণে ঘষিয়া দিব বালার্ক কিরণ।
সুধা ঢেলে দিব হৃদে বাধিব প্রেমের ফাঁদে
চিরদিন চিরসুখে কাটিবে জীবন।

তখন ভাবিলাম "ব্যভিচার আবার কি? এ সৌন্দর্য্যে—এ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে ব্যভিচার দোষ স্পর্শে না। শত শত দেব দেবীর এ দোষ বর্ত্তমান, তবু তাঁরা প্রণম্য—পূজ্য। আমি কি এ হেন অমূল্যনিধি হেলায় হারাইতে পারি।"

তখন আবার ভাবিলাম—"এ সংস্পর্গে বুঝি নরকও স্বর্গ হয়। কি মুখ! কি বর্ণ! কি গঠন পারিপাট্য!—স্বর্গ আবার খুঁজিতে হবে কি?"

রমণীটী গীত সমাপ্ত করিয়া আমাদের বলিলেন "তবে এস।"

"কোথায়?"

"গৃহে।"

"সে কোন দিকে?"

"ঐ পাহাড়ের গায়ে।"

এই বলিয়া আমাদের পশ্চাদ্দিকে একটী বাটী দেখাইলেন। বাটীটী অতি সুন্দর। আমরা সেই দিকে চলিলাম। ক্রমে পাহাড়ের উপর উঠিলাম। দেখিলাম, পাহাড় বেষ্টন করিয়া পথ চলিয়াছে। কতকদূর যাইয়া আমাদিগকে পাহাড়ের গায়ে একটী বৃহৎ গহ্বর দেখাইয়া বলিলেন "এইটীর নাম—পাপাশ্রম।"

সেই দিকে চাহিলাম, যাহা দেখিলাম তাহা বলিতে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। কেবল—শূন্য, আর কিছুই নাই, ধূ ধূ করিতেছে। বলিতে পারি না, কত যোজন পথ নিম্নে যেন ধূমরাশি দেখা যাইতেছে। আর দেখিতে পারি না।

আমার চিত্ত-বিনোদিনী রমণীটী সহাস্যে বলিলেন—"ভয় কি, দেখ না,—উহাতে ঈশ্বরের মহত্ত্বই প্রকাশ পায়।"

আমি। নাম পাপাশ্রম কেন?

রমণী। পাপীদের জন্য,—যারা মনোকষ্ট দেয়—পাপ প্রলোভনে মত্ত হয়ে আপনাকে বিস্মৃত হয়, তাদের ঐ মহা অদৃশ্য স্থানে যেতে হয়।

আমি। উহার মধ্যে কি আছে?

রমণী। তাহা বুদ্ধির অগম্য।

আমি আর দেখিতে পারিলাম না, অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, আমরা সেদিক হইতে সরিয়া আসিলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নব পরিবর্ত্তন।

পর্ব্বতোপরে যত উঠি, তত একই ধরণের রাশি রাশি গৃহ দেখিতে পাই। পথগুলি ঠিক সোজা, তাহারই দুই পার্শ্বে গৃহ শ্রেণী। সকলগুলিই রমণীতে ভরা। পুরুষ একটীও দেখিলাম না। শেষে আমি ও আমার সমভিব্যাহারিণী রমণী একটী গৃহে প্রবেশ করিলাম। করালীও ঠিক তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশ করিল, যাইবার কালে বলিল "আসি ভাই।"

আমিও বলিলাম "এস।"

কি গৃহ সজ্জা, এমন সম্পদ সুখ ত দেখি নাই। পৃথিবীতে যাঁহাদের সামান্য অর্থ আছে, তাঁহারা কতই মদগর্ব্বে গর্ব্বিত, কিন্তু এখানে তাহা নয়। অমূল্য রত্ন রাজি ছড়ান রহিয়াছে। কত চেয়ার শোফা দেখিলাম, কত দেয়ালগিরি

ঝাড় দেখিলাম। কিন্তু এ কি? এ গুলি কি কাচের উপর মখ্‌মলের কাজ করা? না না সমস্তই বহুমূল্য হীরা চুনি, পান্নায় নির্ম্মিত। চেয়ারে হীরার কাজ নয়, হীরা খুদিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। হায়, যে হীরা কত আদরের, যে হীরার কণা মাত্র কহিনুর নাম পাইয়াছে, তদপেক্ষা কত উৎকৃষ্টতর বৃহদাকারের হীরা এ দেশের সামান্য গৃহ সজ্জার উপাদান!

তখন রমণী আমাকে একটী আসনে বসাইয়া কত সুখ-কল্পনার, কত আদরের, কত ভালবাসার কথা কহিতে লাগিলেন। এত মধুর কথা আমি আর কখন শুনি নাই। আমি সেই সুমধুর বাক্য সুধাপানে বিভোর হইয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলাম। ভাবিলাম সংসার ছার! ধন্য তিনি, যাঁহার অঙ্ক সুশোভিনী এ হেন সুন্দরী। এখানে চিন্তার নামটী নাই। রমণী আমাকে একটী কক্ষমধ্যে লইয়া গেলেন। দেখিলাম সেখানে স্তরে স্তরে কেবল সুবর্ণপাত্র সাজান, সকল পাত্রগুলিই আচ্ছাদিত। প্রত্যেকটীর উপর হীরক অক্ষরে খাদ্য সামগ্রীর নাম লেখা আছে। মাংসের যত প্রকার খাদ্য কল্পনা যায়, তদপেক্ষা অনেক বেশী এখানে দেখিলাম। মিষ্টান্নর কথাই নাই, সকলই যেন কে এই মাত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলাম—"এ সকল কে প্রস্তুত করে?"

রমণী হাসিয়া কহিলেন "আপনা হইতে এ সমস্ত প্রস্তুত হয়। ঘর দ্বার আপনা হইতে পরিস্কৃত হয়।"

আহার মনোমতই হইল। আহারান্তে দেখিলাম তামাকুর সুন্দর ব্যবস্থা করা রহিয়াছে। হীরণ্ময় আলবালায় তামাকু সাজা রহিয়াছে। সুগন্ধে গৃহ আমোদিত। আ ছি ছি—কস্তুরী তুমি ছার, এ গন্ধের তুলনা নাই,—আমি নিশ্চয় বলিতে পারি এ সুগন্ধ আঘ্রাণ করিলে যিনি তাম্রকূটের চিরবিদ্বেষী তিনিও দুই টান টানিতে ছাড়েন না।

তাম্মাকু খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনার নাম কি?"

রমণী যেন অভিমানের সঙ্গে সোহাগের এক অপূর্ব্ব বিমিশ্রণে মাতিয়া একটী চঞ্চল কটাক্ষ হানিয়া বলিলেন "আমি দাসী—আমায় আপনি কেন, তুমি বল। আমার নাম "হিরণ্ময়ী।"

আমি হাসিয়া কহিলাম "তুমি কতদিন এদেশে আছ?"

রমণী। সে কথা পরে বলিব।

আমি। সবই ত ভাল দেখিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ব্যভিচার কেন করিয়াছিলে?

রমণী। তোমার ব্যভিচারের জ্ঞান নাই।

আমি। কেন?

রমণী। এদেশে ব্যভিচারের স্বতন্ত্র অর্থ। আমার কাহিনী শুনিলেই সকল বুঝিবে।

আমি। তবে বল।

রমণী। আমি পিতার তৃতীয় কন্যা। বিবাহের এক বৎসর পরে এক দিন বসিয়া আছি, এমন সময় রাজপথে তোমাদের উভয়কে দেখিলাম। তোমায় দেখিয়া মনে হইল "ইনি যদি আমার স্বামী হইতেন, তাহা হইলে আমার কত না জানি সুখ হইত।" তাহার পরই তুমি অদৃশ্য হইলে, কিন্তু আমি জন্মের মত পতিতা হইলাম। স্বামী চক্ষে অবিশ্বাসিনী হইলাম। আমাদের হৃদয় দর্পণবৎ কিন্তু অপবিত্র ছায়ায় তাহা কলুষিত হয়। আমার হৃদয়ও তাহাই হইল। আমি গৃহ হইতে এদেশে প্রেরিতা হইলাম।

আমি অবাক্ হইয়া বলিলাম, "ইহার নাম ব্যভিচার!"

রমণী। ইহাকেই ব্যভিচার বলে।

আমি। সে কথা তোমার স্বামী কি করিয়া জানিলেন?

রমণী। আমাদের দেশের পুরুষেরা রমণীর চক্ষের দিকে চাহিবামাত্র তাহার হৃদয়ের সকল কথা জানিতে পারে। কখন প্রতারিত হইতে হয় না। অন্যায় করিয়া কোন নারীকেও তিরস্কৃতা বা মর্ম্মব্যথা পাইতে হয় না। আমাদের সে জ্ঞান আছে বলিয়াই তুমি যখন তোমার পূর্ব্ব স্ত্রী কুসুমের কথা ভাবিতেছিলে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

আমি সে কথা চাপা দিয়া বলিলাম, "এখন স্বামীর জন্য প্রাণ কাঁদে কি?"

রমণী। সংসারে সম্বন্ধ লইয়া কথা, সম্বন্ধ ফুরাইলে কে কার? এখানে স্মৃতির তাড়না এক সময়ে যেমন তীব্রবেগে থাকে, তেমনি আবার সহসা নিবিয়া যায়।

এইরূপ নানা কথায় রজনী অতিবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু কথা ফুরাইল না, যেন জানিতে কত বাকি। ঘুম অতি সামান্যই হইল। হিরণ কক্ষান্তরে যাইয়া শয়ন করিল। যাইবার সময় বলিল "কাল আমাদের লৌকিক বিবাহ সম্পন্ন হ'বে। বিবাহের পর তুমি আমার আমি তোমার, আজ এই পর্য্যন্ত।"

তাই বলি ঘুম হইবে কেন? রজনী বড় দীর্ঘ বলিয়া মনে হইল। কিন্তু সে রজনীও পোহাইল!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

প্রত্যুষে করালী আসিয়া জুটিল। করালীর চিরদিনই হাসি খুসি বড় কম, কিন্তু আজ তাহার মুখভরা হাসি দেখিয়া বলিলাম "কি করালী, আজ বড় খুসী যে ?"

করালী। আজ যে বিয়ে।

আমি। তারই এত আহ্লাদ।

করালী। হবে না। পৃথিবীতে বড় ছেলে বেলা বিয়ে হয়েছিল, বিয়েটা মনেই ছিল না, আজ তার মজাটা বুঝ্‌বো।"

আমি। এত সাধই যদি ছিল তবে সেখানে আর একটা বিবাহ করনি কেন ?

করালী। সেখানে মজা বড় কম। এমন ঘর পোরা খাবার থাক্‌লে কি করতাম কি জানি। খাটুনির পয়সায় একটাই চলে না।

এমন সময় দেখিলাম দলে দলে রমণী আসিতেছেন। মরি মরি কি সৌন্দর্য্য, মরি মরি কি চাহনি, কি অঙ্গ ভঙ্গি! সমস্ত দিন নৃত্যগীতাদিতে অতিবাহিত হইল। আমার প্রাণের হীরণও তাহাদের সঙ্গে আমোদে মত্ত। তবে থাকিয়া থাকিয়া এক একবার যে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, তাহার আর কি উপমা দিব ?

রাত্রি দুই প্রহরের পর আমাদের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবার সময় স্থির হইল। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দুইখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিক্টোরিয়া ফিটনের মত ফিটন আসিল। শুনিলাম আমাদিগকে সেই পূর্ব্বদিনের নৃত্যস্থল পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। সেখানে আবার নৃত্যগীতাদি হইবে, তাহার পর বিবাহ। রমণীগণ আমাদিগকে অতি যত্নে, অতি সমাদরে গাড়িতে তুলিয়া দিতে আসিলেন। তখন সহসা একটী হাসির তরঙ্গ উঠিল, হাসির সঙ্গে সঙ্গে আমরাও হাসিলাম, কিন্তু হাসির উদ্দেশ্য বুঝিলাম না। তখন দুই একজন বেশ করিয়া আমাদের কর্ণমর্দ্দন আরম্ভ করিলেন। করালীর ভাগ্যে তাহার ঘটাটা কিছু বেশী হইল। বর হইলেই চোর হইতে হয়, সুতরাং কিছু বলিতে পারিলাম না। কিন্তু বুলিলে কি, হাত সুড়্ সুড়্ করিতেছিল। করালী যন্ত্রণায় কান সরাইয়া লইল, তখন মধুর হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে রমণীগণ গাহিলেন—

ভয় পেলে ত পরাণ দেবো না,
প্রাণ নেবে যে, ভয় পেলে সে, প্রাণ ত পাবে না।
প্রেম মন্দাকিনী জল,
সদা করে ঢল ঢল,
যে দিকেতে—যখন ঢলে, কারো বাধা মানে না।
তুমি জান নাকি প্রাণ,—
নারীর কত মান,
পদতলে পড়ে ভোলা করেন পদ বন্দনা।
যিনি স্বয়ং শ্রীহরি—
ভবের কাণ্ডারি,
রাধার রাঙ্গা পা দুখানি, সদা তাঁরই কামনা।
আমরা করলে পরে মান,
শুকিয়ে যাবে প্রাণ,
পড়্‌বে তখন আছাড় খেয়ে পা আর ছাড়্‌বে না।
তোমার, অরসিকের প্রাণ,
জাননা নারীর মত মান,
কান ছেড়ে সে প্রাণ ছেড়ে দেয়, রসিক তাকি জাননা ?

করালী। আর বাক্য জ্বালা কেন, এই কান পেতে দিচ্ছি, যা কর্‌তে হয় কর, আপ্‌সোস্ রেখ না। সেই গুরু মশায় থেকে আরম্ভ হয়েছে, জানি না কোথায় শেষ হবে।

একটী রমণী হাসিয়া বলিলেন—"তোমার গুরু মশায় ছিলেন নাকি ?"

করালী। তাই ত বোধ হয়।

রমণী। তবে ও মলা কান আর মল্‌বো না। অমন লোকের গুরু হতেও চাইনে। এখন ওঠ গাড়িতে ওঠ, বেলা শেষ হয়ে এল।

তখন আমি ও করালী একখানি ফিটনে উঠিলাম। আমাদের মন-মোহিনীদ্বয় আর একখানিতে উঠিলেন। আমি লাগাম ধরিলাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘোড়া দুটী ধীরপদ বিক্ষেপে নাচিতে নাচিতে চলিতে লাগিল। পশ্চাতে প্রায় পাঁচ শত রমণী মিলিয়া নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর স্বরের উচ্ছ্বাস তরঙ্গে সেই স্থান মাতাইয়া তুলিতে লাগিলেন। ঘোড়া দুটী বেশ যাইতেছে, কিন্তু বামে যে সেই পাপাশ্রম !—সেই ভীষণ-গহ্বর। ঘোটকদ্বয়কে পাহাড়ের দিকে টানিলাম। আরও

টানিলাম, ইচ্ছা হইল গাড়ি হইতে নামিয়া পড়ি। পথ অপ্রশস্ত নয়, কিন্তু মনের এমনি ভয়। মনের ঠিক কিছুমাত্র নাই। কেবল বিপরীত দিকে ঘোড়াই টানিতেছি। ঘোড়ার মস্তক প্রস্তরে ঠেকিল। ঘোটক দ্বয় চমকিল। বাগ মানিল না। লাফাইয়া উঠিল। যায় যায়; আর পারি না। বুঝি মহাগহ্বরে পড়িলাম। পশ্চাতে সহস্র কণ্ঠ হইতে "ভয় নাই ভয় নাই" শব্দ উত্থিত হইল, কিন্তু সকলি বৃথা—গাড়ি উল্টাইয়া গেল—আমরা সেই মহাগর্ত্তে পড়িলাম। আমি অগ্রে পড়িলাম, সঙ্গে সঙ্গে করালীও পড়িল। ঊর্দ্ধে দৃষ্টি পড়িল, দেখিলাম সেই মোহিনীকুল আমাদের দিকে চাহিয়া আছে, গাড়িটী সেই খানেই উল্টাইয়া রহিয়াছে, কিন্তু কি হতভাগ্য যে, আমরা দুইজনে পড়িয়া গিয়াছি। হায় হায় কি হইল! সেই মহান—সেই অতলস্পর্শী—গহ্বর মধ্যে পতিত হইয়াছি। তখন মহাবেগে উভয়ে নামিতে লাগিলাম; হায় কোথায় যাই? কে জানে কোথায় যাই, কিন্তু নামিতেই লাগিলাম। মনে করিলাম কিছু ধরিব, কিন্তু পারিলাম না, কেবল নামিতেই লাগিলাম। তখন আমাদের উপরে সেই সয়-তানি রমণীকুল খল খল হাস্যে করতালি দিতেছে। সেই করতালির ভীষণ শব্দ যেন হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। ক্রমে সেই ধূমরাশির নিকটবর্ত্তী হইলাম। দেখিতে দেখিতে তাহার মধ্যে নিপতিত হইলাম। ক্রমে অন্ধকার—ঘোরান্ধকার—কিছু দেখা যায় না। তেমন কালমূর্ত্তি আর দেখি নাই। নিম্নে ঊর্দ্ধে আশে পাশে কাল, সব কাল, ঘোর কাল। তখন একটা অপরিসর গর্ত্তমধ্যে যেন নামিতে লাগিলাম। পার্শ্বের প্রস্তর রাশি বেশ অঙ্গে ঠেকিতেছে। ক্রমে স্থানটী আরও অপরিসর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল এইবার বুঝি অনন্ত শূন্যময় পথে আটকাইয়া যাইব। কিন্তু তাহা হইল না। আমি কিসের উপর যেন দাঁড়াইলাম। যেটীর উপর দাঁড়াইয়া ছিলাম সেটী কোমল, কঠিন নয়। স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট। প্রথমে যেন নামিয়া গেল। আবার ঠিক হইয়া উঠিল। ভাবিয়াছিলাম পড়িবা মাত্র অঙ্গ চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে, কিন্তু ঈশ্বর বাঁচাইলে মারে কে? তখন করালীকে মনে পড়িল। ভাবিলাম সে আর নাই; কিন্তু তখনি কে তীব্র কণ্ঠে ডাকিল "অক্ষয়।"

বুঝিলাম করালীও আসিয়াছে। আর কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া দরদর ধারে মর্ম্ম নির্গত হইতেছে, নিশ্বাস সঘন পড়িতেছে। আমরা নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে উপবিষ্ট হইলাম। কিন্তু আমাদিগের চতুর্দ্দিকে অবিরাম এক ভয়ঙ্কর হুঙ্কার শব্দ হইতেছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

উভয়ে অনেকক্ষণ তদবস্থ ভাবে বসিয়া রহিলাম, কতক্ষণ তাহা জানি না, তবে মনে হয় অনেকক্ষণ হইবে। তাহার পর বলিলাম "করালী উপায় ?"

করালী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "ঈশ্বর,—যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

আমি। সে ত বটেই, কিন্তু সকল সময় সে জ্ঞান হয় না কেন ?

করালী। ঐ ত পাপ।

আমি। এখন কি কর্‌বে ?

করালী। করা করির ভয় আমার আর নাই, তুমি বিপদ ঘটাইয়াছ, নতুবা আবার মানুষের মত হ'ব কেন ? ভয়ই বা ছিল কি ? ইচ্ছায় উড়িয়া এসে এ সব দেখ্‌তাম।

আমি। সে কথা এখন ভাবার ফল কি ?

করালী। সাধে ভাবি, প্রাণের জ্বালায় ভাবি। আচ্ছা এ শব্দ কিসের ?

আমি। আমি ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

করালী। একটা গন্ধ পাচ্চ কি ?

আমি। খুব পাচ্চি, কি একটা পচা গন্ধ যেন আস্‌চে।

করালী। আমাদের দুরবস্থা দেখে মনে হয় এ সকলও বুঝি জন্ম জন্মান্তরের মহাপাপের পরিণাম। নইলে এখানে আস্‌ব কেন ?

আমি। তবে কি এই নরক ?

করালী। তাই বা জানি কি ?

আমি। নরকে যাতনা ভোগ আছে।

করালী। হতে কতক্ষণ। এখনি একজন মাথায় ডাঙ্গস মার্‌তে আরম্ভ কর্‌লেই ত হয়।

প্রাণটা যেন কাঁপিয়া উঠিল, বলিলাম "যাই হ'ক আর বসে থাকা নয়। যা থাকে কপালে ঘুরে ফিরে দেখি এস।"

তখন আমরা উভয়ে উঠিলাম, কিন্তু যাই কোথায় ? কোথায় যাইতেছি, তাহার ঠিক নাই কিন্তু চলিলাম। এমন ঘোরান্ধকারে আর কেহ কখন

চলিয়াছেন কি না জানি না। এমন অন্ধকারও অতি অল্প লোকই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অন্ধকার কয়লার খনির মধ্যেও এত অন্ধকার হয় না। তাহার উপর মনে যে কত প্রকার ভীষণ চিন্তার উদয় হইতেছে তাহা অপরের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। ধীরে ধীরে পা ফেলিতেছি, ভয় পাছে আবার কোন গহ্বরে পড়িয়া যাই। মনে হইতেছে এ যাত্রা কি দৈব সহায়ে বাঁচিয়াছি, নতুবা আবার মরিতাম। জানি না এ মৃত্যুর আবার কি পরিণাম ছিল।

আমরা উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া চলিলাম। ক্রমে যেন একটী সোপানের মত কি বোধ হইল। নামিলাম, আবাব তাই, এইরূপে প্রায় পঞ্চাশটী সিঁড়ি দিয়া নামিলাম। এ কি, তবে কি এখানেও মানুষ আছে? ভক্তিরসে হৃদয় গলিয়া গেল, বলিলাম "জগদীশ্বর তোমার সৃষ্টির মহিমা কি করিয়া বুঝিব দেব?" সিঁড়িগুলি শেষ হইল, বোধ হইল, যেন পাহাড়েব ঢালুতে নামিতেছি। আমরা অতি সন্তর্পণে, অতি কষ্টে সেই পথ দিয়া নামিতে লাগিলাম। তাহার পর আবার দুইদিকে গায়ে যেন পাহাড় ঠেকিতে লাগিল, সম্মুখেও দেখি পাহাড়, তখন হতাশ হইয়া বলিলাম "আর ত পথ নাই।"

গায়ের রক্ত প্রকৃতই জল হইয়া আসিল। ঘর্ম্মে শরীব সিক্ত হইল। পিপাসায় তালু পর্য্যন্ত শুষ্ক হইল। আমবা পরস্পরে পরস্পরের বুকের দুর্ দুর শব্দ বেশ শুনিতে পাইতে লাগিলাম। কি ভীষণ দুশ্চিন্তা! এ ঘোরান্ধকারে অনাহারে প্রাণ হারাইব? তখন ছেলেদের মনে হইল, স্ত্রীকে মনে হইল। ভাবিলাম তাহারা যদি আমার এ দুর্দ্দশাব কথা জানিত, তাহা হইলে পাগল হইয়া যাইত; এখন এই সুখ যে তাহারা ইহা জানে না। মনে হইল মানুষ বড় সুখী যে, তাহারা মৃত্যুর পর আত্মার কি হয় তাহা জানে না। করালী বলিল "তুমি এ দিকে এস, আমি একবার দেখি।"

আসিব কি করিয়া। স্থান এত সঙ্কীর্ণ যে, তাহারও যাইবার পথ নাই। অতি কষ্টে পায়ের ভিতর দিয়া তাহাকে গলাইয়া দিলাম। করালী অনেকক্ষণ সম্মুখের পাহাড়ে হাত বুলাইয়া দেখিয়া বলিল "একটী সামান্য গর্ত্ত মত আছে কিন্তু ইহা দিয়া কি গলা যাইবে?"

করালী তাহাতে একটী হাত বাড়াইয়া দিল, ক্রমে পা বাড়াইয়া দিল, এইরূপে অনেকক্ষণ পরীক্ষা কাবিয়া বলিল "ও দিকেও সমতল, হয় ত গলিতে পারি।" তখন গলাই স্থির হইল। সে অতি কষ্টে অপর দিকে গেল। আমিও তাহাই করিলাম। তখন দেখিলাম একটী পবিসরযুক্ত স্থানে আসিয়াছি। আমাদের

কথাবার্ত্তা দূরে থাক, নিশ্বাসও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাহারই এক পার্শ্ব হইতে অল্প আলোক দেখা যাইতেছে। বড় আনন্দ হইল। এই ক্ষীণ আলোক দর্শনে যে মানুষের কখন এত আনন্দ হয় বা হইতে পারে তাহা আমাদের জ্ঞান ছিল না। কিন্তু দুর্গন্ধ যে বড় বেশী, প্রাণ যে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। আর সেই হুঙ্কার রব। যে স্থান দিয়া আলোক আসিতেছিল, অতি কষ্টে তথায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম তাহা একটী গবাক্ষ বিশেষ। তদ্দ্বারা মুখ বাহির করিয়া দেখি, কোথা হইতে জানি না কিন্তু স্পষ্ট আলোক প্রকাশ পাইতেছে। তাহাতে পর্ব্বতের ভিতরটা কতক পরিমাণে দেখা যাইতেছে, কিন্তু তাহা যেন আরও ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমরা গবাক্ষ সাহায্যে অপরদিকে অবতরণ করিলাম। দেখিলাম বড় বড় অতি বৃহদাকারের প্রস্তর যেন এক ভীষণ ভাবে সাজান! পথ কোথাও উচ্চ, কোথাও নিম্ন। কিন্তু পদতলের প্রস্তররাশি যেন কাঁপিতেছে, আর স্পষ্ট বোধ হইতেছে তাহার তলদেশ হইতে কিসের ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছে। তখন ভাবিলাম এটা আগ্নেয় গিরির অভ্যন্তর প্রদেশ ব্যতীত আর কিছুই নয়, মনে হইল অগ্ন্যুৎপাত হইবে বলিয়া বোধ হয় এই কম্প, এই শব্দ। এইবার গেলাম। সেই মৃদু আলোক সাহায্যে চতুর্দ্দিক তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, কিন্তু পথ খুঁজিয়া পাই না। হায়, এই বিজন স্থানে কি ভীষণ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়া মরিতে হইবে! প্রাণ, জন্ম জন্মান্তরেও কি তোর মায়া হইতে পরিত্রাণ নাই?

অনেক অনুসন্ধানের পর দেখি একটী প্রকাণ্ড প্রস্তরের পার্শ্ব দিয়া যেন একটী সঙ্কীর্ণ পথ গিয়াছে। আলোক অতি সামান্য মাত্র আছে, বেশ দেখা যায় না। সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে চলিলাম। দেখি ক্রমে আলোক বেশী পরিমাণে রহিয়াছে। কিন্তু সেই ভীষণ শব্দের আধিক্যও যেমন, দুর্গন্ধও তেমনি। ক্রমে পথের শেষে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যাহা দেখিলাম. তাহা স্মরণ হইলেও হৃদকম্প হয়। সে দৃশ্য যেন আর কেহ না দেখে। সে ভীষণ দৃশ্য—সে হৃদয় বিদীর্ণকারী দৃশ্য যেন অতি বড় শত্রুকেও কখন দেখিতে না হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ভীষণ দৃশ্য।

দেখিলাম একটী প্রকাণ্ড ভীষণ দর্শন স্থান, উপরে আচ্ছাদিত, আচ্ছাদন প্রস্তরময়। তবে কোথাও যেন একটী প্রস্তর খসিয়া পড়িবার মত হইয়াছে—কোনটী যেন পড়ে পড়ে। মনে হয় যেন চাপা পড়িয়া মরিলাম। উর্দ্ধে, প্রায় সহস্র হস্ত উর্দ্ধে, সেই মহা আচ্ছাদনের মধ্য স্থানে একটী আলোক রহিয়াছে। সেই আলোকে সমস্ত স্থানটী মৃদু আলোকিত। আমরা অনুমান করি সেই আচ্ছাদিত সমতল স্থানটীর পরিধি কোন ক্রমেই চারি ক্রোশের ন্যূন নহে। সম্মুখে মহাসাগরের একটী শাখা আপন প্রশান্ত দেহ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। প্রস্থ অর্দ্ধ ক্রোশের কম নয়। কিন্তু কি উত্তাল তরঙ্গ! কি ভীষণ গর্জ্জন! দূর হইতে যেন তরঙ্গ আমাদিগকে লক্ষ করিয়া ছুটিতেছে। গেলাম, ভাসাইয়া লইয়া গেল, কিন্তু তখনি দেখি তাহার কতক অংশ, আমরা যে স্থানে দণ্ডায়মান, তাহার তলদেশে মহাবেগে প্রধাবিত, আর অর্দ্ধেক পার্শ্বস্থ বড় বড় প্রস্তরমালায় প্রতিঘাত হইয়া ছিন্নভিন্ন ভাবে অতি সূক্ষ্ম বাষ্প ধারায় পরিণত হইয়া আবার সাগর বক্ষে নিপতিত হইতেছে। আবার সেই ভাব, সেই আতঙ্ক। পূর্ব্বে যে ভীষণ শব্দের কথা বলিয়াছিলাম, বুঝিলাম তাহা এই শব্দ। বুঝিলাম এই স্রোত পর্ব্বতের অভ্যন্তর দেশেও প্রধাবিত এবং সেই জন্য কোন কোন স্থান যেন কম্পিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। অপর দিকেও এইরূপ দৃশ্য। সমুদ্র যেন সেই সমগ্র স্থানটীকে গ্রাস করিতে উদ্যত। অপরদিকে সমতল, কিন্তু প্রস্তরময়। প্রস্তরের চন্দ্রাতপ, তাহার উপর আবার সাগরের কৃষ্ণ সলিলের প্রবল গর্জ্জন। এ মহান্ দৃশ্য অবলোকন করিলে প্রকৃতই হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। তখন মনে হইল ভগবান! একবার অর্জ্জুনকে যে রূপ দেখাইয়া ভীত করিয়াছিলে, এই কি তোমার সেই ভীষণ রূপ? সমুদ্রের অপর পারে যাইবার জন্য সেতু আছে। সে সেতুটী বড় ভয়ঙ্কর। এক হস্ত প্রস্থ—একখানি দীর্ঘ—প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যাপী প্রস্তর, এপার ওপার জুড়িয়া পড়িয়া আছে। ধরিবার আধার নাই, তবে পর পারে যাই কি করিয়া? চন্দ্রনাথ পাহাড়ে অল্প বিস্তৃত এইরূপ একখানি ক্ষুদ্র প্রস্তরের উপর দিয়া অতি সামান্য দূর মাত্র যাইতে হয়। যাত্রীরা "জয় বাবা চন্দ্রনাথ" বলিয়া নির্ব্বিঘ্নে তাহার উপর দিয়া পার হয়। কিন্তু এখানে কাহার নামের

দোহাই দিয়া পার হইব? শুনিয়াছি ভগবান স্বয়ং কাণ্ডারী হইয়া ভবনদী পার করেন। দেব, এ আবার কি প্রকার পারের সৃষ্টি? দয়াময়, হৃদয়ে সে বল কই যে, এমন অপরিসর সেতুর উপর দিয়া তোমার নাম করিয়া পার হইব?

এই কি সেই বৈতরণী? আমরা কি ইহারই মধ্যে পতিত হইয়া উর্ম্মি-মালায় বিতাড়িত হইয়া প্রকাণ্ড পাষণ অঙ্গে প্রতিহত হইব? লক্ষ লক্ষ হিংস্র জীবের ভক্ষ্যের উপাদান হইব? তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু শুনিয়াছি জীবনের যে তাহাতে শেষ হয় না, কেবল যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা সহ্য করে। অবোধ ধ্রুব সিংহ দেখিয়া তাহাতে তোমারই অস্তিত্ব ভাবিয়াছিল। সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি জ্ঞানে বিভোর হইয়াছিল। দেব, সর্ব্ব জীবে সে জ্ঞান যে আমার নাই। প্রহ্লাদ সর্ব্বত্র তোমায় দেখিত, সর্ব্ব দ্রব্যে তোমার সত্তা অনুভব করিত, সেই চিন্তায় বিভোর হইয়া তন্ময়চিত্ত হইয়াছিল। তাই তুমি অজ্ঞানকে তত্ত্ব জ্ঞান শিখাইতে সেই স্ফটিকস্তম্ভে দেখা দিয়াছিলে, কিন্তু এই মহা সেতুতে কি তবে তোমার সত্তা নাই? আছে, কিন্তু আমায় তাহা বুঝিবার ক্ষমতা দাওনা হরি? তাহার উপর ঐ আলোক কিসের? অপর পারে অগ্নিশিখা কিসের? আর্ত্তনাদ কিসের? তবে একি নরক? আমরা কি ঠিক উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত শাস্তি পাইতেই যাইতেছি। দয়াময়, যে তোমায় সঙ্গে লইতে পারে তার আবার ভয় কোথায়? ভবভয় তারণ শ্রীহরি যার সঙ্গের সাথী, তার আবার ভয় কি? তবে ভয় করি কেন?

বস্তুতঃ ভয়টা জীবনের অসারতা—দুর্ব্বলতা। আজ করালী আমার সঙ্গে আছে বলিয়া এ দুর্দ্দিনেও কত সাহস। ঘোর অন্ধকারে তাহাকে দেখি নাই, অনেক সময় কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত শুনি নাই, কিন্তু মনে ছিল করালী সঙ্গে আছে, তাই সাহস। তবে কেন মনে হয় না যে, যিনি শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ, মহানের মহান, তিনি আমার সঙ্গে আছেন। তাঁহার সেই অভয় পদযুগল স্মরণ করিয়া দুস্তর মহা বিপদ হইতে ত্রাণ পাইনা কেন? কিন্তু হায় কই সে বল, কই সে কামনা, কই সে সিদ্ধি। অধর্ম্মময় প্রাণে ধর্ম্মভাব আর কত আসিবে? এই তাঁহাকে ভাবি আবার তাঁহাকে ভুলি, যদি মনে রাখিতেই পারিব, তবে বিপদ হবে কেন? বলিতে কি এখনও পাপ চিত্তে পাপ চিন্তা, এখনও মনে হয় ঈশ্বর কি সত্যই আছেন? না, মরিলে এমনি কষ্ট ভোগ করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। আবার যখন দেখি সম্মুখে মহাবিপদ, তখন তাঁহাকে স্মরণ হয়, তাঁহার সত্তায় বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু তাহা স্বার্থপর প্রবৃত্তি। বিপদ হইতে

পরিত্রাণ পাইয়া আর তাঁহাকে তেমন ভাবে তেমন প্রাণ খুলে ডাকিতে পারিনা কেন?"

অবশেষে ভাবিলাম,—ক্ষুধায় ওষ্ঠাগত প্রাণ;—এখানে থাকিলে ত মরিতেই হইবে, তদপেক্ষা অপর পারে যাওয়াই কর্ত্তব্য। তাহাই স্থির হইল। তখন বিপত্তে মধুসূদন স্মরণ করিয়া সেই অপ্রশস্ত সেতুর উপর বসিয়া পার হইতে আরম্ভ করিলাম। সেই শোঁ শোঁ হো হো শব্দ। সেই যেন বিকট বদন ব্যাদান, সেই যেন নাগিনীর ধেই ধেই নৃত্য, সেই যেন সর্ব্বনাশীর সর্ব্ব গ্রাসের বাসনা। সেই ভীষণ লম্ফন, উর্দ্ধ অধের ভীষণ কৃষ্ণ কলেবর। সমস্তই যেন বিভীষিকাময়, সমস্তই যেন ঘোর বিভীষিকায় ভরা। উপরে কি কাল, মৃদু আলোক সাহায্যে সে ভীষণ ভাবের বৃদ্ধি হইয়াছে মাত্র। তাহা যেন আবার কাঁপিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে, এই যেন ভাঙ্গে ভাঙ্গে, পড়ে পড়ে। নিদাঘে ঘনঘটাময় ঘোরান্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়াছি। তৎকালীন প্রকৃতির সেই বিকট ভাবেও সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি।—মনে হইত "হায় মা বসুন্ধরা, তুমি কি তোমার কেশপাশ আলুলায়িত করিয়াছ? ক্ষণপ্রভা কি তোমার মধুর হাসি? হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গ কি তোমার সমুন্নত পয়োধর? স্রোতস্বিনী কি তোমার বিপুল নিতম্বের মেখলা?" কিন্তু এত ভয় কখন হইতনা। অনেক সময় বিদ্যুতের বিকট হাসি বা ব্যাঘ্রের ভৈরব হুঙ্কারে হৃদয় প্রকম্পিত হইয়াছে, কিন্তু সে দৃশ্য ইহার সঙ্গে তুলনীয় নহে। তাহাতেও মাধুরী আছে। কিন্তু ইহাতে কেবল আতঙ্ক,—কেবল আতঙ্ক।

সে সেতুর কথা আর কি বলিব? তাহা পুরু এক হস্ত পরিমাণ হইলেও দীর্ঘত্বের জন্য যেন অতি পাতলা দেখাইতেছে। তাহা যেন দুলিতেছে, যেন নমিত হইয়া যাইতেছে। হায় তাহার উপর দিয়া কি করিয়া এতদূর যাই? যাইতেছি বটে, কিন্তু প্রাণ যে কোথায় আছে তাহা কে জানে? এ যাতনার কথা কে বুঝিবে? সুধু ইহাই নয়, নিম্নে ভীষণ সমুদ্র, তাহাতে উর্ম্মির উপর উর্ম্মি খেলিতেছে। কত চক্রাবর্ত্ত,—জল সজোরে সবেগে ছুটিয়া আসিয়া প্রবল বেগে ঘুরিয়া যেন কোথায় পাতাল উদ্দেশে ছুটিতেছে। আবার স্ফীতি, আবার বিস্তৃতি, আবার উল্লম্ফন। ঐ যেন কোথায় নামিয়া যাইতেছে, আবার উর্দ্ধে—কত উর্দ্ধে উঠিতেছে তাহা কেমন করিয়া বলিব? ফেনরাশি যেন সেই বিকট বদনের ভীম দর্শনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহাতে যেন সকলই বিনষ্ট হয়। জল স্থানে স্থানে যেন জ্বলিতেছে, চক্ চক্ করিয়া উঠিতেছে, তাহাতে ও আবার কি? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাঙ্গর কুম্ভীর মুখ বাহির করিয়া আমাদের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিতেছে। যে সকল তরঙ্গ ঊর্দ্ধগামী, তাহাদের সঙ্গে দুই একটা কুম্ভীর উঠিয়া পুচ্ছ প্রসারণ করিয়া আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু বড়ই সৌভাগ্য যে, তাহা আমাদের অঙ্গে প্রতিহত হইতেছে না, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল কণা লাগিতেছে। তাহা দুর্গন্ধময়, আঠার মত চট্‌চটে। সে দৃশ্য যে আর দেখিতে পারি না, মানুষের প্রাণে আর কত সহিবে? অহো আর পারিলাম না। চক্ষু আর চাহিতে পারে না, মাথা আর ঠিক থাকে না। শুইয়া পড়িলাম, চিৎকার করিয়া বলিলাম—"আর পারি না দেব, মারিতে হয় মার, যাহা করিতে হয় কর।"

দূরে দিগ্‌দিগন্ত পূরিয়া সেই সকল ভৈরব আর্ত্তনাদ প্রতিধ্বনিত হইল। কিন্তু যে সমুদ্র, সেই সমুদ্র। সে স্থানের যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য, সেই দৃশ্য। কিন্তু হায় কোথায় যাই। আমরা পদে পদে ভাবি কি হয় কোথা যাই, তবুত কথাটার মীমাংসা হয় না।

কতক্ষণ লাগিল জানি না, কেমন করিয়া আসিলাম জানি না, কিন্তু চক্ষু মুদিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, সেই বিপদবারণ মধুসূদন নাম জপ করিতে করিতে পর পারে আসিয়া পড়িলাম। জীবনে এমন করিয়া কখন ভগবানকে ডাকি নাই। হায়রে বিপদ ভিন্ন কি তাঁহাকে এমন করিয়া ডাকা যায় না? ক্রমে চক্ষু চাহিলাম। হায় ভগবান তোমার রাজ্যে কি বিপদের শেষ নাই, বিভীষিকার অন্ত নাই? তুমি লোককে যেমন হাসাইতে পার, আবার তেমনি কাঁদাইতে পার। এত যাতনা—এত চখের জলেও কি তোমার দয়া হয় না? আর কত যাতনা দিবে? হৃদয় যে ফাটিয়া যায়—তাহার স্তরে স্তরে যে ভীম হুতাশন জ্বলিতে থাকে, আর পরি না। বিপদের পর বিপদ আর সহ্য হয় না।

মনুষ্য জন্ম কি কেবল পরীক্ষার স্থান? যদি তাহা হয় তবে মনে হয় ঠিকই হইতেছে। কি ভাল কি মন্দ তাহা তুমি জলে স্থলে অনিলে লিখিয়া রাখিয়াছ। আমি বুঝি না, বা বুঝিতে ভুল করি, আর নূতন যাতনা পাই। বস্তুতঃ ভ্রান্তিরও তোমার কাছে নিস্তার নাই। যে সাধু, যে তোমার রাজ্যের প্রকৃত বিষয়ী, তিনি সহস্র বার না ভাবিয়া একটী পা ফেলেন না। তাই তুমি তাঁর সহায়। আমরা নির্ব্বোধ, ভ্রান্ত, দাম্ভিক, আমাদের যদি যাতনার শেষ হইবে তবে তোমার মহিমার প্রচার হইবে কিসে? বিশ্বপতি, হৃদয়ে বুদ্ধি দাও, জ্ঞান দাও, সাহস দাও; আর কেন?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নরক

পর পারে যাইবা মাত্র যোদ্ধৃবেশধারী কতিপয় লোক আমাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরাও আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বলিলাম। তখন তাঁহারা মৃদু হাসিয়া বলিলেন "কি চাও ?"

আমি। কিছু খাইতে দিন, ক্ষুধায় প্রাণ যায়।

তাহাদের মধ্যে একজন একটী মানুষের হাত, হস্তীর শুঁড়, অশ্বের পা, প্রভৃতি কতকগুলি অখাদ্য আনিয়া বলিলেন "খাও।"

আমি ত অবাক। বলিলাম "একি !"

"খাবার।"

"একি খায় ?"

"খায় বই কি, না খাইলে দিব কেন ?"

করালী বলিল "খাইলেও আমি খাই না, কারণ আমি মহামতি অল্‌কটের শিষ্য।

তাঁহাদের মধ্যে একজন হাসিয়া কহিলেন "অল্‌কট বুঝি লম্বা চুল রাখিতে আর দিন দিন নূতন বিবাহ করিতে বলিয়া দিয়াছেন।"

করালী আর কোন কথা কহিল না। তখন লোকটী আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "তুমি ত মাংসাশী;—খাওনা।"

আমি। পৃথিবীর সভ্য জাতিদের ভিতর এ সকল মাংসের প্রচলন নাই।

একজন হাসিয়া বলিলেন "তোমরা যদি সভ্য তবে অসভ্য কে ? সেই আসামের প্রান্ত দেশে কুকিদের সভ্যতা থাকিতে পারে, তোমাদের নাই। যাহাদের দেব দ্বিজে ভক্তি নাই, ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাহারা যদি সভ্য হয় তবে অসভ্য কে ? সে যাহাই হোক এখন খাও, এ সকল অখাদ্য নয়, সভ্য জগতেই ইহার আদর। যুদ্ধের সময় হাতি ঘোড়া চলে, নরমাংস, নরশোণিত নেপোলিয়ান মাস্‌কো যুদ্ধে চালাইয়াছেন। অভাবে না হয় কি।"

আমি। আমি প্রাণ থাকিতে ও সব স্পর্শ করিব না।

তখন একজন আমাদিগকে কতকগুলি কচুর মত কি এক সামগ্রী আনিয়া দিলেন। দেখিলাম সে গুলি দগ্ধ করা। কি করি তাহাই খাইলাম, খাইবার সময় মনে হইল "হা ভগবান, শেষ কচু পোড়াও খাওয়াইলে ?"

কিন্তু ঠকিলাম না, দেখিলাম তাহার আস্বাদন বড় মধুব। হইলে কি হয়, খাইতে পারিলাম না; সে স্থানের ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধে পেটে কিছু প্রবেশ করিতে চায় না,—বাহির হইতেই চায়। কিন্তু এ দুর্গন্ধ কিসের? একি সমুদ্রের জলের গন্ধ? কালাপানির জলের নাকি ভারি দুর্গন্ধ, কিন্তু এত কখনই গন্ধ নয়। অবশেষে বুঝিলাম, সমুদ্রের দিক অপেক্ষা অপর দিক হইতেই বেশি আসিতেছে, তবে এ কিসের গন্ধ? মনে করিলাম জিজ্ঞাসা করি কিন্তু তাহাদিগের ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে জিজ্ঞাসা করিতে যেন ভয় হইতে লাগিল। একটী লোক বলিলেন "কি ভাবিতেছ?"

আমি। এ দুর্গন্ধ কিসের?

লোক। নরমাংসের।

দেহে আর প্রাণ নাই, ভাবিলাম এতদিনে ঠিক পরিণাম হইল। ইহারা বোধ হয় মানুষ খায়, নতুবা মানুষের হাত আমাদিগকে খাইতে দিবে কেন? দেখিলাম করালী তখন আঙ্গুলে পৈতা জড়াইয়া গায়ত্রী জপিতেছে।

আমি। এ স্থানটী কি?

লোক। দেখিলেই বুঝিবে।

আর দেখিতে হইবে কেন? মনে হইল এই খানে বোধ হয় প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ প্রাণী হত্যা হয়, সেই গলিত নরমাংসের এই দুর্গন্ধ। কর্ণকুহর যে বধির হইল; এত আর্ত্তনাদ কিসেব? ক্রমিক হত্যা ভিন্ন আর কিছুই ত সম্ভবে না। আর দাঁড়াইতে পারি না। পদদ্বয় আর দেহের ভার বহনে অশক্ত। বলিলাম "বাপু আমাদের দশা কি হইবে।"

লোক। কি চাও?

আমি। পথ দেখাইয়া দিলে বাহিরে যাই।

লোক। কোথায় যাইবে?

আমি। ভগবান যেখানে নিয়ে যান।

লোক। তিনিত এই খানেই পাঠাইয়াছেন, ঈশ্বরে যদি এত বিশ্বাস তবে এই খানেই সুখী হইয়া থাক না।

চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, বলিলাম "তাহা হইলে আর বাচিব না।"

লোক। কেন?

আমি। বড় দুর্গন্ধ।

লোক। মনুষ্য হইয়া গলিত মনুষ্যমাংসের গন্ধ সহ্য করিতে পারিতেছ না?

এই ত সেই কথাতেই যে আসিতেছে। তবে এইবার গেলাম। তখন লোকটী বলিল "তবে নিতান্তই কি এখানের মায়া কাটাইবে?"

আমি। যদি অনুগ্রহ করেন।

লোক। আমাদের অনুগ্রহ নিগ্রহ নাই, আমরা কাঠের পুতুল, কলে নড়ি। তবে তোমাদের ভাগ্য বড় সুপ্রসন্ন যে, এত শীঘ অব্যাহতি পাইলে।

আমি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম "তবে পথ দেখাইয়া দিলে বড় ভাল হয়।"

লোক। পথ আমি চিনি না, তবে বাহিরে দিয়া আসিতেছি, যেখানে যাইতে হয় যাও।

নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। লোকটী অগ্রগামী হইলেন, আমরা তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

দেখিলাম সমস্তটী একটী মহাচতুষ্কোণ স্থান, সমস্তটী কাল পাথরে গাঁথা। উপরেও কাল পাথরের আচ্ছাদন। পূর্ব্বে যে আচ্ছাদনের কথা বলিয়াছি, এখান পর্য্যন্ত তাহা বিস্তৃত। চতুর্দ্দিকে পথ, পথের দুই ধারে লোহার রেল। পথের দুই ধারে প্রায় পাঁচ হাত গভীর এক একটী বৃহদাকারের চতুষ্কোণ গর্ত্ত। তাহার চতুর্দ্দিকেই পথ। তাহারই প্রতি কোণে এক একটী প্রহরী। সেই সকল গহ্বরের পার্শ্বস্থ পথ দিয়া চলিলাম।

প্রথমে দেখিলাম তাহারই একটীতে বহু নরনারী রহিয়াছে। মলিন বেশ, রুক্ষ কেশ, শরীর জীর্ণ। তাহাদের প্রত্যেককে এক একটী দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ পুরুষ ধরিয়া তাহাদের জিহ্বা টানিয়া বাহির করিয়া শাণিত অস্ত্র দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে। আবার তখনি তাহা জুড়িয়া যাইতেছে। রুধিরে স্থানটী পূর্ণ, অসংখ্য শৃগাল কুক্কুর তাহা পান করিতেছে। কখন বা মাংস লোভে তাহাদের বদন দংশন করিতেছে। কাহার সাধ্য সে দুর্গন্ধ সহ্য করে। আর আর্ত্তনাদই বা কি! আমি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আমার পথ প্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলাম "ইহারা কে?"

"সাধারণ মিথ্যাবাদী।"

আমি বলিলাম "তবে কি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মিথ্যাবাদীর ভিন্ন প্রকার শাস্তি আছে না কি?"

লোকটী হাসিয়া কহিল "তাহা আবার নাই। আমাদের বামে দক্ষিণে যে অগণিত গহ্বরশ্রেণী দেখিতেছ, উহাতে ভিন্ন ভিন্ন অপরাধীর ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি প্রদত্ত হইতেছে। সকলগুলি দেখিবে কি?"

আমি ভয়ে বলিলাম "না।"

বামে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি সেখানে অগণিত লোককে পায়ে ধরিয়া ভীম বেগে ঘুরাইতেছে। পরস্পরের মস্তক প্রচণ্ড রূপে আহত হইতেছে। তীব্র বেগে শোণিত পাত হইতেছে। কিন্তু কেহ প্রাণে মরে না। কেবল যাতনাই অনুভব করে। যাতনায় অস্থির হইয়া কেহ বলিতেছে "আর কখন করিব না। এবার দয়া কর।"

কে তাহাদের কথা শুনে। কেহ বলিতেছে "হা ভগবান্, দয়া কর, দয়া কর।"

আমি ভয়ার্ত্ত হইয়া বলিলাম "ইহারা কে?"

"প্রবঞ্চক।"

আবার অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম দক্ষিণ দিকে রাশি রাশি লোকের হস্তে উত্তপ্ত লৌহশলাকা প্রবেশ করাইয়া দিতেছে। সে কি দুর্গন্ধ! যাতনাই বা কি! তাহারা যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, আর শাস্তি প্রদাতাদের পদতলে লুণ্ঠিত হইতেছে।

আমি বলিলাম "বাপু ইহারা কে?"

"চোর।"

আর বামে তাকাইলাম না, মনে করিলাম যত দেখিতে না হয় ততই ভাল, অগ্রগামী হইলাম। দেখিলাম, গহ্বরের প্রায় দুই হস্ত পরিমাণ উচ্চে এক প্রাচীর হইতে অন্য প্রাচীর পর্য্যন্ত লোহার রেল পাতা রহিয়াছে। রেল গুলি উত্তপ্ত, সুবর্ণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে, আমরা সেখানে যেন দাঁড়াইতে পারি না; এত উত্তাপ! তাহারই উপর উলঙ্গিনী রমণীকুলকে বসাইয়া পায়ে ধরিয়া এ দিক হইতে ওদিক টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে। কি দুর্গন্ধ! কি আর্ত্তনাদ! স্তন যুগলে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা বিদ্ধ,--মধ্যে মধ্যে তাহা বদলাইয়া অন্য শলাকা দিতেছে। সে সময়ের আবার কি ভীষণ আর্ত্তনাদ। কি অনুনয় বিনয়, কি কাতরতা! একটী স্ত্রীলোক আমাদিগকে উল্লেখ করিয়া বলিল "ঐ পাপিষ্ঠ-দের জন্যই এই যাতনা।"

আমি বলিলাম "ইহারা কে?"

"ব্যভিচারিণী।"

বলিলাম "পরদারগামী পুরুষদের কি শাস্তি?"

আমাদের সমভিব্যাহারী ব্যক্তি বলিলেন "এই দিকে দেখ।"

আমরা ফিরিয়া দেখিলাম শত শত যুবক দণ্ডায়মান, আর সহস্র সহস্র নিরুপমা সুন্দরী যুবতী তাহাদের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া মৃদু হাসিয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যতা। যুবকগণ প্রাণপণে তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রানের চেষ্টা পাইতেছে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। রমণীরা তাহাদিগকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিতেছে, মুখ চুম্বন করিতেছে। পীবরোন্নত পয়োধর বক্ষে সম্বদ্ধ হইতেছে, কিন্তু কি যাতনা, কি আর্ত্তনাদ! যুবতীরা লৌহময়ী, তাহাতে প্রবল উত্তাপে উত্তপ্তা। সে ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া শরীর শিহরিল, প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

আমি করালীর দিকে চাহিলাম। দেখিলাম করালীর চক্ষু যেন বাহির হইতে যাইতেছে, মুখ যেন দীর্ঘ হইয়াছে, নিশ্বাস সঘন বহিতেছে। করালী আমায় ইঙ্গিতে বলিল "আমরাও বাদ যাইব না।"

আমিও তাহাই ঠিক করিলাম।

তাহার পার্শ্বে দেখি আর এক মহা ব্যাপার,—এক একটী শাণিত অথচ উত্তপ্ত অর্দ্ধগোলাকার তরবাল রহিয়াছে, তাহার পার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড জলাধার; কৃতান্তসম পুরুষগণ রমণীগণকে সেই অস্ত্রে বসাইয়া দুই পা ধরিয়া টানিতেছে। যখন কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত চিরিয়া যাইতেছে, তখন কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে নামাইয়া উদর ও বক্ষ মধ্যস্থ যকৃৎ, ফুস্‌ফুস্, অন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত সারমেয় দ্বারা আহার করাইয়া পার্শ্বস্থ জলে ডুবাইতেছে। দেহ আবার জোড়া লাগিয়া পূর্ব্ববৎ হইতেছে। কিন্তু তখনি আবার তাহাকে সেই অর্দ্ধ গোলাকার অস্ত্রে বসাইয়া চিরিয়া ফেলিতেছে। কি যাতনা, কি আর্ত্তনাদ! মনে করিলাম, হা ভগবান, এই কি তোমার শাস্তি দেওয়া? তুমি আবার দয়াময়? তাহারা যাতনায় কত পূর্ব্ব কথা বলিয়া চক্ষুজলে ভাসিতেছে। কি কাতরতা, কি অনুতাপ! কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "ইহারা কে?"

"স্বামি-ঘাতিনী স্বৈরিণী।"

তাহার পর দেখিলাম কতকগুলি লোকের মাথার খুলি তুলিয়া ফেলিয়া তাহাতে জ্বলন্ত লৌহ ঢালিয়া দিতেছে। লোহা শীতল হইয়া জমিয়া যায় আর ফেলিয়া দেয়, আবার ঢালিতে থাকে। এ বীভৎস যাতনা আর দেখিতে পারিলাম না। দ্রুতপদে তথা হইতে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "ইহারা কে?"

"পিতৃহন্তা।"

তাহার পরদিকে দেখি রাশি রাশি লোকের পায়ে দড়ি বাধিয়া ঝুলান। নিম্নে কটাহে তৈল উত্তপ্ত হইতেছে, তাহাতে মস্তক নিমর্জ্জিত। মস্তক তুলিলেই লোহার ডাঙ্গস দিয়া সজোরে প্রহার করিতেছে। এক একবার মাথা তুলিতেছে, অমনি প্রহার—অমনি আবার সেই মস্তকগুলি তৈলে ভর্জিত হইতেছে। যাতনায় অধীর হইয়া মাথা তুলিতেছে, অমনি প্রহার, আবার সেই যাতনা। ভয়ে প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। বলিলাম "ইহারা কে ?"

"অবিচারক।"

তাহার পার্শ্বে দেখি কতকগুলি লোককে যন্ত্র বিশেষের মধ্যে ফেলিয়া নিষ্পেষিত করিতেছে,—গ্রন্থি সমূহ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। অস্থি মাংস ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে, আর আর্ত্তনাদ করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "ইহারা কে ?"

"অত্যাচারী রাজা।"

তাহার পরবর্ত্তী স্থানে দেখি সহস্র সহস্র শকুনি গৃধিনী একত্রিত হইয়া মহানন্দে মনুষ্যের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া খাইতেছে। সে এক ভীষণ হৃদয়-বিদারী দৃশ্য। বলিলাম "ইহারা কে ?"

"পরশ্রীকাতর।"

তাহার পরেই দেখি যে, রাশি রাশি লোক চিৎ হইয়া হাঁ করিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। মুখে ধূ ধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে। একটু নিভিলেই কি তাহাতে ঢালিয়া দিতেছে, অমনি তাহা আবার ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। দেখিলাম তাহাদের নড়িবার ক্ষমতা নাই। উত্তম করিয়া শৃঙ্খলে বদ্ধ। কিন্তু যাতনারও অবধি নাই।

বলিলাম "ইহারা কে ?"

"গুরুজনে অপ্রিয়বাদী।"

তাহার পর দেখি, দুই হাত পরিমাণ উচ্চ উত্তপ্ত বালুকা ছড়ান রহিয়াছে। বালুকার উপর কতকগুলি লোক ছট্‌ফট্ করিতেছে। যন্ত্রণায়, পিপাসায় অস্থির, —ছুটাছুটির পরিসীমা নাই, কিন্তু যাতনারও শেষ নাই। "গেলাম গেলাম" করিয়া চিৎকার করিতেছে।

জিজ্ঞাসিলাম "ইহারা কে?"

"রাজদ্রোহী।"

অপর দিকে দেখি, সে স্থানটী তাম্র নির্ম্মিত, কিন্তু ভয়ানক উত্তপ্ত, বাল-সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। তাহাতে কতকগুলি লোক ছুটাছুটি করিতেছে, পদতলের যাতনায় অস্থির হইয়া পড়িয়া যাইতেছে। অমনি সমস্ত দেহ দগ্ধ হইতেছে, আবার উঠিতেছে, আবার আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ছুটিতেছে। বলিলাম "ইহারা কে?"

"ব্রহ্মস্বাপহারী।"

অপর স্থানে দেখি, সে স্থানটী কেবল তীক্ষ্ণধার সূচি দ্বারা আচ্ছাদিত,—ঘন সন্নিবিষ্ট সজারুর কাঁটার মত উর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে। সেই ভীষণ অস্ত্রে কতকগুলি লোক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে।

বলিলাম "ইহারা কে?"

"স্বধর্ম্মত্যাগী।"

আর এক স্থানে দেখিলাম, রাশি রাশি লোক শুইয়া আছে, তাহাদিগকে অসংখ্য শৃগালে পদাঘাত করিতেছে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করিতেছে।

বলিলাম "ইহারা কে?"

"রণে-ভঙ্গ বীর।"

তাহার পার্শ্বেই দেখি, কেবল রাশি রাশি বরফ বিস্তৃত রহিয়াছে। উর্দ্ধ হইতে অতিশীতল তুষারকণা বর্ষিত হইতেছে। সেই বরফে কম্পিতকলেবরে স্ত্রী পুত্র লইয়া কতকগুলি লোক বসিয়া আছে।

বলিলাম "ইহারা কে?"

"পরস্বাপহারী।"

তাহারই পরে দেখি, কত শীত বস্ত্র ছড়ান, কত খোলা লোহার সিন্ধুকে রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা, হীরা, মণি, মুক্তা· কিন্তু তাহার মধ্যে বসিয়া লোকে চিৎকার করিতেছে, বলিতেছে "ক্ষুধায় প্রাণ যায়, খেতে দাও, জল দাও।"

বলিলাম "ইহারা কে?"

"কৃপণ।"

তাহারই পর আবার দেখি, মল-মূত্রের হ্রদ। তাহাতে রাশি রাশি লোক হাবু

ডুবু খাইতেছে, আর তাহাদের অঙ্গে রাশি রাশি বৃহদাকার কৃমি দংশন করিতেছে। তাহাদের আর্ত্তনাদ দেখে কে।

বলিলাম "ইহারা কে?"

"ভণ্ড হরিভক্ত।"

ইহাদের মাথার চুল দেখিলাম না, মস্তকে শিখা আছে। পরিধান কৌপীন। ভাবিলাম,—"যত নেড়ানেড়ীব কি এইখানে মরণ।"

অপর দিকে দেখি, কত লোক রক্তাক্ত কলেবরে পড়িয়া আছে, কাহারও হস্ত শূন্য, কাহারও পদ নাই, কাহারও গণ্ডের মাংস নাই, কাহারও বক্ষ বিদীর্ণ হইয়াছে, কাহারও বা উদর নাই। কিন্তু সকলেই সচেতন, সকলেই যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে, আর ভীষণদর্শন বিকটবদন এক প্রকার জীব তাহাদের শরীরের মাংস ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। কি চক্ষু! কি ভীষণ দংষ্ট্রা,—কি ঘোর মসী বিনিন্দিত বর্ণ, হস্ত পদাদির কি ভীষণ গঠন, আমাদের দেখিয়া তাহারা যেন বিকট হাসি হাসিল, সে হাসির রবে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। আমরা ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া তথা হইতে পলাইয়া আসিয়া বিশুষ্ক বদনে বলিলাম "ইহারা কে?"

"মাংসভোজী হিন্দু।"

তাহার পর দেখি, কেবল কৃষ্ণ সর্পের ছড়াছড়ি। কি ফণা, কি গর্জ্জন! আসে পাশে সকলকে দংশন করিতেছে। আর তাহারা যন্ত্রণায় ছটফট্ করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। কিন্তু নিস্তার কোথায়? সর্পেরাও ছুটিতেছে, আর দংশন করিতেছে।

বলিলাম "ইহারা কে?"

"ক্রুর।"

তাহার পর দেখি আর একটী স্থানে বড় বড় বৃশ্চিক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দাড়া লইয়া মনুষ্যেব পশ্চাতে ছুটিতেছে, আর তাহাদিগকে দংশন করিতেছে। কি ভয়ঙ্কর বর্ণ, কি ভয়ঙ্কর বিষ। লোকেদের যাতনা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

বলিলাম "ইহারা কে?"

"হিংস্রক।"

তাহার পরে দেখি ধূ ধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে। লক্ লক্ করিয়া শিখা উঠিতেছে; তাহার উপর আবার অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে। এ যে মহাপ্রলয়ের

লক্ষণ। সেই অগ্নি শিখার মধ্যে কতকগুলি নর নারী। একে তাহারা যাতনায় অস্থির, তাহার উপর জ্বলন্ত সাঁড়াসি দিয়া তাহাদের বক্ষের মাংস ছিঁড়িয়া লইয়া শকুনি গৃধিনীকে খাইতে দিতেছে। উঃ কি যাতনা, কি আর্ত্তনাদ, কি চিৎকার! বসুন্ধরা তুমি বিদীর্ণ হও, তোমার মধ্যে প্রবেশ করি; আর যে দেখিতে পারি না।

আমি বিশুষ্ক বদনে বলিলাম "ইহারা কে?"

"বিমাতাভিগামী ও বিমাতা।"

করালী বলিল "বাপু আর কতটা আছে?"

"বেশী নয়।"

"যাই হোক, আর আমরা এমন ক'রে যেতে পার্‌বো না।"

"কি কর্‌বে?"

"চখে কাপড় বেঁধে দাও, তোমায় ধরে ধরে যাব।"

লোকটা বলিল "সে নিয়ম নাই, দেখিতেই হইবে।"

তখন করালী বলিল "আর কেন বাপু, মতলব্‌টা খুলে বল, কোথায় আমাদিগকে ফেলিতে ইচ্ছা কর ফেল।"

লোকটা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাহা হইলে এতক্ষণ ফেলিতাম। সে ভয় আর নাই।

করালী তখন তাহার দুটি পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আর দুঃখ দিও না।"

লোকটা হাসিয়া বলিল "ব্রাহ্মণ শূদ্র পৃথিবীতে,—এখানে নয়। কর্ম্মফলে চর্ম্মকার স্বর্গে যায়, আর ব্রাহ্মণ নরক যাতনা ভোগ করে।"

করালী আর পা ছাড়ে না, বলিল "দোহাই বাবা, আমাদের চোক বেঁধে দাও।"

লোকটা অগত্যা স্বীকার পাইল। আমাদের চক্ষু বাঁধিয়া দিল, আমরা তাহার হাত ধরিয়া চলিলাম। কিন্তু আর্ত্তনাদ ও চিৎকারে কর্ণ বধির হইতে লাগিল। ভাবিলাম, ভগবান, আমাদের দশায় কি লিখিয়াছ, তাহা কে জানে?

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পরিত্রাণ।

কিছুক্ষণ পরে আমাদের চক্ষের বন্ধন উন্মোচিত হইল। তখন দেখি, আমরা সে ভয়াবহ স্থানে আর নাই, বাহিরে আসিয়াছি। তখন পথ-প্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলাম "ঐ সকল লোক কতদিন অমন যাতনা ভোগ করবে?"

"তাহার কি স্থির আছে, কেহ শত বর্ষ—কেহ সহস্র বর্ষ—এইরূপ।"

সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, বলিলাম "বাপু এই কি নরক?"

লোক। না না, এত আমাদের দেশের কারাগার।

আমি। তবে লোক এত যাতনা সহ্য করিয়াও মরে না কেন?

লোক। মায়া বলে।

আমি। তবে এ নরক নয়?

লোক। আমরা ত তাই জানি, শুনেছি নরক যাতনা আরও ভয়ানক।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম "ইহা অপেক্ষাও?"

লোক। এইরূপ প্রবাদ।

তখন তাহাকে বিদায় দিয়া আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। কতকদূর যাইয়া বলিলাম "করালী, এটাও নরক নয় বলে যে?"

করালী। ও কথা শোন কেন? অমনি অমনি সরে এসেছি তাই ঢের।

আমি। এর চেয়ে আর নরকে বেশী কি হবে?

করালী। হয় ভালই ত। যতক্ষণ আমাদের না ফেল্‌চে, ততক্ষণ ভয় কি?

আমি। যদি সাহসই এত, তবে অত পায়ে পড়্‌লে কেন?

করালী হাসিয়া কহিল "সেটা গরজে।"

আমি। আমার মনে হয়, তবে আরও নরক আছে।

করালী। হতে পারে, কিন্তু এটী তারই একটী। শুক্রগ্রহে জাতি ভেদ নাই, তবে ব্রহ্মস্বাপহারীর শাস্তি কোথা থেকে হয়।

আমি। তা বটে।

মনটা উহারই মধ্যে কিছু আশ্বস্ত হইল। ইহা অপেক্ষা আরও যাতনার কথা ভাবিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না। আমরা যে স্থানটীতে উপস্থিত, সেটীকে কি বলিব? পর্ব্বতও নয়, আর সুন্দর বিস্তৃত সমতল ভূমিও নয়। কোথাও উচ্চ, কোথাও নীচ। নিম্ন স্থান গুলিতে বালুকা পূর্ণ, দেখিলেই যেন মনে

হয়, এখানে কখন নদীর প্রবাহ ছিল, কিন্তু কালে তাহা লয় পাইয়াছে। চতুর্দ্দিকে একই দৃশ্য, কেবল পশ্চাৎদিকে সেই নরক অবস্থিত। এখান হইতে নরকের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, মনে হয় একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বত মাত্র আছে। আমাদের সম্মুখে অনেক দূরে পর্ব্বতমালা বিরাজমান। রাশি রাশি চূড়া দেখা যাইতেছে, কিন্তু তাহারই একটী সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। চতুর্দ্দিকে নব কিশলয় দামে পরিশোভিত। নব দূর্ব্বাদলের এমন কমনীয়তা, এমন চাকচিক্য, বুঝি আর কখন কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।

তখন সূর্য্যদেব বিদায় কালীন করজাল বিস্তার করিয়াছেন। আমরা একটী উচ্চ ভূমিখণ্ডে রাত্রি যাপন করিবার স্থির করিয়া তথায় উপবিষ্ট হইলাম। অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম, মনের গতিও নিতান্ত কদর্য্য, সুতরাং আর অধিকক্ষণ বসিতে পারিলাম না। সেই ভূমিশয্যায় শয়ন করিলাম। আকাশ পাতাল কতই ভাবিতে লাগিলাম। কি ছিলাম, কি হইলাম, আবার কি হইব— এইরূপ নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। তখন সেই নক্ষত্র খচিত সুবিস্তৃত আকাশের দিকে দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম, সেই প্রশান্ত অর্দ্ধ গোলাকার নীলিমার মধ্যে কত কি যেন জ্বলিতেছে। কি মহান ব্যাপার, কি অদ্ভুত বিশ্বরচনা। কি প্রশান্ত ভাব, কি গাম্ভীর্য্য, হৃদয় তাহার ধারণাই করিতে পারে না। উহার সকল গুলিই কি এক একটী পৃথিবী? বস্তুতঃ ইহাই মনুষ্যকে আপনার ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করাইয়া দেয়। রাজাধিরাজ যে হও, একবার তন্ময়চিত্তে আকাশের দিকে চাও দেখি, বুঝিবে তুমি কে? তৃণাণুতৃণ,—ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র!

মন সে দিক হইতে ফিরাইলাম। কে ভাবে? সেই অসীমত্বের কথা ভাবিলে সেই অসীম মহাপুরুষকে মনে পড়ে। ক্ষুদ্র হৃদয়ে তত চিন্তার শক্তি কই? জ্ঞান, প্রশান্ত হৃদয়বান পুরুষেই শোভা পায়—আমরা যে অতি দুর্ব্বল, অতি নীচ—অতি হেয়।

জ্ঞানের আধিক্যই মনুষ্যকে দিশেহারা করে, তাহার ক্ষমতা আমাদিগকে উন্মত্ত করে, আমাদের দুর্ব্বল বিবেচনাশক্তির উপর অতিরিক্ত ভার চাপায়, আমরা অহঙ্কারের অতল তলে ডুবিয়া মরি। স্বভাবের বিচিত্র সৌন্দর্য্য, অদ্ভুত মহানুভবতা ও প্রশান্ততা দেখিলে মনে কি হয়? তাহাদের নির্ম্মাতার অস্তিত্বের কথা জাগিয়া উঠে, অথবা এমন কোন চিন্তা আসে যাহা অনুভব করিবার ক্ষমতা মনুষ্যের আদৌ নাই। সত্য, নিবিড় অন্ধকারে নিভৃতে বসিয়া আছেন, তাহা যদ্যপি সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাময় হইতেন তাহা হইলে

কি হইত বলিতে পারি না। হয়ত আমাদিগকে ধ্বংস করিত। পূর্ণজ্ঞান মনুষ্যের জন্য নয়, কেননা মহান বিষয়ের ধারণা করিবার ক্ষমতা তাহাতে সম্ভবে না।

ঐ যে অব্যক্ত অচিন্ত্য জ্ঞানভাণ্ডার স্বরূপ নক্ষত্রমণ্ডলী ঘুরিতেছে, পরস্পর পরস্পরকে পরিক্রমণ করিতেছে। কোন তেজে, কোন নৈসর্গিক ক্ষমতা বলে তাহা সম্পাদিত হয়, তাহা ভাবিতে গেলে মনুষ্যের ক্ষুদ্র জ্ঞান ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যে কোথায় মিলাইয়া যায় তাহা কি করিয়া বলিব? হয়ত এ রাজ্যে অন্যভাব হইতে পারে, কিন্তু ধরাধামে—রক্তমাংসের শরীর লইয়া মনুষ্যের জ্ঞানের পূর্ণত্ব নাই। মনুষ্য জলবিম্বের মত একবার মাত্র ভাসিয়া আবার বিলয় পায়, কোথায় যায়, তাহার উত্তর কে দিবে?

এ সকল চিন্তা কষ্টপ্রদ। কষ্টপ্রদ, কেননা মনে আপনা হইতে চিন্তার অকৃতকার্য্যতা প্রতিপন্ন হয়। সময়ের অসীম নিস্তব্ধতার মধ্যে আমাদের কণ্ঠস্বর অতি অসার। আমাদের এই অল্পবুদ্ধি কি নক্ষত্রমালা পরিশোভিত ঐ আকাশের গুহ্য রহস্য ভেদে সমর্থ? কখন না। কেবল অসার কল্পনার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র শুনা যায়। মনুষ্যের জ্ঞান, প্রতিভা, বিবেচনা প্রভৃতি অঙ্গুলি বদ্ধ জলের মত আপনা আপনি গলিয়া পড়ে, আমরা বিস্মিত হইয়া তাহা ধরিতে যাই, কিন্তু আর ধরিতে পারি না। এত অসারতা সত্ত্বেও তবু যেন মনে হয় কে যেন ঐ প্রশান্ত গগনে বিরাজমান, কাহার যেন কণ্ঠস্বর কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয়। সে ধ্বনি অতি ক্ষণস্থায়ী, আর তাহাও আছে বিশ্বাসে। বিশ্বাসহীন হৃদয়ে আত্মার বিনাশ সাধিত হয়। বিশ্বাসে স্বর্গের পবিত্র ছায়া যেন হৃদয় মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়।

মন কেমন এক মহান চিন্তায় ব্যস্ত হইল, প্রশান্ত গগনের কথা ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়ে যেন এক অতি প্রশান্ত ভাব জাগিয়া উঠিতে লাগিল, তখন সে চিন্তা ত্যাগ করিয়া গলা ছাড়িয়া প্রাণ ভরিয়া গাহিলাম,—

কোথায় আছে সে,
বনে কিবা মনমাঝে, কি তারাময়ী আকাশে?
ধীরা তরঙ্গিণী জল চলে করি কল কল
তাঁহারই মহিমাগান গাহে বুঝি উল্লাসে।
পাখীর কাকলী হায় বুঝি তাঁরি গুণ গায়
উধাও হইয়া ধায় দেখিবার উদ্দেশে।

মৃদুল পবন বায় কাণে যেন বলে যায়
বল কোথা তিনি, আমি—বহি যাঁর নিশ্বাসে ?
প্রভাকর শশধর সে করে বিতরে কর
আলু থালু তারাদল উঠে যাঁর আদেশে।
ঐ কি সে রূপরাশি উজলিত দশ দিশি
নানা তাঁর ক্ষীণপ্রভা, ক্ষণপ্রভা—বিকাশে।
ফুলের সুবাস ভরা বিলাসে বিভোর ধরা
কোথারে সে মনচোরা কাঁদি আমি যার আশে ?

গান থামিল, কিন্তু আবার কত চিন্তার উদয় হইল। ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম। যখন জাগরিত হইলাম তখন দেখিলাম, শুভ্র বসনা উষা সুন্দরী যেন মৃদু হাস্য সহকারে ধরাধামে অবতীর্ণা। সেই সুন্দরীর বর্ণমাধুর্য্যে অন্ধকার যেন লজ্জা পাইয়া ধীরে ধীরে কোথায় লুকাইতেছে। প্রকৃতি সে মধুর রূপ দর্শনে হাস্যময়ী—পক্ষিগণ পুলকে পূর্ণ, ক্রমে ধীরে ধীরে, অতি ধীরে, যেন ঔজ্জ্বল্য রাশি আরও ছড়াইয়া পড়িল। পূর্ব্ব দিকে ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব উদয় হইয়া সুন্দরীর সুন্দর ভালে সিন্দুর বিন্দুর ন্যায় শোভা পাইলেন। তখন সে সৌন্দর্য্য ছটায় ধরাধাম মুগ্ধ হইল। সে শোভা অতুল, অসীম !

সেই শ্যামল ক্ষেত্রে সূর্য্যরশ্মি যেন কি এক বিশ্ব-বিমোহন শোভা ধারণ করিল, তাহা যেন আবার পর্ব্বত অঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া হাসিয়া হাসিয়া ছুটিল। আমরাও সেই স্বর্গীয় শোভায় মোহিত হইয়া সেই অজ্ঞাত অপরিচিত দেশে বিধাতার গুপ্ত অনির্দ্দিষ্ট আদেশ প্রতিপালনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। ভাবিলাম, এ জনহীন প্রাণীশূন্য দেশে যাই কোথায় ? ভাবিলাম, হায় আমরা সাধ করিয়া কেন এ নিগড় পায়ে দিলাম, কি করিয়া এখান হইতে অব্যাহতি পাইব। পাইব কি না তাহাই বা কে বলিয়া দিবে ? কিন্তু সেই পঞ্চদশ দিন কি এখনও পূর্ণ হয় নাই ? না সেটা প্রবঞ্চনা ? আমাদিগকে এ দেশে চিরদিন হয়ত এমনি অনাথ অসহায় ভাবে থাকিতে হইবে। বড় বিষম ভাবনার বিষয়। কিন্তু উপায়ও নাই। তখন কাজেই আমরা এক দিকে চলিলাম, যত যাই, সেই একই ভাব, কোথাও জন-মানবের চিহ্নমাত্র নাই। মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত, তথাপি কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন নিরাশ হৃদয়ে পার্ব্বতীয় বৃক্ষ হইতে বনজাত ফলমূল আহরণ করিয়া একটী ক্ষুদ্রা তরঙ্গিণী তীরে স্নানের আয়োজন করিলাম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন আকাঙ্ক্ষা।

আহারান্তে বসিয়া আছি, এমন সময় একটী প্রস্তরের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। যেন তাহাতে কি লেখা রহিয়াছে, কিন্তু অস্পষ্ট। অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টা করিয়া পড়িলাম। তাহা এইরূপ—

হের মেঘ সম্মুখে তোমার,
আছে দ্বার দক্ষিণে উহার,
দেব মূর্ত্তি বিরাজে ভিতরে।
আঁখি নীর ঝরিবে যেখানে,
নিহিত অপূর্ব্ব রত্ন পাইবে তথায়।
সাবধান হ'ওনা বঞ্চিত,
ছেলে খেলা শোভে নাক আর,
দিবা অবসান প্রায়, নেহার পশ্চিমে—
বিদায় মাগিছে রবি জগজন কাছে।

ভাবিলাম একি? একদিন "বেলা গেল" এই কথা শুনিয়া প্রসিদ্ধ লালা বাবু সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের এই সাধু উপদেশ তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল—

ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাম্,
স্বাদ্বন্নং ন তু যাচ্যতাং বিধিবশাৎ প্রাপ্তেন সন্তুষ্যতাম্।
শীতোষ্ণাদি বিষহ্যতাং ন তু বৃথা বাক্যং সমুচ্চার্য্যতাম্,
ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং জনকৃপানৈষ্ঠুর্য্যমুৎসৃজ্যতাম্॥*

তিনি সকল সুখ, সকল ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া চির-বৈরাগী ভিক্ষান্নজীবী হইয়া জীবন যাপন করিয়াছিলেন। হায়, কোন মহাজন তেমনি ভাবে তেমনি মনে কি আমাদিগকে কোন মহান উদ্দেশ্য সাধন করিতে এই লেখা দেখাইলেন?

---

* যদি মুক্তিলাভে বাসনা থাকে, তবে প্রত্যহ ভিক্ষারূপ ঔষধসেবন করিয়া ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসা কর। স্বাদু অন্ন যাচ্ঞা করিও না, দৈবানুগ্রহে যাহা প্রাপ্ত হইবে, তাহাতেই সন্তোষলাভ কর। শীত গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সহ্য কর; অর্থাৎ উহাদের একের প্রাপ্তিতে আনন্দ ও অন্যের প্রাপ্তিতে বিমর্ষভাব প্রকাশ না করিয়া উভয়েই সমভাব অর্থাৎ সদানন্দ ভাব প্রকাশ কর। বৃথা বাক্য প্রয়োগ করিও না; ঔদাসীন্য অর্থাৎ সংসারে বৈরাগ্য অবলম্বন কর, এবং জীবের প্রতি দয়া প্রকাশে নিষ্ঠুরতা বা কৃপণতা করিও না।

কিন্তু কই তেমন মহান হৃদয় পাইনা কেন দেব? এখনও প্রাণের মমতায় ভুলিয়া "বেলা গেল" বলিয়া ভাবনা আসে না কেন? সে ভাবনা কখন আসিবে কি?

তখন বলিলাম,—"এ লেখার অর্থ কি?

হের মেঘ সম্মুখে তোমার,
আছে দ্বার দক্ষিণে উহার।

কই মেঘ কোথায়, মেঘে দ্বার থাকিবে কেমন করিয়া?"

করালী বলিল "আছে।"

আমি। কোথায়?

করালী। সম্মুখের যে সুউচ্চ পর্ব্বতখানি, উহাকেই মেঘ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকিবে।

আমি। দ্বার?

করালী। নিকটে না যাইয়া কেমন করিয়া বলিব।

আমি। সে যাহা হউক দেব মূর্ত্তির চক্ষে বারিধারা আবার কেমন? আর কি অমূল্য রত্নই বা সেখানে লুকান থাকিতে পারে? যাহাই থাক, রত্ন লোভে আর বিপদে পতিত হইতে পারি না।

করালী। বিপদের আর বাকি কি? দেখাই যাক্ না, বোধ হয় সে কোন পারমার্থিক রত্ন।

আমি। তবে চল।

সেকি এখানে? কত আছাড় খাইয়া, পদ যুগলে কত রুধির পাত করিয়া, সেই মহা মেঘের সন্নিধানে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু দ্বার কই?

তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু দ্বার ত পাই না। আমরা এক প্রকার হতাশ হইয়াছি, এমন সময় দেখি সহসা সেই স্থান হইতে একটী শৃগাল বাহির হইল। ভাবিলাম এ আসিল কোথা হইতে? আবার খুঁজিতে লাগিলাম, দেখি একটী অপরিসর সামান্য গর্ত্ত রহিয়াছে। ভিতরে কি আছে তাই বা কে জানে? তখন মনে হইল, আজ পয়সা-জোড়া একটী দিয়াশলাই থাকিলে কত না জানি উপকার হইত, কিন্তু তাহা অতি দুষ্প্রাপ্য।

করালী সকল কার্য্যেই অগ্রসর। সে মাথা প্রবেশ করাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল; যাইয়া আমায় যাইতে বলিল। তাহার কথার শব্দ ভয়ঙ্কর। বোধ হইল পর্ব্বতের অভ্যন্তরীণ প্রদেশ ফাঁপা। আমিও অগত্যা প্রবেশ করিলাম।

মনে করিয়াছিলাম, তথায় না জানি কি ঘোর অন্ধকার হইবে, কিন্তু তাহা নয়। দূরে কোথা হইতে যে মৃদু মন্দ আলোক আসিতেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তখন আমরা উভয়ে সেই গহ্বরের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। কোথাও কিছু নাই, কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড চতুর্দ্দিকে পড়িয়া আছে। আমরা কতক্ষণ যে সেই ভাবে বিচরণ করিলাম তাহা বলিতে পারি না।

সহসা দেখিলাম, দূরে কে যেন বসিয়া আছেন। স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম, ভাবিলাম, দেখি কোন সাড়া শব্দ আসে কি না, কিন্তু কিছুই নাই। যাহা হউক কে যে বসিয়া আছেন তাহা নিশ্চয়। আমরা ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট বর্ত্তী হইলাম। দেখি যে প্রস্তরময় বুদ্ধ মূর্ত্তি! মুহূর্ত্ত মধ্যে মনে অনেক কথা জাগিয়া উঠিল, ভাবিলাম একি? এখানে বুদ্ধ মূর্ত্তি কেন? তখন তাঁহার চক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু কই অশ্রুধারা ত নাই।

করালী বলিল "তবে কি আরও মূর্ত্তি আছে না কি?"

আমি। কি জানি।

করালী। যাহাই হউক, খানিক এইখানে বসি এস।

উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া সেই দেবমূর্ত্তির দিকে নিঃস্পন্দ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু একি? কোথা হইতে যেন একটী আলোক শিখা দেখা দিল, তাহা ক্রমে পাহাড়ের অঙ্গ হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া সেই বুদ্ধ মূর্ত্তির মস্তকের পশ্চাৎ দিকে সংলগ্ন হইল। তখন দেখি যে সেই দেব মূর্ত্তির চক্ষুদিয়া যেন জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। সে জ্যোতিঃ ক্ষণেক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্রমে তাহা সরিয়া আসিয়া তাঁহার জানু স্পর্শ করিল। তখন মনে হইল যেন অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। আমি তাড়াতাড়ি সেই জানুদ্বয় স্পর্শ করিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য তখনি তাহা দ্বিধা বিভক্ত হইল, দেখিলাম তন্মধ্যে একখানি অতি পুরাতন কাগজ মাত্র রহিয়াছে, তাহা তুলিয়া লইলাম। লইবা মাত্র আবার সেই বিদীর্ণ স্থানটী সংলগ্ন হইয়া গেল। আমি অবাক হইয়া বলিলাম "একি?"

করালী। ঐ এক রত্ন হবে। চল যেখানে একটু বেশি আলোক আছে সেই খানে যাইয়া পড়িয়া দেখি।

তাহাই করিলাম। দেখি সংস্কৃতে লেখা। আমার সংস্কৃত জ্ঞান তত বেশী নয়, যে তাহা বুঝি। তবে করালী ভাল জানিত, সে পড়িয়া বুঝাইল,—তাহাতে প্রশ্নোত্তর ভাবে এই কথা গুলি লেখা আছে।

"এ কার?"

"যে পায় তার।"

"জাতি ভেদ আছে কি?"

"না।"

"কাহার ছিল?"

"আমি যাঁর।"

"কে পাবে?"

"যাঁর সৌভাগ্য।"

"কেন পাবে?"

"কর্ম্মফলে।"

"কোথায়?"

"সাম্‌নে শতে আরও শত,
বামে ষাটে আরও ষাট,
ডাইনে দশে আরও দশ,
সাম্‌নে নয়ে আরও নয়।"

করালী বলিল "এ আবার কি হেঁয়ালি?"

আমি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম "তাইত।"

করালী। যাহাই হউক এখন দেখা যাক। "শতে শত" কিন্তু কি করি? শত পদ না শত হস্ত?

আমি। হাতই হবে।

করালী। হাতের ত আবার ইতর বিশেষ আছে।

আমি। গজের হাত।

করালী। এ দেশেয় হাত বড়।

আমি। আমাদের দেশেরই ধরণা। দেবতা ত আমাদের দেশেরই বটে।

করালী। তাই হোক।

আমি। কিন্তু দিক ঠিক হবে কি করে? কম্পাস থাক্‌লেও এখান থেকে ত কার্ডিনাল পয়েন্ট (Cardinal point) ঠিক করা যায় না। সাম্‌নে শব্দে ত সরলরেখা (Straight line) চাই।

তখন মহাভাবনায় পড়িলাম। শেষে করালী বলিল "প্রতি মূর্ত্তির ঠিক্ সম্মুখ দেশই ধরা যাক্।"

তাই আন্দাজে ঠিক করিয়া মাপ আরম্ভ করিলাম। অতি কষ্টে তাহা শেষ করিয়া দেখি একবারে পর্ব্বতের গায় আসিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু কই এখানে ত কিছুই নাই। তবে কি ভুল করিলাম। আর ত পারি না। বসিয়া পড়িলাম। করালী হতাশ হইয়া সেই স্থানে পদাঘাত করিল। কিন্তু নিম্নে যেন ফাঁপা বোধ হইল; আওয়াজ সেই মত। দেখিলাম প্রকৃতই তাই বটে—একখানি পাথর যেন কিসের উপর বসান রহিয়াছে। উভয়ে অতি কষ্টে তাহা উত্তোলন করিলাম। দেখি নিম্নে সিঁড়ি রহিয়াছে, আলোকও রহিয়াছে।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

নূতন দেশ।

প্রথমে মনে বড় ভয় হইল, বলিলাম "কোথায় যাই,—এবার কি বলি রাজার দেশ পাতালে যাইতেছি নাকি?"

করালী হাসিয়া কহিল "বলি রাজা ত পাতালে নয় সুতলে আছেন।"

আমি। সে আবার কি?

করালী। শাস্ত্রমতে পৃথিবীর নিম্নে সাতটী স্তবক আছে। অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল আর পাতাল। সেই ইন্দ্রবাঞ্ছিত দেব ভূমি সুতলে বলি বাস করেন।

আমি। সে স্থান কি অতি মনোরম?

করালী। তার সন্দেহ কি?

আমি। এত সুখ, এত ঐশ্বর্য্য কি সেই ভূমি দানের ফল?

করালী। ব্রাহ্মণকে ভূমি দানেই কত ফল, ভগবানকে দানে ফলের কথা আর জিজ্ঞাসা কেন? কিন্তু বলি রাজা সেই পরমাত্মা স্বরূপ ভগবানকে পাইয়া কৃত কৃতার্থ হইয়া যে ভূমি দান করেন, তাহা পৃথিবীর ছার মাটী নয়। ভক্তি, মন, আর কামনা সেই বাঞ্ছাকল্পতরুর চরণ তলে স্থাপন করিয়া আপনি নিষ্কাম হইয়াছিলেন।—জগতে আর আমার বলিতে তাঁহার কিছু ছিলনা। স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁহার অঙ্ক সুশোভিনী, সেই মহা-ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন লক্ষ্মীশ্বর ভগবানের কখন অকিঞ্চিৎকর সামান্য নশ্বর ঐশ্বর্য্যে তৃপ্তি সম্ভবে না।

আমি। সে সব বড় কথা থাক, এখন নামিবে কি না ?

করালী। না নামিব তবে আসিলাম কেন ?

আমি। আবার যদি কোন ভয়ের কথা এখানে থাকে।

করালী। আর বড় ভয়কে ভয় করি না। এখন একটা বিকট আকার রাক্ষস বা ভূতও যদি সাম্‌নে আসে, তাহা হলেও ভয় করি না। ভয় করাই বৃথা দেখিতেছি। এখন আমি প্রকৃত অদৃষ্টবাদী, (fatalist) ভবিতব্যতাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি, তবে আর ভয় কাকে করিব ?

তখন নামাই স্থির হইল, আমরা ধীরে ধীরে নামিতে লাগিলাম।

সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া দেখি আর আমরা পর্ব্বতের অভ্যন্তর প্রদেশে নাই। সুন্দর নানাবিধ পুষ্প বৃক্ষে পরিশোভিত বিলাস-কাননে উপস্থিত। বৃক্ষে বৃক্ষে প্রস্ফুটিত কুসুম রাজী এক অপূর্ব্ব সুখকর সৌরভ বিস্তার করিতেছে। সেই সুকৃষ্ণ ভ্রমর কুল, সেই বসন্তের মৃদু মন্দ বায়ু সঞ্চালন, সকলই বর্ত্তমান। ঐযে কোকিলের কুহুস্বরে কানন প্রমত্ত, আরও কত পাখী আপন আপন স্বরে ডাকিতেছে। সে ধ্বনির যে বিরাম নাই। তবে কি আবার সেই পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত ? ঐযে আকাশে তেমনি হাসি হাসিয়া চাঁদের উদয় হইয়াছে। আর ত দুটী নয়, এবার একটী চাঁদ। জোৎস্না যে তেমনি ফুলের গায়ে, বৃক্ষের পাতায়,—নবদূর্ব্বাদলে আপন রূপ বিভা বিকাশ করিতেছে। কিন্তু এত সৌন্দর্য্য বুঝি আর কখন দেখি নাই। এত প্রফুল্লিত যেন আর কখন হই নাই।

তখন সেই সৌন্দর্য্য মধ্যে এ পাপ মনেও সেই বিশ্ব-সৌন্দর্য্য-ময়কে মনে পড়িল। সেই ভাবে বিভোর হইয়া গাহিলাম :—

দয়াময় হরি, গোলোকবিহারী,
দীনজনে দয়া করোনা।
কেঁদে কেঁদে সারা, হনু দিশেহারা,
তবু কিহে দয়া হবেনা।
মিছে ভ্রমে মাতি, যায় দিবারাতি,
দিনের কথা মনে হলোনা,
বিষম শমন, বিষম তাড়ন,
ভ্রম ভেবে ছেড়ে দেবেনা।

মোহ মত্ত মন, মোহেতে মগন,
শেষের সে দিন ভাবেনা,
কি হবে কি হবে, বল হরি তবে,
তোমা ছাড়া গতি দেখিনা।
হৃদয় আসন, পেতে দেরে মন,
মনে করে তাঁর ধারণা,
শমন তাড়না. রবেনা রবেনা,
পুরিবে মনের বাসনা॥

এই গীতটী গাহিতে গাহিতে যাইতেছি, এমন সময় দেখিলাম সেই কানন মধ্যস্থ একটী নির্জ্জন স্থানে একটী প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ মর্ম্মর প্রস্তর রহিয়াছে; তাহার মধ্য স্থলে একটী সুন্দর স্তম্ভোপরে শুভ্রবরণা প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি। বাহু মূল দিয়া দুইটী সুন্দর পক্ষ বিস্তারিত হইয়াছে। চাঁদের আলোক তাহাতে ক্রীড়া রত। আহা ইহা কি মনুষ্য নির্ম্মিত? না না তাহা সম্ভবেনা, এত সৌন্দর্য্য ত মনুষ্য কল্পনার অন্তর্ভূক্ত নহে। তাহা হইলে তিনি আবার মানুষ কোথায়? তিনি ত দেবতা। মূর্ত্তিটী হস্ত বিস্তার করিয়া আছে। পড়ে পড়ে, কিন্তু পক্ষের সাহায্যে যেন তাহা হইতে বিরত। বদন প্রফুল্ল, হাস্য মাখা। যেন কাহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিতে উদ্যতা। কিন্তু সে ত নাই। সুন্দরী উলাঙ্গিনী, কিন্তু সূক্ষ্ম শ্বেত আবরণে আচ্ছাদিতা। সে আবরণ ভেদ করিয়া মুখচ্ছবি বিকশিত—সে আবরণ ভেদ করিয়া বক্ষের উন্নত ভাব পরিদৃশ্যমান—সে আবরণ ভেদ করিয়া অঙ্গের গঠন পারিপাট্য বিকাশমান। প্রস্তর মূর্ত্তিতে এমন সজীব ভাব আর কখন দেখি নাই। সে ভাব, সে সৌন্দর্য্য যেন স্বর্গীয়। স্তম্ভটীতে সুবর্ণ অক্ষরে লেখা—"সত্য।"

তাহার নিম্নে এই কয়টী কথা লেখা রহিয়াছে, আমি তাহা পাঠ করিলাম।—"কে আছ, আমার মুখের বসন তুলিয়া দাও, আমাতে কি সৌন্দর্য্য আছে তাহা একবার দেখ, আমার বদন কমলে চির জ্যোৎস্না বিরাজ মান থাকিতে কেন অন্ধকারে থাকিবে? যে আমায় দেখিবে আমি তাহারই,—আমি তাহাকেই চিরসুখ—চিরশান্তি দিব। জ্ঞান ও সুফল প্রসবিনী হইয়া তাঁহার চির সেবিকা হইয়া রহিব।"

তখন আমাদের পশ্চাৎ হইতে কে সুমধুর স্বরে বলিলেন "কে তোমার অবগুণ্ঠন খুলিতে পারে মা, তুমি চির কুমারী, চির কুমারীই থাকিবে।

মানুষ তোমায় আলিঙ্গন দিবার উপযুক্ত হইবে না; জীবনে নয়, তবে মরণে কি হয় জানিনা। যদিও হয়—তাহা জন্ম জন্মান্তরের ফলে।"

অবাক্ হইয়া পশ্চাতে ফিরিলাম, দেখিলাম একটী পূর্ণাবগুণ্ঠনবতী ষোড়শী রমণী মূর্ত্তি। সুন্দর সূক্ষ্মবসন পরিহিতা, কিন্তু সেই বসন ভেদ করিয়া যে রূপ বিভা বাহির হইতেছে,—যে মুখচ্ছবির অল্প বিকাশ পাইতেছে, তাহাতেই বোধ হইতেছে তিনি পরমা সুন্দরী।

ভাবিলাম—"তবে কি ইনিই সাক্ষাৎ সত্যরূপা সতী, আর এই কি প্রতি-মূর্ত্তি?" কে জানে, কিন্তু কি বলিব কি করিব তাহা আর যেন খুঁজিয়া পাই না।

করালী বলিল "আপনি কে?"

রমণী অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "আমার পরিচয়,—পরিচয়ে কি বুঝিবে? কত সত্য, কত ত্রেতা, কত দ্বাপর, কত কলি উদয় ও লয় পাইতে দেখিলাম তাহা জানিনা; কিন্তু আমি যে ষোড়শী সুন্দরী সেই ষোড়শী সুন্দরীই আছি। আমাকে চিনিবে কি করিয়া? কত গ্রহের উদয়, কত গ্রহের লয় দেখিলাম, কিন্তু আমি যে আমি সেই আমিই আছি। সময় আমার উপর আধিপত্য করিতে পারে না, মৃত্যুর আমার উপর ক্ষমতা বিস্তারের উপায় নাই। তাই বলি আমি কে, চিনিবে কি করিয়া? তবে মা আমার আদর করিয়া নাম রাখিয়াছিলেন "গতি।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম "আপনার মৃত্যু নাই?"

"না।"

"রোগ?"

"না।"

"শোক দুঃখ?

"তাও না।"

"তবে কোন দেবী হইবেন।"

রমণী মধুর হাসিয়া কহিলেন "দেব দেবী কখন দেখি নাই,—দেখিবার আশা করি বটে।"

"তবে মৃত্যুকে জয় করিলেন কিসে?"

"আগুনে পুড়িয়া।"

"আগুন যে সদ্য প্রাণ নাশ করে।"

"কে বলে? অগ্নিতে নশ্বর পদার্থ নষ্ট হয়, যাহা অবিনশ্বর তাহা নষ্ট হয় না। জগতে এক জ্যোতির্ম্ময় মহাঅগ্নি আছেন, পাপদেহে তাহার দাহিকা শক্তি আছে, অন্যত্র নাই। মূর্খ তাহা দেখিয়া ভয় পায়, কিন্তু পণ্ডিতে তাহাতে পুড়িয়া, পাপস্মৃতি ভস্ম করিয়া, আপনি অজর অমর হয়।

আমি। স্মৃতি থাকিলে দোষ কি?

তিনি। স্মৃতিই মানুষকে আত্মহারা করে। হৃদয় হতে পাপ দূর না হ'লে, পাপ স্মৃতিও যায় না।

আমি। সে তবে এ আগুণ নয়।

তিনি। যাহার দাহিকা শক্তি আছে সেই আগুণ। তুমি সে আগুণ দেখিবে?

আমি। আমরা ত মহাপাপী, তাহার তেজ সহ্য করিতে পারিব কেন?

তিনি। সংসারে একবার দেহ মাত্র ভস্ম করিয়া আসিয়াছ, আর একবার পাপস্মৃতি ভস্ম করনা, তাহা হইলে যম-যাতনা ঘুচিবে।

আমি। সে সাহস হয় না।

তিনি। কেন হয়না, আর এখনও যে হয়না ইহাই বিচিত্র।

তখন তিনি অঙ্গুলি সঙ্কেতে আমাদিগকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিলেন। আমরাও চলিলাম। সম্মুখে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর হর্ম্ম্য দেখিলাম। রমণী তাহাতে প্রবেশ করিলেন। তাহার একটী কক্ষমধ্যস্থ সুন্দর আসনে তিনি উপবেশন করিয়া আমাদিগকে আর একটী আসনে উপবেশন করিতে বলিলেন। আমরা উভয়ে তাহাতে উপবিষ্ট হইলাম। তখন তিনি আমাদিগকে বলিলেন "যদি আপত্তি না থাকে তবে অবগুণ্ঠন খুলি।"

আমি। স্বচ্ছন্দে, কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

রমণী। ভয়—পাছে আমার অপরূপ মুখশ্রী দর্শনে তোমরা বিচলিত হও।

আমি। আমরা নরক দেখিয়াছি, তাহার ভয়ঙ্কর যাতনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; আবার!

রমণী হাসিয়া বলিলেন "কিন্তু সে নরক যাতনা ভোগের অবস্থাতেও যে পাপীরা সৌন্দর্য্য দর্শনে বিচলিত হয় তাহা জান কি?

আমরা উভয়ে এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলাম "অসম্ভব! আপনি আমাদের মাতৃস্থানীয়া,—অবগুণ্ঠন উন্মোচন করুন।"

তখন সেই সুগোল সুন্দর বাহুযুগল ঈষৎ উত্তোলিত হইল। বদন প্রান্ত হইতে ধীরে ধীরে, অতি ধীরে, বসন অপসারিত হইল। তখন কি যেন এক অভিনব অপূর্ব্ব রূপরাশি আমাদের নয়ন সম্মুখে বিরাজিত হইল। পৃথিবীতে, শুক্রগ্রহে অনেক সুন্দরী দেখিয়াছি, কিন্তু এত সৌন্দর্য্য আর কখন দেখি নাই। আমরা স্তম্ভিত হইয়া সেই সুন্দরীর বদন প্রতি তাকাইলাম। বক্ষে পিতবর্ণের কাঁচুলি, তাহাতে সুবর্ণের কারুকার্য্য ঝক-মক্ করিতেছে। অঙ্গে সুন্দর গোলাপী বর্ণের বস্ত্র। তাহাতে যেন তারারাজি জ্বলিতেছে। কি সুন্দর পদ যুগল, কিবা ক্ষীণা কটিতট, কি চক্ষু, কি ভ্রূভঙ্গি, আবার কি চাহনি! যুবতী দুইটী বাহুমূলে করতলদ্বয় সম্বদ্ধ করিয়া বঙ্কিম ভাবে, সেই ভ্রমরকৃষ্ণ-কেশদাম-সন্নিবিষ্ট-বেণী-বদ্ধ মস্তক-ভার ঈষৎ বাঁকাইয়া আমাদের দিকে চাহিলেন। নিশ্বাস বন্ধ হইল, হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাত ক্ষণতরে বন্ধ হইল, আমরা অবাক্ হইয়া সেই সুন্দর মুখের দিকে তাকাইলাম। নরকের সেই ভীষণ দৃশ্য হৃদয় হইতে ক্ষণতরে অপসারিত হইল, ভাবিলাম সুধু সেই মুখখানি, সেই সৌন্দর্য্য, সেই অবারিত সৌন্দর্য্য। মনে আপনা হইতে পাপের স্রোত বহিল। বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু না বলিয়া থাকিতেও পারিনা।

তখন রমণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"বলিয়াছিলাম তোমরা এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিবেনা,—রমণী সৌন্দর্য্য বিদ্যুতের ন্যায় সুন্দর, কিন্তু প্রাণ ঘাতিনী। রোম দেশীয় কোন শিল্পকর আপনার অঙ্কিত চিত্রপট দর্শনে আত্মজ্ঞান হারাইয়া সেই সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া গিয়াছিল। আকাঙ্ক্ষায় বিভোর হইয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিল। সৌন্দর্য্যের ছায়াময়ী কল্পনা সম্ভূত চিত্র দর্শনে যাঁহাদের এত বিকৃতি, তাঁহাদের এ সৌন্দর্য্য সহ্য করা অসম্ভব। মানুষ আগুণে ঝাঁপ দেয় না,—কেননা জানে তাহাতে দগ্ধ হইতে হয়, কিন্তু পতঙ্গ কি তাহা বুঝে? তোমরা সেই পতঙ্গ, তোমাদের জ্ঞান কোথায়? মাতৃস্থানীয়া বলিয়াও মন স্থির করিতে পারিতেছ না। অন্য কথা আর কি বলিব।"

করালী বলিল "মহাজ্ঞানী ব্রহ্মা স্বয়ং পতিত; মনুষ্য কোন্ ছার, মহা-যোগী মহাদেব বিচলিত প্রাণ।"

রমণী বলিলেন "ঐ এক বুয়া শিখিয়া রাখিয়াছ। ধর্ম্ম তত্ত্বের কিছুই জাননা, অথচ কেবল নিন্দা করিয়া অক্ষয় নরক বাসের পন্থা পরিষ্কার কর। এই না

এখানে আসিবার আগে বলি রাজার ভূমিদানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে ছিলে? তবে সকল সময়ে সে জ্ঞান থাকেনা কেন?"

করালী। যেখানে দেব চরিত্রেও মনুষ্যের ন্যায় কাম-লালসা দেখিতে পাই, সেখানে আর কি বলিব,—কি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কল্পনা করিব?

রমণী। বলি রাজা যেখানে আছেন তাহার ঊর্দ্ধভাগের নাম বিতল, সেই স্থানে শশাঙ্ক শেখর পারিষদ ও ভৃত্যগণ পরিবৃত হইয়া প্রজাপতির সৃষ্টি বৃদ্ধির জন্য ভবানী সহ মিথুনীভূত, সম্পাত শুক্রে হাটকী নাম্নী নদী উৎপন্না হইয়াছে। সে শুক্র দেবতারাও পান করেন। অগ্নির মুখ নিসৃত সেই শুক্রে স্বর্ণের সৃষ্টি হয়। সেই বিতলের অধোদিকে সুতল, তথায় সেই মহাযোগী বলিরাজ যোগপরায়ণ, ইহাতে কি ভব ভবানীর ঐহিক কাম চরিতার্থই দেখিতে পাও? তাই বলি তোমরা কীটাণুকীট তোমাদের জ্ঞান কোথায়? সে মহানভাব হৃদয়ে ধারণ করিবার তোমাদের সামর্থ্য কোথায়? সেস্থানে ভূত প্রেত বর্ত্তমান, কিন্তু তাহাদের চিত্ত বিকৃতি নাই—আর আমি তোমাদের মাতৃস্থানীয়া হইয়াও চিত্ত বিকৃতির কারণ হইয়াছি। ধিক্ জীবনে, ধিক্ মনে!

করালী। তবে কি আমরা ভূত প্রেতেরও অধম?

রমণী। তাহাতে সন্দেহ আছে কি?

করালী। ভূত প্রেতের হয়ত মানসিক জ্ঞানের ব্যভিচার ঘটে।

রমণী। তাহাই না হয় হইল, কিন্তু তোমাতে আর পশুতে প্রভেদ কি? চিত্তদমন আর আত্মসংযম ক্ষমতা নাই বলিয়াই পশু ঘৃণ্য, কিন্তু তোমাদেরই তাহা আছে কোথায়?—পশু জীবনেও দেবচিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মহিষ তাহার জলন্ত প্রমাণ, তোমরা সে আদর্শ পশু হইতে অনেক নিকৃষ্ট।

আমি। মনের তত দোষ নয়, পাপ চক্ষেরই দোষ।

রমণী। চক্ষু সকলেরই আছে, কিন্তু সকলে দেখিতে জানেনা। দূর-বীক্ষণ সাহায্যে দূরের বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যিনি তাহার ব্যব-হার না জানেন, তাঁহার দেখা না দেখা সমান।

করালী। তবে এখন দেখিবার শিক্ষা আবশ্যক।

রমণী। নিশ্চয়।—অন্ধকারে লোকের দৃষ্টি শক্তি চলেনা—হৃদয়ের আঁধার না ঘুচিলে দেখিবার উপায় নাই।

করালী। তবে ত অধিকাংশ লোকেরই সেই শোচনীয় অবস্থা? অধিকাংশ লোকইত দৃষ্টি শক্তির পরিচালনে অক্ষম।

রমণী। তা ত ঠিকই।

করালী। তবে আমাদের দোষ দেন কেন?

রমণী। দোষ দি আমার অবগুণ্ঠন খুলিতে বলার জন্য।

করালী। অবগুণ্ঠন খুলিতে বলিয়া অন্যায় করিয়াছি; কিন্তু এখন আর উপায় কি?

রমণী। তাই বলি সংসারে যাঁহারা অবগুণ্ঠনবতী তাঁহারাই বল্যা পাপীর চক্ষু হইতে দূরে থাকাই কর্ত্তব্য, তাই আমি অবগুণ্ঠনবতী। এস, আমার সঙ্গে এস।

আমরা উভয়ে পরস্পারের মুখের দিকে তাকাইলাম। ভাবিলাম আবার কোথায় যাইব? কোথায় যাইয়া হয়ত আবার কি বিপদে পড়িব। কিন্তু মন মানে না। এ হেন সুন্দরীর সঙ্গে যদি না যাইব তবে আর কি করিব? ছার প্রাণের আবার মায়া কি। এ সৌন্দর্য্য যাঁহার নয়ন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় তিনিই ধন্য, নতুবা জীবনই বৃথা।

তখন রমণীটী আমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন "কি ভাবিতেছেন, আসুন।"

আমরা কোন কথা না কহিয়া ধীর গমনে তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

অগ্নি পরীক্ষা।

তিনি আর একটী কক্ষ মধ্যে আমাদিগকে লইয়া গেলেন। কক্ষটী ঘোর অন্ধকার। কিন্তু দেখিতে দেখিতে তথায় মৃদু আলোক দেখা দিল। সেই আলোক সাহায্যে আমরা আবার পরস্পরকে চিনিতে লাগিলাম। রমণীর অপূর্ব্ব মুখশ্রী আবার চক্ষের সম্মুখে দেদীপ্যমান হইল।

তখন তিনি বলিলেন "আমি মাতৃস্থানীয়া, কি বল?"

প্রাণের ভিতর কি যেন এক তাড়িত প্রবাহ খেলিতেছে, তাহার যে নিবৃত্তি হয় না। উঃ কি সৌন্দর্য্য! ও সৌন্দর্য্য ভুলিব কি করিয়া?

কি বলিব, কথা যে সরেনা, মন যে মানেনা।

তিনি হাসিয়া বলিলেন "ছি ছি এখনও হৃদয় আপনার করিতে পারিতেছ না। একবার মা বলিয়া ডাক দেখি।"

আমরা নিরুত্তর।

রমণী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "মা বলিবেনা,—তবে কি আমায় বিবাহ করিতে চাও?"

চক্ষে যেন জ্যোতিঃবাহির হইল, হৃদয়ে যেন সাহস পাইলাম, মন যেন কি এক পরম রমণীয় সুখাস্বাদনে বিভোর হইল। ভাবিলাম "এমন দিন কি হবে?"

রমণী আবার বলিলেন "কি ভাবিতেছ, বিবাহ করিবে? যাহার বয়-সের আদি নাই, অন্ত নাই, তাহাকে বিবাহ করিবে?"

আমি। আপনার অত বয়ক্রম কি করিয়া বুঝিব?

রমণী। যদি বুঝাইতে পারি,—তাহা হইলেও কি বিবাহ করিবে? আমি চির কুমারী, আমার কৌমার্য্য ব্রত নষ্ট করিবে?

আমি। বিবাহ করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য।

রমণী। এদেশে বিবাহ নাই—বিবাহ সংসারে, তাহার স্থায়িত্ব এখানে। তোমার কি বিবাহ হয় নাই?

আমি। হইয়াছিল।

রমণী। স্ত্রীকে ভালবাসিতে?

আমি। সম্পূর্ণ।

রমণী। ছি ছি মিথ্যা কথা,—যদি ভালবাসিতে তবে আজ ভোল কেন? আবার তাঁহাকে এ জীবনে প্রাপ্তির আশা করনা কেন?

আমি। সে আশা আছে কি?

রমণী। যদি থাকে, যদি তাহা তোমায় বুঝাইতে পারি তাহা হইলে আমার আশা ত্যাগ করিবে?

আমি। না, তা পারিব না।

রমণী। উঃ, রূপের এমনি আকর্ষণি শক্তি। ছি ছি, তোমাদের ভাল বাসা চক্ষে। তোমরা বড় অসার।

তখন আমি আর তাহার কোন উত্তর দিলাম না।

রমণী বলিলেন "এখনও ভাল মন্দ বুঝিলেনা ইহাই দুঃখ।"

আমি। ভাল মন্দ বুঝিব কেমন করিয়া? কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তাহা এখনও ঠিক বুঝি নাই। ভাল ভাবিয়া এক কাজ করিয়া পরিণামে অনুতাপ করিয়াছি, আবার মন্দ ভাবিয়া কোন কাজ করিয়া দেখিয়াছি তাহার পরিণাম ভাল হইয়াছে। সকলই যখন ঈশ্বরের সৃষ্টি, তখন ভাল মন্দও তাঁহার সৃজিত। মন্দের যদি আবশ্যক না থাকিত তাহা হইলে মন্দ সৃষ্ট হইত কেন? তাহা হইলে যে সংসারে জ্যোৎস্নাই থাকিত অন্ধকার থাকিত না; আহ্লাদ থাকিত রোদন থাকিত না; দয়া থাকিত ঘৃণা থাকিত না; মিলন থাকিত বিচ্ছেদ থাকিত না; বস্তুতঃ কোন কার্য্যের শেষ ফল না দেখিয়া তাহার ভাল মন্দ ঠিক করা যায় না।

রমণী। সে বুদ্ধি কি এখনও হয় নাই। বাল্যকাল হইতে কত ভাল কত মন্দ দেখিতেছ, তবু কি ভাল মন্দ বাছিবার ক্ষমতা জন্মে নাই?

আমি। ঠিক বুঝিতে পারিতেছিনা।

রমণী। কোথায় তোমার আর পাপাশ্রমে পতন স্মৃতি, কোথায় হৃদয়ে নরকের ছায়া? যাহার মনে কোন বস্তু আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেনা, তাহার মনই বৃথা, তাহার সহস্র জন্মও বৃথা। জ্ঞানের বৃদ্ধি ত হয় না।

আমি। ভাবিয়াছিলাম এ চিত্তের আর চাঞ্চল্য নাই, কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা নয়।

রমণী। আমি তাহা বেশ জানি। মানুষ চির চঞ্চল, যে পর্য্যন্ত তাহারা প্রলোভন সহ্য করিতে পারে সেই পর্য্যন্ত তাহাদের আমার আমার, তাহার পর কে কার? পর্য্যাপ্ত প্রলোভনে এমন মানুষ নাই যে ভুলে না।

আমি। এখানে কি প্রলোভনের ক্ষমতা নাই?

রমণী। সংসারের মত নয়, সেখানে অর্থই প্রলোভন। অর্থ বলে বাধ্য করা যায় না এমন লোক পৃথিবীতে নাই বলিলেই হয়। অর্থ ও প্রভুত্বে মানুষ আত্মহারা হয়—আত্মপর বিবেচনা শক্তি রহিত হয়। রমণী সৌন্দর্য্যও সেই অর্থের ক্রীড়ার সামগ্রী। সকল দ্রব্যই সংসারে নিলামে বিক্রয় হয়, আকাঙ্ক্ষা পুরিয়া মূল্য দাও, তোমার যাহা আবশ্যক তাহাই পাইবে। এখানে তাহা নাই—অর্থ অপদার্থ বলিয়া গণ্য। প্রভুত্ব ঘৃণ্য।

আমি। তবে এখানে কি আছে?

রমণী। এখানে যাহা আছে তাহা অদ্ভুত বস্তু। তাহার মূল্য নাই, তাহার মূল্য দিতে কেহ পারেনা। এখানে পঞ্চভূত জয়ের আকাঙ্ক্ষা আছে।

অনিমা, গরিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব এই অষ্ট বিধ সিদ্ধিরূপ অষ্টৈশ্বর্য্য লাভের বাসনা আছে।

আমি। ঐ সকলই কি তবে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ?

রমণী। মহাজ্ঞানীর তাই মত।

আমি। ঐ জ্ঞান লাভের কোন প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায় কি ?

রমণী। যায় বই কি, এখানে রুষিয়ার জার আর তোমায় কোন প্রভেদ নাই,—মান সম্ভ্রমের পার্থক্য নাই। কিন্তু ঐ জ্ঞানে জ্ঞানবান্ মহাপুরুষ, হয় ত যাহাকে তুমি অতি ক্ষুদ্র বলিয়া জানিতে তিনি সেই জার হইতে প্রতাপশালী।—আমি কেবল সেই মহা প্রতাপশালীর অঙ্ক শোভা করিতেই অভিলাষিণী। তিনিই আমার প্রলোভন, আর আমি—তাঁহারই গতি। আকাঙ্ক্ষার আমি কেহই নই,—বিলাসিতার কেহ নই,—সৌন্দর্য্যের কেহ নই,—সলিল অগ্নি আমার সমান, সুধা হলাহল সমান। তোমার সে জ্ঞান আছে কি ?

আমি। না।

রমণী। তবে আমি তোমার হইব না।

আমি। কি করিলে হইবেন ?

রমণী। আমার মত অজর অমর হইয়া হৃদয় ভস্ম কর—সুধা হলাহলের প্রভেদ ভুলিয়া যাও, তবে আমি তোমার হইতে চেষ্টা করিব। আমায় জয় করিতে না পারিলে ত আমি তোমার হইব না, কেননা আমারও প্রতিজ্ঞা—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতি বলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥"

আমি। কি করিয়া আপনাকে জয় করিব, কি করিয়া দর্পনাশ করিব, কি করিয়া আপনার অপেক্ষাও বলের পরিচয় দিব তাহা ত ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।

রমণী। সময়ে সকলই পারিবে।

এই বলিয়া তিনি অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলেন, অঙ্গুলি হইতে সুবর্ণ গোলকের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিগোলক বাহির হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে নাচিতে লাগিল। তিনি তখন কি এক অপূর্ব্ব মাধুরী ভরে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, আর সেই সকল গোলক ফাটিয়া গিয়া ভীষণ অগ্নির জলন্ত শিখারাশি বাহির হইয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিতে ছুটিতে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া

লক্ লক্ জিহ্বা বিস্তারিত করিতে লাগিল। আমরা ভীত হইলাম। তিনি বলিলেন "এই আগুণে ঝাঁপ দিতে পারিবে?"

আমি ভীতি বিহ্বলচিত্তে বলিলাম "না।"

রমণী। তবে আমায় পাইবার আশা কর কেন?

আমি। যদি ঝাঁপ দি, তাহা হইলে পাইব কি?

রমণী। সে কথা কেমন করিয়া বলিব;—পতঙ্গ পরিণাম ভাবেনা, পুড়িয়াই মরে। তোমার অন্য ভাব কেন?

আমি। তবে কি সুখে পুড়িব?

রমণী। আশাই সুখ। বায়ু, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, যম প্রভৃতি অনেকে আমার স্বামী হইবার বাসনা করিয়াছিলেন। স্বয়ং মন্মথ তাঁহার প্রাণাধিকা রতীকে ত্যাগ করিয়া আমার হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে পতিত্বে বরণ করি নাই। তুমি সেই আমাকে পাইবার আশা পাইতেছ, তবু একবার পুড়িয়া ভস্ম হইতে পারিবে না?

আমি। ভস্মের আর সুখ দুঃখ কি?

রমণী। তখন সেই ভস্মের মধ্যে আবার জীবন পাইবে, আবার নূতন করিয়া সুখ দুঃখ বুঝিবে।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। তখন তিনি বলিলেন--"তবে দেখ।"

এই বলিয়া কি ইঙ্গিত করিবা মাত্র জ্বলন্ত অগ্নি রাশি তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। সহস্র সহস্র শিখা চতুর্দ্দিকে মহারঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিল, এই উঠে, এই পড়ে, এই কাঁপিয়া কাঁপিয়া যেন বিশাল হস্ত প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করে। সে ভীষণ রঙ্গ আমি জীবনে আর কখন দেখি নাই। যায় যায়, সসাগরা পৃথিবী বুঝি ছারখার হয়—রসাতলে যায়। রমণীর বসনাদি পুড়িয়া গেল, কিন্তু দেহ অক্ষত রহিল। তখন অগ্নিশিখা সেই সুন্দরীর অঙ্গে, বক্ষে, চক্ষে, কেশপাশে কি এক অপূর্ব্বরঙ্গে ক্রীড়ারত হইল। পদচুম্বিত কেশপাশ ইতস্ততঃ বিচ্যুত, আর কিছুই নাই। কি সৌন্দর্য্য,—কি লালিত্য! দেহের প্রতি অঙ্গ ব্যাপিয়া অগ্নি শিখা ছুটিতেছে, যেন রমণীকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে,—তাঁহার অঙ্গের যে কিছু কালিমা ছিল তাহা সযত্নে মুছাইয়া দিতেছে। চক্ষের কি জ্যোতিঃ—নাসা কর্ণ হইতে যেন কি এক অপূর্ব্ব বর্ণ বিভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। গলায়, পৃষ্ঠে, নিতম্বে, উরুদেশে, পদযুগলে কোথায় দেখিব,—সর্ব্বত্র সেই স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণবিভা। বক্ষের কথা আর কি বলিব, সে নির্ম্মল সুন্দর ঘন

সন্নিবিষ্ট কুচযুগলের শোভার আর কি বর্ণনা করিব ? আমি ত ছার,—দেবতাও বুঝি সে শোভা দর্শনে জ্ঞান ভ্রষ্ট হন। এই কি সেই যোগিনী রূপ ? যে রূপের জন্য স্থরাস্থরে মহা যুদ্ধ হয়, এই কি সেই রূপ ? ভাবিলাম যাই, আগুণে পড়ি, একবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া জীবন সার্থক করি।

রমণী বলিলেন "আগুণে পুড়িতে পার ত আমায় পাও।"

আমরা উভয়েই বলিলাম "পারি।"

রমণী হাসিয়া বলিলেন "তবে এস।"

আমরা জ্ঞানশূন্য। সেই অগ্নিরাশিতে ঝাঁপ দিতে যাইতেছি, এমন সময় বলিলেন "স্থির হও, ভাব আমি তোমাদের মাতৃস্থানীয়া, ঝাঁপ দিবে কি ?"

বলিলাম—"দিব।"

রমণী। তবে দেখ, আর একবার আমায় ভাল করিয়া দেখ।

কি আর দেখিব ? সেই সৌন্দর্য্য সেই অগাধ সৌন্দর্য্য, সেই হৃদয় প্রমত্তকারী সৌন্দর্য্য। আগুণে ঝাঁপ দিলে পুড়িয়াও ত উহাকে পাইব। বলিলাম "আগুণে ঝাঁপ দিব, পুড়িয়াও আপনাকে পাইব ত ?"

রমণী আবার হাসিয়া বলিলেন "দেখ, ভাল করিয়া দেখ।"

দেখিলাম রমণী মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আর সে ষোড়শী মূর্ত্তি নাই, প্রৌঢ়ার মূর্ত্তি—তাই বা কম কি ? উহাই যে জগতে অতুল।

বলিলাম "পুড়িব।"

রমণী আবার বলিলেন "দেখ, আবার ভাল করিয়া দেখ।"

আবার দেখিলাম, ক্রমে আরও পরিবর্ত্তন, বৃদ্ধা—ক্রমে অতি বৃদ্ধায় পরিণতি,—কোথায় সে সৌন্দর্য্য ? বিরক্ত হইয়া বলিলাম "এ আবার কি ?"

রমণী। মরিবে কি ?

আমি। না আর মরিব না।

রমণী বলিলেন "তবে আমি মাতৃস্থানীয়া ?"

বলিলাম "মাতৃস্থানীয়া।"

আবার অগ্নির বিচিত্র ক্রীড়া, আবার সেই ক্রীড়া রঙ্গ। আবার বৃদ্ধা প্রৌঢ়া হইয়াছেন, আবার আশা, আবার তাড়না, আবার যাতনা। আবার বলিলাম "মরিব।"

আবার রমণী অধরে মৃদু হাসি দেখা দিল, আবার দেখিতে দেখিতে

প্রৌঢ়া, হইতে বার্দ্ধক্যে পরিণতি। আবার অগ্নির ক্রীড়া, আবার প্রৌঢ়া, আবার যুবতী, যে যুবতী সেই যুবতী।

রমণী বলিলেন "আর চক্ষু চাহিও না, চক্ষুকে বিশ্বাস করিও না। যে তোমায় দণ্ডে দণ্ডে বঞ্চনা করে তাহাকে আবার বিশ্বাস কি? আর রমণী সৌন্দর্য্যই বা কি? যাহা এই আছে এই নাই, তাহার জন্য চাঞ্চল্য কেন? ইন্দ্রধনু যেমন একটী প্রতিবিম্ব মাত্র, সৌন্দর্য্যও তেমনি। প্রকৃত তাহা কিছুই নয়।"

আমি। পারিব না পারিব না, পুড়িতে দিন—মরিতে দিন।

রমণী। মরিবে?

আমি। মরিব,—হৃদয়ে এ যাতনা সহ্য হইবে না।

আবার অগ্নি নাচিয়া উঠিল, আবার চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। মহানন্দে আবার যুবতীর চতুর্দ্দিকে ক্রীড়া করিতে লাগিল। কি সৌন্দর্য্য, কি মাধুরী—ক্রমে আবার সেই প্রৌঢ়া মূর্ত্তি, হৃদয়ে সেই তাড়না—আবার বৃদ্ধা—চক্ষু যেন পল্লবে ঢাকা,—বদনের মাংস কুঞ্চিত, দেহের মাংস লোল, স্তন যুগল নাভি পর্য্যন্ত বিলম্বিত—কেশপাশ শুভ্র, আবার এ দৃশ্য কেন? যে দৃশ্যে সৌন্দর্য্য নাই, ঘৃণা বর্ত্তমান—সে দৃশ্য কেন? এ আবার কি? দেখিতে দেখিতে সে দেহেরও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল—মাংস গেল, কঙ্কাল মূর্ত্তিতে পরিণতি। চক্ষের, নাসিকার, কর্ণের অস্থিময় গহ্বর দিয়া অগ্নি শিখা বাহির হইতেছে। গলার, পঞ্জরের, সেই বিপুল নিতম্বের অস্থি গুলি দিয়া অগ্নি শিখা বাহির হইতেছে। বদনের কি ভীষণ ভাব! কি সর্ব্বনাশ, কি দেখিতেছি—এই ত প্রেতিনী মূর্ত্তি, এত সৌন্দর্য্যের মধ্যে কি ইহাই বর্ত্তমান! তখন সেই কঙ্কালময়ী মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত হইল। এবার যাই কোথায়? গেলাম, প্রাণ যায়,—মৃত্যুর প্রকৃত বিভীষিকা এত দিনে দেখিলাম। সেই প্রসারিত হস্তের অঙ্গুলি সঙ্কেতে রমণী আমায় নিকটে যাইতে বলিলেন। আর কে যায়?—বদনের কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি,—অধরে দন্ত নাই কিন্তু অট্টহাস্য আছে। আর প্রাণ থাকেনা, গেলাম—ভগবান এখন উপায় কি? করালী আর স্থির থাকিতে পারিল না, আমার পার্শ্বে পড়িয়া গেল—চেতনা শূন্য হইল। আমিও আর পারিনা, হৃদয় স্থির হইয়াছে—নিশ্বাস আর বহেনা, জ্ঞান আর নাই। আবেগ ভরে বলিলাম "মা রক্ষা কর, রক্ষা কর,—অবোধ আমরা বুঝি নাই, দয়া কর।"

অমনি আবার অগ্নি শিখা যেন আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। আবার দেহের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে আরম্ভ হইল, অতি বৃদ্ধা—বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, ক্রমে সেই অবাধ সৌন্দর্য্যময়ী ষোড়শী মূর্ত্তি। বদনে সেই মাধুর্য্য, সেই সকলি বর্ত্তমান, কিন্তু আমার পাপ মনে আর পাপ বাসনা নাই। আমি নিষ্পাপ চক্ষে তখন মার সেই বিশ্ব বিমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া পুলকিত হইলাম। করালীকে উঠাইলাম, করালী ভীতি বিহ্বল নেত্রে সেই ষোড়শী মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিল।

রমণী তখন সেই দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া গাহিলেন—

কালানলে আছি আমি মগনা,
কে পুড়িবে আর, পরে পোড়া ত আর হবেনা।
লক্ লক্ শিখা উঠে, ভূতনাথ জটাজুটে,
নাগিনী যোগিনী করে সে অনলে কামনা।
কাল বর্ণ স্বর্ণ হবে, আগুণে পশিবি যবে,
দূরে যাবে ভবভয়, জরা মৃত্যু তাড়না,
কি ভয় কি ভয় তায়, জীবন যে গেল হায়,
আর কেন বসে বৃথা, স্মৃতি ভস্ম করনা।

এই সময়ে সে মহা অগ্নি যেন লম্ফ দিয়া আমাদের দিকে একবার অগ্রসর হইল, আমরা ভয়ে সরিয়া গেলাম। তখন রমণী আবার মধুর হাসিয়া গাহিতে লাগিলেন—

হৃদয়ে যাতনা কত, পাশরিবি আছে যত,
বিভোর হইবি প্রাণে সিদ্ধ হবে সাধনা,
সেই কর্ম্ম জ্ঞান ফল, সেই সুধা হলাহল,
সেই মোহ সেই মায়া সেই হৃদি বাসনা।
সেই শক্তি সেই বল, সেই চিত্ত সচঞ্চল,
সে আগুণে সুধু শান্তি পুড়ে আশা মিটেনা।
বিবেকে জ্ঞানের বৃদ্ধি, সাধনায় হয় সিদ্ধি,
নির্ব্বাণে পাইবে মুক্তি ভেবে কেন দেখনা।

কি মধুর স্বর, কি মধুর ভঙ্গিমা, কি তন্ময়ত্ব। রমণীর কণ্ঠস্বর যেন সে ভাবে বিভোর হইয়া ক্ষণেক থামিল, কিন্তু তখনি আবার গাহিলেন—

দশভুজা মূর্ত্তি মার, দেখনারে একবার,
দশদিকে দশ করে, দশে করে তাড়না,
মার যবে মুক্তি হবে, সেই বক্ষ পেতে দিবে,
ভয়ে ভ্রান্তি হলে পরে অভয় পদ পাবেনা।

একি,—এ কি দেখিতেছি,—এযে মার সেই দশভুজা মূর্ত্তি! কই সে রমণী মূর্ত্তি—আর ত নাই, তাঁহার স্থানে দশহস্ত প্রসারণ করিয়া ভগবতী মূর্ত্তি—শাণিত অস্ত্রে অসুর বধ করিতেছেন। দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে সরস্বতী, আবার তাহারই দুই দিকে কার্ত্তিক ও গণপতি বিরাজমান। এ কি মূর্ত্তি!—আমরা ভক্তি ভরে প্রণাম করিয়া করপুটে দাঁড়াইলাম,—দেখিতে দেখিতে ছায়া বাজির ন্যায় সেই মূর্ত্তি সরিয়া গেল, আবার সেই কোকিল কন্ঠির কণ্ঠস্বর হৃদয় বিমোহিত করিয়া গাহিল।—

হের কালি কপালিনী ভব-কলুষ-নাশিনী,
লোলজিহ্বা দিগম্বরী মহামেঘ বরণা।

এ আবার কি, আর ত সে রমণী মূর্ত্তি নয়, এযে সেই সাক্ষাৎ কাত্যায়নী মূর্ত্তি,—সেই নৃমুণ্ডমালিনী দিগম্বরী মূর্ত্তি! সঙ্গে অসংখ্য নাগিনীকুল ধেই ধেই নৃত্য করিতেছে। নরমুণ্ডের রক্তপান করিয়া দেহ রক্তময়ী করিয়াছে।

তখন আমরা ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া গদগদ স্বরে বলিলাম "মা ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর মা।"

তখন আবার গীত হইল—

পেতেদে পেতেদে বুক, পাবি শান্তি পাবি সুখ
বুকে পেতে নেরে অসি ঘুচে যাবে ভাবনা।
শক্তি রূপে স্থিতি যাঁর, ভাবনা সে রূপ মার,
স্বরূপ চিনিতে নার এই সুধু যাতনা।

আবার সেই ষোড়শী রমণী মূর্ত্তি—আবার সেই অগ্নি ক্রীড়া। তখন তিনি মধুর হাসিয়া বলিলেন "ভাব আমি তোমাদের মাতৃস্থানীয়া।"

বলিলাম "মাতৃস্থানীয়া,—মূর্ত্তিমতী সাক্ষাৎ জননী।

সেই মহা অগ্নি তখন নাচিতে নাচিতে আমাদিগকে আচ্ছাদিত করিল। যাহার উত্তাপে এতক্ষণ অস্থির হইতে ছিলাম তাহা যেন স্নিগ্ধ, অতি স্নিগ্ধ বলিয়া মনে হইল। বসন ভূষণ পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইল। আমরা তখন পূর্ণ উলঙ্গ, দিগম্বর মূর্ত্তি, কিন্তু মনে পাপ নাই, দ্বিধা নাই,—মার কোলে

নব শিশুর যে ভাব, সেই স্বর্গীয় ভাবে যেন চিত্ত বিভোর। তখন উলাঙ্গিনী মা আমার যেন কি এক স্বর্গীয় হাসি হাসিতেছিলেন,—যেন কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় স্নেহ রসে গলিয়া আমাদের দিকে তাকাইতে ছিলেন। সে ভাব যেন হৃদয়ে আঁকিয়া গিয়াছে,—সে ভাব—সে স্বর্গীয় ভাব আমি আর কখন দেখি নাই। হায় আগুনে কি সুধা আছে?—হৃদয় যে পুলকিত হইল! কি শান্তি,—এ শান্তি বুঝি জগতের আর কোথাও নাই, এ শান্তি বুঝি সুধা পানেও নাই। তখনও সেই উলাঙ্গিনী সুন্দরীর চতুর্দ্দিকে অগ্নির তরঙ্গ রঙ্গ হইতেছে। কিন্তু বুঝিলাম যাতনা চক্ষে,—বাসনা হৃদয়ে,—পবিত্রতা দহনে।

মা তখন সেই মহা অগ্নির মধ্যে নাচিতে লাগিলেন। শত বিদ্যুচ্ছটা যেন তাঁহাতে খেলিতে লাগিল। মার নখকমলে যেন শত চন্দ্রের সুধা রশ্মি বিকাশ পাইল, চক্ষে যেন শত সূর্য্যের দীপ্তি প্রতিভাত হইল, মা আমাদিগকে লইয়া বাহু তুলিয়া নাচিতে নাচিতে আবার গাহিলেন—

চির দিন কি ঘুমাবি মন,
পোড়া ঘুম কি শেষ হবেনা,
দেখ্‌নারে ঐ গেল জীবন,
ঘুচলোনাকো তার যাতনা।
আমার, আমার, আমার করে,
আমার কে তা চিনিলি না,
যুক্তি করে গেলরে দিন,
মুক্তি কথা স্থান পেলে না।
নির্ব্বাণেরি কত সুখ,
ভুলেও কি তা ভাবিবি না,
হেলাতে কাটালি জীবন,
সার কথাটা বুঝিলি না।
কু-আশায় মত্ত হয়ে,
কুয়াসাত ঘুচিল না,
দিনে দিনে দিনই গেল,
দিনের দিনত আর পেলিনা।
ত্যজিয়ে কামনা যত,
কর্ দেখি মন আরাধনা,

ভক্তি রস গলে প্রাণে—
মুক্তির আর তোর কি ভাবনা।
অনাথ-তারণ যুগল চরণ,
কর্‌নারে মন সেই ভজনা,
পরম সুখে মজ্‌বে জীবন,
সুখের সীমা আর রবেনা।
অহিকেরি সুখ যত,
ভুলে যাবে তার কামনা,
যে সুখের নাইক সীমা,
কর্‌নারে মন তার ধারণা।

আমরাও নাচিতে নাচিতে মার সঙ্গে গাহিতে ছিলাম। গীত সমাপ্ত হইলে আবার তাঁহার দিকে চাহিয়া, বিভোর প্রাণে ডাকিলাম—"মা।"

তখন কি যেন এক জগন্মোহিনী মূর্ত্তি আমাদিগের প্রতি সকরুণ নেত্রে চাহিয়া বলিলেন "কেন বাবা।"

আবার বলিলাম "মা।"—প্রাণ পুরিয়া অখিল ভরিয়া বলিলাম "মা।"

সেই সুধার রবে যেন হৃদয় ভরিয়া গেল, প্রাণ বিমোহিত হইল, বুঝিলাম মা বাণী কি অমৃত মাখা, কিন্তু লোকে ডাকিতে জানেনা কেন?

তখন অগ্নি গেল, আবার আমরা যে অন্ধকার সেই অন্ধকার গৃহে। রমণী তখন আবার আমাদিগকে সেই পূর্ব্ব কক্ষে আনিলেন। আমরা দেখিলাম, মা আমার আবার অবগুণ্ঠনবতী;—এবার মায়ের আর মুখ দেখিতে বাসনা হইল না। কেবল সেই রাতুল চরণ পদ্মে নয়ন নিযুক্ত রহিল। মা জগত্তারিণী, এই জন্যই বুঝি ভক্ত তোমার পদ যুগলই পূজা করে? মহাজ্ঞানী তাই বুঝি মার পা হইতে রূপ বর্ণনা করেন। ক্রমে ক্রমে হৃদয়ে ভক্তির প্রগাঢ় বন্ধন দিয়া তবে সে পবিত্র মুখারবিন্দে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। মা,—এ জগতে তোমার পদযুগলই ধন্য!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

মুক্তি-সরোবর।

তখন আমরা সকলে মিলিয়া গৃহের বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম

অদূরে একটী অনাচ্ছাদিত স্থানে রাশি রাশি যোগী ঋষি ধ্যান মগ্ন,—বাহ্যজ্ঞান শূন্য। আমরা পুলক প্রাণে সেই সকল মহা পুরুষদের দিকে নির্নিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিলাম। রমণী বলিলেন—

শ্রুতি বিপ্রতিপন্নাতে যদাস্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধবচলাবুদ্ধিস্তদাযোগমবাপ্স্যসি॥

ইহারই নাম "সমাধি।"

আবার এদিকে ত্রিবিধ প্রাণায়াম দেখ। প্রাণবায়ুর বহির্নিঃসারণ রূপ "রেচন" দেখ। প্রাণবায়ুর অন্তরাকর্ষণ রূপ অভ্যন্তর বৃত্তি, স্বরূপ "পূরণ" দেখ। আবার "কুম্ভক" দেখ। ইহা প্রাণবায়ুর আকর্ষণ করিয়া স্তম্ভন রূপ স্তম্ভ বৃত্তি।

করালী আগ্রহ সহকারে দেখিয়া বলিল "প্রাণায়ামের সংজ্ঞা ভেদ আছে কি?"

রমণী। আছে বই কি। নাসিকার অগ্রভাগ হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান আশ্রয় করিয়া যে প্রাণায়াম হয় তাহার নাম দেশোপলক্ষিত। ষট্‌ত্রিংশৎ মাত্রাত্মক কালব্যাপী যে প্রাণায়াম তাহাকে কলোপলক্ষিত কহে। ষোড়শ বার, চতুঃষষ্টিবার এবং দ্বাত্রিংশৎবার মন্ত্রজপাদি দ্বারা যে প্রাণায়াম সম্পাদিত হয় তাহাতে সংখ্যোপলক্ষিত প্রাণায়াম বলে।

করালী। আর কোন রূপ প্রাণায়াম আছে?

রমণী। আছে,—বাহ্য ও অভ্যন্তর বিষয়াপেক্ষ যে প্রাণায়াম তাহাকে "চতুর্থ প্রাণায়াম" বলে। ইহার দ্বারা মনুষ্যের ক্লেশের শেষ হইয়া চিত্তে অবিনশ্বর স্থায়ী সুখের আবির্ভাব হয়।

করালী। যোগের বিশেষ ফল কি?

রমণী। চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। (১) ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। (২) ভূত ভবিষ্যৎ সকল বিষয় প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া থাকেন। হস্তী তুল্য বল অথবা বায়ু তুল্য শক্তি লাভ করা যায়। (৩) চতুর্দ্দশ ভুবন সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মে। (৪) তারকা সমূহ জানিতে পারা যায় (৫) এবং

---

(১) ধারণাসুচ যোগ্যতা মনসঃ।
(২) স্ববিষয়া-সম্প্রয়োগে চিত্তস্বরূপানুকারে ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহার।
(৩) বলেষু হস্তি বলাদীনি।
(৪) ভুবনজ্ঞানং সূর্য্য সংযমাৎ।
(৫) চন্দ্রে তারা ব্যূহজ্ঞানং।

জ্যোতিষ্কমণ্ডলের গতি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। (১) ক্ষুধা তৃষ্ণানিবৃত্তি পায়। (২) স্বর্গমর্ত্ত উভয় লোকবাসী সিদ্ধ পুরুষগণের সন্দর্শন লাভ হয়। (৩) পরের কায়াতে প্রবেশ করিতে পারা যায়, এবং কোন প্রাণীর মৃত শরীরেও প্রবেশ করা যায়। (৪) দেহ তুলার ন্যায় লঘু করিয়া ইচ্ছানুসারে অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করা যায়। (৫) ইহা অপেক্ষা আর কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে?

ইহাঁদের ত দেখিলে, এই সময় আর একবার বলির পাতাল প্রবেশ ভাবিয়া দেখ। ইহাঁরা বলেন সাংখ্যদার্শনিকরা যে কোষময় প্রাণের কথা বলিয়াছেন তাহার এক একটী কোষে সেই "সুতল" "বিতল" "রসাতল" "পাতাল" প্রভৃতি সকলই বর্ত্তমান। সেখানে মহাবলী বলি আছেন। যিনি মহাযোগী তিনি যোগের ক্রমিক উন্নতির সহিত এক একটী স্তর অতিক্রম করিয়া আর একটী স্তরে উপস্থিত হয়। ক্রমে তিনি সেই ঘোর অন্ধকারে জ্ঞানের জ্যোতিঃবিকাশ করিয়া চির আনন্দ উপভোগ করেন।

আমি। তবে পাতাল কি কল্পনা?

রমণী। কেমন করিয়া বলিব?—সাধুরা বলেন "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহীতং গুহায়ং।" ভগবান শঙ্করাচর্য্য ভাষ্যে বলিতেছেন যে গুহা পর্ব্বতস্থ গুহা নহে—বুদ্ধি রূপ আত্মা। সুতরাং যাঁহার যেমন বুদ্ধি তিনি তেমনি ভাবিবেন।

আমরা অনেকক্ষণ সেই মহাত্মাদের প্রতি তাকাইয়া রহিলাম, তাহার পর সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আরও দূরে গেলাম। দেখিলাম তথায় একটী সুন্দর সরোবর রহিয়াছে। সলিল স্বচ্ছ, যেন তাহাতে অচঞ্চল স্থিরা সৌদামিনী ক্রীড়া করিতেছে। মরি মরি এ জলে একবার অবগাহন না করিলে ত নয়।

সরোবরের চতুর্দ্দিকেই ঘাট দেখিলাম, সেই সকল ঘাট লোকে লোকারণ্য, সকলেই অবগাহন করিতে ব্যস্ত। কোন ঘাটে হিন্দু, কোন ঘাটে ব্রাহ্ম,—কোন ঘাটে মুসলমান, কোন ঘাটে বৌদ্ধ,—কোন ঘাটে খৃষ্টান,—নানা জাতীয় নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোক অবগাহনের জন্য ব্যস্ত। আমি বলিলাম "মা, এটী কি মা?"

---

(১) ধ্রুবে তদ্গতি জ্ঞানং।

(২) কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসা-নিবৃত্তিঃ।

(৩) মূর্দ্ধ জ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনং।

(৪) বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচার সংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীর প্রবেশঃ।

(৫) কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধ সংযমাল্লঘু তুলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনং।

"মুক্তি-সরোবর।"

আমরা তখন সাগ্রহে বলিলাম "আমরা অবগাহন করিব।"

তিনি বলিলেন "সেই জন্যই ত আসিয়াছি।"

মন বড় প্রফুল্ল হইল। তাড়াতাড়ি একটা ঘাট দিয়া নামিতে যাইতেছি এমন সময় একজন প্রহরী আমাদের হাত ধরিয়া বলিল "এ ঘাট নয়।"

আমি। কেন?

প্রহরী। তুমি কোন ধর্ম্মাবলম্বী?

আমি। হিন্দু।

প্রহরী। কাহার উপাসনা করিয়াছ?

আর বলিতে পারিনা। আমরা শিক্ষিত বাঙ্গালি, না মানি বেদ—না মানি পুরাণ, না মানি কোরান, না মানি বাইবেল। বলিলাম "আমি একেশ্বর বাদী।"

প্রহরী। সে কথা বলা কি তোমার সাজে?—সে যে মহাযোগীর ধর্ম্ম।

আমি। আমি প্রকৃতই ঈশ্বর উপাসনা করিয়াছি।

প্রহরী। দীক্ষা হইয়াছিল?

আমি। না।

প্রহরী। বড় আশ্চর্য্যের কথা—তুমি হিন্দু হইয়া হিন্দু দেব দেবীর উপাসনা কর নাই। আপন মুক্তি চেষ্টা পাও নাই। কত ম্লেচ্ছ যে ধর্ম্ম মহাধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। তুমি এমনি ভ্রান্ত যে তাহা ত্যাগ করিয়াছ!

আমি। অন্যায় করিয়াছি—ইংরাজি শিক্ষায় উপাসনাটা কমিয়া গিয়াছে, ক্রমে লোপ পাইতে দাঁড়াইয়াছে।

প্রহরী। কেন?

আমি। তাহা ঠিক জানিনা, কিন্তু আরাধনা, পূজা, উপাসনায়, যেন অনেকে লজ্জিত হন।

প্রহরী। সেটা কি ইংরাজি শিক্ষার ফল?

আমি। বোধ হয়।

প্রহরী। মিথ্যা কথা,—ইংরাজদের পঞ্চম বর্ষীয় বালকও যে উপাসনা মন্দিরে যায়, উপাসনা করে তাহা কি জাননা? তাহারাত লজ্জিত হয় না, তবে কাপুরুষ—তুমি কেন নিজের ইষ্ট দেব দেবীর উপাসনা করে নাই?

বড়ই লজ্জিত হইলাম। আর কোন কথা কহিতে পারিলাম না।

তখন তিনি করালীকে বলিলেন "তুমি কাহার উপাসনা করিয়াছ?"

করালী বলিল—"আমি থিওসফিষ্ট।"

প্রহরী বলিলেন "আ ছি ছি,—ব্রাহ্মণ সন্তান ইংরাজ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বী। লজ্জা করেনা ওকথা বলিতে। জাননা কি—

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ।"

করালী। সেটাও ত হিন্দু ধর্ম্ম।

প্রহরী। হতে পারে, কিন্তু জাননা কি যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরের বেদে অধিকার নাই। ম্লেচ্ছ হইয়া যিনি বেদ পাঠ করিয়া আপনাকে হিন্দু প্রতিপন্ন করিতে চান, তিনি আবার কেমন হিন্দু।

করালী। ওটী ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থপরতার কথা।

প্রহরী। তুমি কখন কোন ধর্ম্ম শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছ কি?

করালী। না।

প্রহরী। তবে তোমার মুখে ও কথা ভাল শুনায় না।

করালী। আমি নিজে ত ব্রাহ্মণ সন্তান।

প্রহরী। তবে থিওসফিষ্ট হইয়াছিলে কেন?

করালী। কেবল, এফ্ টি এস উপাধীর জন্য।

প্রহরী। এখানে উপাধীর রাজ্য নয়—অন্তরের রাজ্য। তোমার অন্তরেও ত কখন ধর্ম্মভাব জাগে নাই,—জাগিলে অবগাহনে বাধা ছিল না। তোমরা অন্যত্র যাও।

আমরা তখন বিষাদিত চিত্তে সেই অবগাহনপর প্রাণীগণের দিকে চাহিয়া রহিলাম, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ঘাট দিয়া নামিতেছে বটে, কিন্তু যাইতেছে একই স্থানে। সেখানে ভক্তিরসে বিভোর হইয়া পরস্পর পরস্পকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিতেছে। কই আর মুসলমান, কই ব্রাহ্মণ, কই মুচি, কই চণ্ডাল, যাহাদের ছায়া স্পর্শ নিষিদ্ধ, তাহারা যে আজ ভাই ভাই,—এযে জগন্নাথ ক্ষেত্র। তখন আমাদের চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। অনুশোচনায় হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল; কি করি, ভগবান একবার অবগাহন করিতে দাও। তখন রমণীটীর দিকে ফিরিয়া বলিলাম "উপায় কি হবে মা?"

"আগে কেন ভাব নাই—সময় থাকিতে এ সকল চিন্তা করিতে হয়।"

এই বলিয়া তিনি রক্ষীকে আমাদের অবগাহন করিতে দিতে বলিলেন।

রক্ষী বলিল "যাও অবগাহন করগে। যে ধর্ম্মে চক্ষু জলের এত মাহাত্ম্য,

একবার নাম ডাকিলে উদ্ধার; সে ধর্ম্ম বাপু হেলায় নষ্ট কর। হরি বল—হরি বল।”

আমরা প্রাণ পুরিয়া “হরি হরি” বলিয়া সেই স্বচ্ছ সলিলে অবগাহন করিলাম। কি যেন দেখি নাই, তাহা দেখিলাম। কি যেন জানিতাম না, তাহা জানিলাম। আমাদের মাথার উপর যেন তেত্রিশ কোটী দেবতা বিরাজ মান। তাঁহাদের জ্যোঃতিতে যেন সরোবরের সলিল রাশির মহা ঔজ্জল্য সম্পাদিত হইতেছে, প্রাণের ঘোর যেন কাটিয়া গেল। ঐযে দশমহাবিদ্যা, ঐযে পীতাম্বর ধারী বংশীবদন,—ঐযে মহম্মদ, এই যে অনাথ সহায় শ্রীচৈতন্য। আমরা প্রাণের উৎসাহে সেই দেবমণ্ডলীকে সভক্তি প্রণাম করিয়া সেই অগাধ স্বচ্ছসলিলে প্রাণ পুরিয়া ডুব দিলাম।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সাগর-তলে।

ডুব ত দিলাম, কিন্তু আর উঠিনা কেন? ক্রমশই যেন কোথায় তলইয়া যাইতেছি। এক ভীষণ গতিতে জলের মধ্যে নামিতে লাগিলাম। কি সর্ব্বনাশ, কোথায় যাই? ভাবিলাম “এইবার বুঝি নিশ্বাস বন্ধ হইবে” কিন্তু তাহা হইল না। ভাবিলাম করালী হয়ত কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। তখন ধীরে ধীরে চক্ষু চাহিলাম, দেখিলাম করালী আমার সঙ্গেই রহিয়াছে। পুষ্করিণী বা নদীতে ডুব দিয়া চক্ষু চাহিয়া দেখিয়াছি তাহাতে কিছু দেখা যায় না, কেবল সামান্য মাত্র দৃষ্টি চলে। চক্ষের সম্মুখে আঙ্গুল নাড়িলে আঙ্গুল গুলি ছোট ছোট দেখায়, কিন্তু আজি স্বতন্ত্র ভাব। ভূপৃষ্ঠে যেমন বহুদূর ব্যাপী দৃষ্টি শক্তির পরিচালনা হয়, ইহাও ঠিক সেই রূপ। ক্রমে সলিলের তল দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কোথাও বালুকা রাশি তক্ তক্ করিতেছে, কোথাও ছোট ছোট গাছ পালা রহিয়াছে, কোথাও বা সুউচ্চ পর্ব্বতমালা সেই নির্জ্জন স্থানে বিরাজ করিতেছে। একি, সেই সরোবরে পর্ব্বতমালার সমাবেশ কি প্রকারে হইল? তবে কি আমরা অন্য কোথাও আসিয়া পড়িয়াছি নাকি? উর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলাম, দেখিলাম এত আর সে সরোবর নয়, ঐযে ভীষণ তরঙ্গমালা দেখা যাইতেছে। সলিল রাশি আলোড়িত করিয়া ঐ যে অর্ণব পোত ছুটিতেছে, তবে আমরা কোথায়?

আর কোথায়, মহাসাগরের অতল তলে আসিয়াছি। এই বার বুঝি মাংসাসী জল জন্তুর উদরস্থ হইলাম, কিন্তু কই হিংস্রক জন্তুত দেখিতে পাইনা। কেবল রাশি রাশি সুন্দর মৎস খেলিয়া বেড়াইতেছে। এত বড় মাছ ত কখন দেখি নাই। ১০।১২ সের ইলিস কেহ দেখিয়াছেন কি?—আজি ঝাঁকে ঝাঁকে তেমন ইলিস দেখিলাম। রসনাও কেমন করিয়া উঠিল বই কি? কিন্তু ধরি কি করিয়া, ধরিলেও জলে ত আহার করা চলেনা। এক স্থলে দেখি মৃত্তিকা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে, নিকটে যাইয়া দেখি রাশি রাশি কাঁকড়ায় ভরা, এক একটী মাদি কাঁকড়া ওজনে এক মনের কম নয় বলিয়া মনে হয়। প্রকাণ্ড দাড়া দেখিয়া খাইবার ইচ্ছা দূরে গেল, তবু একবার মনে হইল কলিকাতার নিউ-মারকেটে কেহ ইহাদের আমদানি করিতে পারে না কি? চিংড়ি মাছের কথা আর বলিব না; কি বৃহৎ আকার! তাহার মাছ খাইতে হয় না, একটী মাছের ঘি খাইলে তিন জন লোকের উদর পূর্ণ হয়।

আমরা তখন উভয়ে ধীর পাদবিক্ষেপে সেই সাগরতলে বিচরণ করিতে লাগিলাম। কি সুন্দর দৃশ্য। যে দিকে নয়ন ফিরাই সেই দিকেই বিশ্ব বিমোহন দৃশ্য। আমরা পুলক প্রাণে স্বভাবের সুন্দর শোভা দর্শনে প্রীতি লাভ করিতে লাগিলাম। তখন বলিলাম "এবার কোথা আসিলাম?"

করালী। পাতাল বলিলেই চলে।

আমি। এখনও সন্দেহ আছে নাকি?

করালী। আছে বই কি।

আমি। এখন কি করা যায়?

করালী। দিব্য বেড়াই এস।

আমি। তার পর?

করালী। এই সব গাছ পালায় কি আর ফল নাই,—খাওয়া যাবে।

আমি। পরিত্রাণের উপায় কি?

করালী। আর ছাই ও সব ভাবা যায় না, যা হয় হবে।

আমি। এক কাজ করলে হয় না?

করালী। কি?

আমি। ঐ ত জাহাজ দেখা যাচ্চে না।

করালী। তাত যাচ্চে?

আমি। চল না ঐ খানে উপস্থিত হই, ওরা যেখানে হয় নিয়ে যাবে।

করালী। তোমার বুদ্ধি শুনে আবার কোন রাক্ষসের দেশে গিয়ে পড়ি আর কি। এ কি মন্দ আছি। খানিক দেখাই যাগনা।

আমি আর কোন কথা না কহিয়া নিঃশব্দে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু মনে সুখ নাই, কেবল ভাবনা ঐ বুঝি হাঙ্গর আসে, ঐ বুঝি কুমীরে গ্রাস করে। সাপেরই বা অসম্ভাব কি? সহস্রফণা বাসুকী নাকি অনেক নাবিকে দেখিয়াছেন, কে জানে তাহাই আমাদের দৃষ্টিপথে পড়িবে কি না। আমি তখন আবার করালীকে বলিলাম "করালী, একবার উপরে ভেসে দেখি এসনা।"

করালী বিরক্তি সহকারে বলিল "কি জালা, তোমার যন্ত্রণায় যে ব্যতিব্যস্ত হলাম।"

আমি কিন্তু ছাড়িলাম না। শেষে বলিল "তবে চল।"

আমরা উভয়ে উঠিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহা ত পারিনা। তখন বড় ভাবনা হইল। এ অতল তলে কে সাধ করিয়া থাকিতে চায়। কিন্তু উপায় ত নাই।

দেখিলাম একটী প্রকাণ্ড জাহাজ ডুবিয়া রহিয়াছে। আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তাহাতে কত মনুষ্য কঙ্কাল রহিয়াছে, কত সিন্দুক রহিয়াছে। তাহার একটী খুলিলাম, দেখি তাহা স্বর্ণ মুদ্রায় পূর্ণ। একটী মোহর তুলিয়া দেখিলাম তাহাতে হরগৌরী মূর্ত্তি অঙ্কিত, আর অপরদিকে এক বিচিত্র ভাষায় কি লেখা রহিয়াছে। পড়িতে অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না।

তখন আমরা আবার চলিলাম। ক্রমে দূরে যেন একটী দেব মন্দিরের চূড়ার মত কি দেখিতে পাইলাম। আমরা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি মন্দিরের চূড়াই বটে, কিন্তু দ্বার নাই। মনে হইল সে সমস্ত বুঝি সাগরগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে। আমরা উভয়ে অনেকক্ষণ সেই স্থানে উপবেশন করিয়া রহিলাম। পরে মনে হইল মন্দিরের ভিতরে যেন কাহার কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে। কে যেন পূজা করিতেছেন, তবে কি এই সাগর গর্ভেও মানব সমাগম আছে নাকি?

আমরা উভয়ে উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম, এত মনুষ্যের কণ্ঠস্বর ভিন্ন আর কিছুই নয়। তবে মন্দিরের দ্বার কোথায়? অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু

দ্বারত খুঁজিয়া পাইলাম না। আমরা হতাশ হইয়া অন্যত্র যাইতেছি এমন সময় অল্প দূরে যেন একটী সোপানের মত কি দেখা গেল। নিকটে যাইয়া দেখি সোপানই বটে, তখন আমরা ধীরে ধীরে অবতরণ করিতে লাগিলাম। ক্রমে দেখি সেই মন্দিরের দ্বার দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। দ্বার উন্মুক্ত। মন্দির মধ্যে ভবানীপতি ভূতভাবন ভগবানের প্রস্তর মূর্ত্তি বর্ত্তমান, আর তাঁহার দুইধারে দুইটী রমণী করপুটে দণ্ডায়মান।

দুইটী রমণীই সুন্দরী, উভয়েই সালঙ্কারা ষোড়শী যুবতী। বসন ভূষণের পারিপাট্য বড় বেশি। কিন্তু ইঁহারা কে? কে এ হেন নির্জ্জন স্থানে দেবারাধনায় নিযুক্তা? ক্রমে তাঁহারা সেই দেব সম্মুখে প্রণত হইয়া জানু পাতিয়া করপুটে গাহিলেন :—

জয় মহেশ জয় ভবেশ জয় ত্রিপুরাসুর নাশন,
জয় হর হর জয় দিগম্বর জয় বাঘাম্বর ভূষণ।
আঁখি ঢুলু ঢুলু গলে হাড়মালা,
কটিতটে শোভে ফণির মেখলা,
বিভূতি ভূষণ জয় পঞ্চানন চন্দ্রকিরিটী শোভন।
জটাভার মাঝে খেলে সুরধুনী,
বামে শোভে উমা নগেন্দ্রনন্দিনী,
জয় উমাপতি জয় ভূতনাথ জয় ভবানীরঞ্জন।
জয় দেবনাথ শ্মশান ঈশ্বর,
জয় জয় শিব শশাঙ্কশেখর,
জয় নীলকণ্ঠ জয় ভোলানাথ জয় অধমতারণ।
নমঃ নমঃ শিব, নমঃ তব পায়,
কি ভাবনা তার যে পায় ও পায়,
দেহ পদছায়া দেহ দয়াময় ভব-ভয়-ভীতি বারণ।

আমরাও উভয়ে তখন সেই দেব মন্দিরের এক পার্শ্বে করপুটে দণ্ডায়মান ছিলাম। গীত সমাপ্ত হইলে রমণী দ্বয়ের চক্ষু আমাদের দিকে পতিত হইল। তাঁহারা বিস্মিত ও চকিত হইয়া বলিলেন "আপনারা কে?"

আমি বলিলাম "পরিচয় কি দিব জানিনা, তবে পৃথিবীতে আমার নাম ছিল "অক্ষয়কুমার বসু।"

তখন করালীকে বলিলেন—"আপনার ?"

করালী বলিল আমার নাম "করালীচরণ তেওয়ারি এফ্, টি, এস।"

একটী রমণী হাসিয়া বলিলেন "আপনার নামটী কিছু জাঁকাল বটে। এখানে কি অভিপ্রায়ে আগমন ?"

আমি। অভিপ্রায় কিছু নাই, সকলই দৈব দুর্ব্বিপাক।

এই বলিয়া মুক্তি সরোবরে স্নানের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলাম।

তখন একটী রমণী বলিলেন "তবে আমাদের সহিত আসুন।"

আমি। কোথায় ?

রমণী। আমাদের বাটিতে।

আমি। সে কত দূর ?

রমণী। অতি নিকট।

আমি। আপনার নাম কি ?

রমণী। ভ্রান্তিকুমারী।

অপরাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনার ?"

"বিলাস সুন্দরী।"

তখন করালীকে বলিলাম "ভাই, এবার যাহা ভাল বুঝ কর, আমি দোষে খালাস।"

করালী। তোমার বুদ্ধি আর নি।

আমি। নিয়েও কাজ নাই।

করালী তখন ভ্রান্তিকুমারীকে বলিল "এ দেশের নাম কি ?"

ভ্রান্তি। পাতাল।

করালী। তবে পাতাল কি জলময় ?

ভ্রান্তি। না, ভূগর্ভ মধ্যে।

করালী। তবে ত সেখানে অন্ধকার ?

ভ্রান্তি। আমাদের বুদ্ধি কৌশলে তাহা নিরন্তর স্নিগ্ধ আলোকমালায় শোভিত।

করালী। আমরা সেখানে কি করিব ?

ভ্রান্তি। যাহা ইচ্ছা, ব্যবসা করিতে পারেন, চাকরী করিতে পারেন।

করালী। অর্থ ত নাই, কি দিয়া ব্যবসা করিব ?

ভ্রান্তি। এ দেশে অর্থের ভাবনা নাই—কত অর্থপূর্ণ জাহাজ ডুবিয়া যায়, তাহা হইতে সংগ্রহ করিবেন।

করালী। তবে চিরদিনই কি পাতালে থাকিতে হইবে ?

ভ্রান্তি। কোথায় যাইতে চান ?

করালী। পৃথিবীতে ?

ভ্রান্তি। সেখানে কি এত সুখ, যে সে মায়া যাইয়াও যায় না।

করালী। সুখের জন্য নয়, অপরিচিত স্থানে অধিকদিন থাকিতে কেমন কষ্ট হয়।

ভ্রান্তি। সেটা আত্মীয়তার অভাবে।

করালী। হইতে পারে।

ভ্রান্তি। সে সম্বন্ধ ইচ্ছা করিলে এখানেও স্থাপিত হইতে পারিবে।

করালী। কেমন করিয়া ?

ভ্রান্তি। বিবাহ করিবেন, সন্তানাদি হইবে, আর কি।

করালী। সে বাসনা আর নাই।

ভ্রান্তি। আছে কিনা কেমন করিয়া বলিব।

করালী। সেটা নিশ্চয়।

ভ্রান্তি। যদি নিতান্তই পৃথিবী না হইলে মন না উঠে তাহা হইলে সেখানেই পাঠাইয়া দিব। এখন কিছুদিন বাস করিয়া দেখুন এ দেশ পৃথিবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি না।

করালী সাগ্রহে বলিল "এখান হইতে পৃথিবীতে যাইবার কোন উপায় আছে নাকি ?"

ভ্রান্তি। আছে। দার্জ্জিলিংএর নিকট পর্য্যন্ত একটী সুড়ঙ্গ আছে, আমরা কখন কখন সেই পথ দিয়া পৃথিবীতে বেড়াইতে যাই।

আবার পৃথিবী দেখিব ভাবিয়া মন বড় প্রফুল্ল হইল। কত কথা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। আবার প্রাণাধিকা কুসুমকে দেখিব, প্রাণপ্রিয় সন্তানদিগকে দেখিব, পরম পূজনীয়া জননীকে দেখিব, ইহা কি কম আনন্দ!

তখন করালী বলিল "চলুন যাইতেছি।"

রমণীদ্বয় মাত্র অগ্রগামিনী হইলেন, আমরা তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিভীষিকা।

তখন আমরা চারিজনে সেই সাগর সলিলে ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। কত মাছ আমাদের সঙ্গে ক্রীড়াপর হইল। কতরঙ্গে পুচ্ছ হেলাইয়া, কত লম্ফ দিয়া, কত আনন্দে মাতিয়া আমাদের সঙ্গে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই তীরের মত ছুটিতেছে, এই পুচ্ছ উঁচু করিতেছে, এই মাথা হেঁট করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নাচিতে নাচিতে ছুটিতেছে। ভ্রান্তি কুমারী বলিলেন "এই মৎস্যগণের রাজ্য আছে জানেন কি?"

আমি। না।

ভ্রান্তি। উহারাও আমাদের মত সংসারী, শোক দুঃখ সুখ সোহাগের দাস। তা ছাড়া জলে রাশি রাশি যে কীটানু দেখিতেছেন উহাদের মধ্যেও সেই ভাব বর্ত্তমান। আমাদের সন্তরণজনিত অঙ্গ সঞ্চালনে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে কত কোটী কোটী কীটাণুর যে প্রাণ সংহার করিতেছি তাহার ইয়ত্তা নাই।

এমন সময় দেখি দূরে রাশি রাশি হাঙ্গর আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে। কি সর্ব্বনাশ, তাহাদের দন্তের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, বলিলাম "কি হবে?"

ভ্রান্তি। ভয় কি।

দেখিতে দেখিতে তাহারা অতি নিকটবর্ত্তী হইল, আর বুঝি রক্ষা নাই। তখন ভ্রান্তি আমাকে বাহু যুগলে আবদ্ধ করিলেন, করালী বিলাসসুন্দরী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইল। ইহা দেখিয়া সেই ভীষণ প্রাণীগণ স্থির হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু চলিয়া গেল না।

ষোড়শী সুন্দরী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা হইয়া কয়জন স্থির থাকিতে পারেন? এক এক বার কেমন চিত্ত বিকৃতি হইতে লাগিল, কিন্তু মনকে তখনি আবার প্রকৃতিস্থ করিতে লাগিলাম। আমরা সেই বহুবদ্ধাবস্থায় চলিলাম। হাঙ্গরের দলও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল।

আমি বলিলাম "উহারা কি আপনাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না?"

ভ্রান্তি। না।

আমি। আমাদের দশায় কি হবে?

ভ্রান্তি। এই ভাবে আমাদের গৃহ পর্য্যন্ত লইয়া যাইব।

আমি। আপনাদের উপকার আমি কখন ভুলিব না।

ভ্রান্তি। উপকার আর কি?

আমি। যথেষ্ট।

ভ্রান্তিকুমারী তখন মধুর হাসিয়া বলিলেন, "সময়ে আপনারাও আমাদের উপকার করিতে পারেন।"

মনটায় কেমন খট্‌কা লাগিল, গোপনে তাঁহার বদন প্রতি তাকাইলাম। কিন্তু ভ্রান্তি তাহা বুঝিলেন, বলিলেন "কি ভাবিতেছেন?"

আমি। বিশেষ কিছু নয়।

ভ্রান্তি। ভাবিতেছেন বই কি।

আমি। ভাবিতেছি, আমরা আপনাদের কি উপকার করিব, আর উপকার করিলেই কি উপকার পাইবার প্রত্যাশা থাকে?

ভ্রান্তি। থাকে বই কি।

আমি। এ দেশে থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর লোক সেখানে নাই। সেখানে নিঃস্বার্থ উপকারই প্রকৃত উপকার বলিয়া গণ্য।

ভ্রান্তি। তাহা হইলে আপনার সংসার জ্ঞান অতি কম।

আমি। কেন?

ভ্রান্তি। যেখানে পদে পদে স্বার্থপরতা, তাহা যে আপনি দেখিতে পান নাই ইহাই বিচিত্র। পিতা পুত্রকে মানুষ করে বৃদ্ধাবস্থায় তাহার দ্বারা উপকৃত হইবে বলিয়া। রোজকারী পুত্রের প্রতি পিতা মাতার স্নেহ মমতা অধিক। স্বামী স্ত্রীকে যত্ন করে, স্ত্রী গৃহকার্য্য সম্পাদন করে আর দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যা করে বলিয়া। স্ত্রীর স্বামীর প্রতি আনুরক্তি ভরণ পোষণ ও অলঙ্কার প্রাপ্তি লালসায়। বন্ধুত্বে পরস্পর সহানুভূতি প্রাপ্তি লালসা আছে। বিপদে অর্থ সাহায্যের উপকারের অর্থ, কুসিদ প্রাপ্তি। দানে উদ্দেশ্য পরলোকের সুখ কামনা। তবে আর নিঃস্বার্থ ভাব কোথায়?

আমি নির্ব্বাক হইলাম। করালী বলিল "আমরা কি উপকার করিতেপারি?"

ভ্রান্তি। অতি সামান্যেই আমাদের পরিতোষ।

করালী। তবু সেটা কি?

ভ্রান্তি। আমরা কুমারী আমাদের ধর্ম্ম রক্ষা করুন, আমাদিগকে বিবাহ করুন।

আমি। সে কথা অসম্ভব।

ভ্রান্তি। কেন ?

আমি। পৃথিবীতে আমাদের স্ত্রী আছেন।

ভ্রান্তি। তাহাতে কি ?

আমি। আবার মিলিত হইব।

ভ্রান্তি। কে বলিল ?

আমি। এইরূপ মনের বিশ্বাস।

ভ্রান্তি। তাহা হইলে এমন ঘুরিয়া বেড়াইবেন কেন ?

আমি। চির দিন এমন না থাকিতে পারে।

ভ্রান্তি। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও ত সেই তাড়না, সেই গঞ্জনা, আর সেই অভিমানময়ী স্ত্রী। তাহাতে এত লালসা কেন ?

আমি। মনের ভাব।

ভ্রান্তি। সুখ দুঃখটা ভাল করিয়া বুঝুন, পরলোকে যদি সংসারী হইতে হয় তাহাতে সুখ কি ?—পৃথিবীতে যাঁহারা বড় গৃহস্থ, যাঁহাদের ছেলে মেয়ে অনেক তাঁহারা ব্যতিব্যস্ত, জন্মান্তরে সেই সব আত্মীয় পরিবৃত হইবার লালসায় সুখ কি ?

করালী বলিল "সুখই থাক, আর দুঃখই থাক, আমরা আর বিবাহ করিব না।"

ভ্রান্তি। তবে এক দিনের জন্যও আমাদের হন।

আমি। তাও না।

ভ্রান্তি। তবে আপনারা কৃতঘ্ন।

আমি। যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন।

ভ্রান্তি। না বলিলে যে চলেনা।

আমি। বলিলেও উপায় নাই।

তখন ভ্রান্তিকুমারী আমার মুখের দিকে চাহিয়া গাহিলেন—

ছি ছি নারীর মান জাননা, তবু সাধি ধরি পায়,
কি জ্বালা নাইক সরম্ ঠেকিছি বিষম দায়।
ভুল্‌তে গেলে ভুল্‌তে নারি,
ভাবি সুধু মুখ তোমারি,
কি হবে যায় বুঝি প্রাণ, প্রাণরে, তোমার আশার আশায়।

তাইতে কাঁদি ধরি পায়,
বল কি হবে উপায়,
আমাতে আর নাহিক আমি, সঁপিয়ে প্রাণ তোমায়।
সোহাগে রাখ্‌বো ধরে
যতনে পুষ্‌বো তোরে,
আঁখির কাজল করে, পরবো রে প্রাণ তোমায়।
ফুলের বিছানা করে,
শোয়াব যতন ভরে,
ফুলের প্রাণ সঁপ্‌বো রে প্রাণ, নিঠুর পাষাণ কায়।
পূজা উপাসনা ধ্যান,
স্বরূপ সুখের জ্ঞান,
তুমিরে প্রাণের প্রাণ, তোমা ছাড়া নাই কোথায়।
তুমি প্রাণ তুমি মন,
হৃদয়ের আকিঞ্চন,
সুধাকর সুধা তুমি, নিদাঘ মলয় বায়।
মণিময় কণ্ঠহার,
তুমিরে প্রাণ আমার,
তুমি নয়নের মণি কেমনে ভুলি তোমায়।

আমি কিন্তু ভুলিলাম না; কোন কথাও কহিলাম না। রমণীটী তখন আবার বলিলেন "কি বলেন, দয়া কি হবেনা?"

আমি। আর কেন বলেন, আমায় লজ্জা দেন।

রমণী তখন যেন অল্প বিরক্তি সহ মুখ বাঁকাইলেন, আমরা ভীতি বিহ্বল চিত্তে দেখিলাম যে এক দল বৃহদাকারের কুম্ভীর আমাদের সম্মুখে বিকট মুখ ব্যাদন করিতেছে। সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! আমি ভ্রান্তিকে আরও জড়াইয়া ধরিলাম।

তিনি বলিলেন—"আর কেন?"

আমি কথাটা বুঝিলাম না, বলিলাম "কি বলিতেছেন?"

ভ্রান্তি। আমায় ছাড়িয়া দিন।

সবিস্ময়ে বলিলাম "সে কি?"

ভ্রান্তি। কি জন্য আর এত কষ্ট করি?

আমি। মনুষ্যের প্রাণ রক্ষায় কি পুণ্য নাই?

ভ্রান্তি। পাপ পুণ্য বুঝিনা। হয় আমাদের হইতে স্বীকার করুন নতুবা আমাদের ছাড়িয়া দিন। ঐ ভীষণ কুম্ভীরের উদর মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়া শান্তি সুখ উপভোগ করুন।

কি সর্ব্বনাশ—বলে কি? নারী হৃদয় এত কঠিন! কিন্তু সেই একই কথা। হয় আমাদের হও, না হয় ছাড়িয়া দাও। ছাড়িয়া দিলে কি আর বাঁচিব? আবার ভাবিলাম না বাঁচি সেও ভাল, তবু আর কর্ম্মফলের সূত্র পাত করিব না। তখন সেই ভীষণ নরকের দৃশ্য মনে পড়িল। গতিকে মনে পড়িল, বলিলাম "ছাড়িয়া দিন, হিংস্র জীবের উদরস্থ হইব, তথাপি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইব না।"

তখন তাঁহারা একটী তীব্র তিরস্কারজ্ঞাপক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আমাদিগকে লইয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন। ক্রমে জলের উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সাগরই বটে,—সুনীল প্রশস্ত বক্ষ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, দূরে সুনীল বক্ষে সুনীল আকাশ আসিয়া মিশিয়াছে। তাহারই এক প্রান্তে পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান। তাঁহার উজ্জ্বল দেহ সাগর বক্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার মধ্যে যেন নর্ত্তন করিয়া এক অভিনব শোভা ধারণ করিয়াছে। সাগরের প্রবল স্রোত সত্ত্বেও তাহা যেন নিশ্চল—নিথর বলিয়া মনে হইতেছে।

ক্রমে আরও ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। সাগর হইতে ঊর্দ্ধে উঠিলাম, ক্রমে আরও উঠিতে লাগিলাম। মেনকা যেমন শকুন্তলাকে আলিঙ্গন করিয়া মেঘমালার মধ্য দিয়া উড়িয়া গিয়াছিলেন আমাদেরও আজি সেই ভাব। কিন্তু যাইতেছি কোথায়?

কত বন, উপবন অতিক্রম করিলাম, শেষে এক প্রকাণ্ড মরুময় প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। একি সাহারা নাকি? মনে বড় ভয় হইল, ভাবিলাম এই মরুভূমে রাখিয়া যাইবে নাকি?

তাহাতেই বা ভয় কি? ইহা সমুদ্র গর্ভ হইতে ত ভাল। আমি বলিলাম "আমাদের কোথায় লইয়া যাইতেছেন?"

ভ্রান্তি। এমন স্থানে, যেখানে অপমানের চূড়ান্ত প্রতিশোধ লইতে পারিব।

আমি। অপমান ত করিনি।

ভ্রান্তি। আবার বাকি কি।

আমি। এই মরুভূমে ছাড়িয়া দিবেন কি?

ভ্রান্তি। তাহাতে ফল কি?

আমি। অনাহারে, তৃষ্ণায়, আর দারুণ উত্তাপে মরিব।

ভ্রান্তি। সে মৃত্যু ত সুখের।

আমি। তবে কি করিবেন?

ভ্রান্তি। এখনি দেখিবেন।

আমি তখন মনে করিলাম, কোন উপায়ে কি হাত ছাড়ান যায় না। বালির উপর পড়িলে বোধ হয় তত আঘাত লাগিবে না। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হইল। রমণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "কি, পারিলেন না? ছি ছি, কোমলাঙ্গি ষোড়শী যুবতীর কাছেও পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। বাঙ্গালীর এমনি বাহুবল!"

তখন বলিলাম "দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিন।"

ভ্রান্তি। প্রস্তাবে সম্মত হও।

আমি। আপনি আমার মাতৃস্থানীয়া, আমাদের প্রাণ দান দিন।

ভ্রান্তিকুমারী অমনি আমায় ছাড়িয়া দিলেন, আমি বায়ুভরে দুলিতে দুলিতে সেই বালুকা রাশির উপর পড়িয়া গেলাম, কিন্তু আদৌ আঘাত লাগিল না।

করালীকে তখনও ছাড়ে নাই। কিন্তু করালীও আমার মত মা বলিবা মাত্র, তাহাকে সেই স্থান হইতে ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিল। করালী লোটন পায়রার মত ঘুরিতে ঘুরিতে আমার নিকট পতিত হইয়া নির্জীব ভাবে পড়িয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে আমরা প্রকৃতিস্থ হইলাম।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

পুনঃ-সম্মিলন।

তখন সুদূর হইতে যেন কিসের সুমধুর ধ্বনি আসিতে লাগিল,—যেন গীতিশব্দ। কিন্তু কেহ ত নাই,—চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম—কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলাম কে যেন প্রমত্তভাবে, বিভোর চিত্তে, বিহ্বল প্রাণে গাহিতেছেন—

হরি হরি হর বলরে মন,
প্রেমে মেতে ডাক্না সে নাম ও অবোধ মন।
আধ বাঘাম্বর আধ পীতধড়া,
ফণিমালা শিরে শোভে শিখি চূড়া,
আধ দিগম্বরে দেখরে দেখরে, আধ আধ ভাবে রাধিকারঞ্জন।
এমন রূপের শোভা আর কি আছে দেখনা নয়ন॥
হৃদি কমলেতে বসিয়া কমলা,
জটাভার মাঝে গঙ্গা বিলোলা,
ডমরুর তালে বাজিছে বাঁশরী মরি মরি মন মোহন।
একবার বাহু তুলে হরি বল, ও ভাই হর বলনা,
এমন স্বরূপ স্বরূপ দেখ্না চেয়ে আর পাবিনা;
সকল ভুলে ভক্তি ভরে সেই যুগল পদে লওনা স্মরণ॥

প্রাণ যেন মোহিত হইল, হৃদয় যেন এক অভূতপূর্ব্ব সুখাস্বাদনে বিভোর হইল, চিত্ত যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখে মাতোয়ারা হইল। তখন দূরে অন্তরীক্ষে একটী জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখা গেল। ক্রমে তিনি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, সবিস্ময়ে দেখিলাম আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত পথ প্রদর্শক। তখনি যেন আমাদের দিব্যজ্ঞান জন্মিল। আমরা আবার পূর্ব্বের ন্যায় দেহ ও জ্ঞান বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলাম। এতদিনের সকল যাতনা, সকল কষ্ট, যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে বিস্মৃত হইলাম।

তিনি বলিলেন "আর কেন এস।"

আমরা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বায়ুভরে তাঁহার সহিত চলিলাম। আজ অনেক দিনের পর পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি পতিত হইল। মাতা, পত্নী, পুত্রদের প্রাণ ভরিয়া দেখিলাম। হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় সুখ শান্তি যেন সহসা জাগিয়া উঠিল।

আমাদের সমভিব্যাহারী মহাপুরুষ বলিলেন "ঐ যে আমাদের বামে জ্যোতির্ম্ময় মহা প্রদেশ দেখা যাইতেছে উহা কি জান?"

আমি। না।

তিনি। চন্দ্রদেব। দেখিবে কি?

আমি কাতর ভাবে কহিলাম "প্রভু আর নয়;—শুক্রগ্রহে যাহা দেখিয়াছি তাহাতেই হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে।"

তিনি তাহার কোন উত্তর না দিয়া একটু হাসিলেন মাত্র।

আমি বলিলাম "চন্দ্রদেব ত একটী; কিন্তু শুক্রগ্রহ হইতে যে দুটী চন্দ্র দেখিয়া ছিলাম।"

তিনি। চন্দ্র একই বটে, তবে চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতিঃ সম্পন্ন গ্রহ কি আর থাকিতে নাই? আর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কত পৃথিবী, কত চন্দ্র, কত সূর্য্য যে সৃজিত হইয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে।

আমি। আপনিও না।

তিনি। আমার জ্ঞান কি? এখন কোটী যুগ গত হইলেও বিশ্ব-রচনার কণামাত্র জানিতে পারিব কি না সন্দেহ।

করালী বলিল "যাহাই হউক ইহার জ্যোতিঃ ঠিক চাঁদের মত।"

আমি। আমার মনে হইতেছে ফরাসী জ্যোতির্ব্বেত্তা এম, পেটিট (M. Petit) ইহারই কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। মনুষ্য চক্ষে ইহা পতিত হয় না কারণ ইহা ক্ষুদ্র ও ভয়ঙ্কর গতিবিশিষ্ট। তাঁহার মতে ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিটে ইহা পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

করালী। ইহা পৃথিবী হইতে কত দূর?

আমি। প্রায় ২১২৫ ক্রোশ। দেখ এখান হইতে আর সূর্য্যের দ্বারা দিক নির্ণয় করা যায় না। শুধু এখানে নয়, পৃথিবীর কেন্দ্রে উপস্থিত হইতে পারিলেও আর দিক নাই,—দিন রাত্রির ঠিক নাই। পৃথিবীর ছায়া আছে জানিতাম, কিন্তু দেখ তাহা কেমন ত্রিকোণাকারে চন্দ্রকে স্পর্শ করিয়াছে। ছায়ায় অন্ধকার, কিন্তু পার্শ্বে আলোক। চন্দ্র এই মহান ছায়া মধ্যে অবস্থিতাবস্থায় গ্রহণ হয়। কি আশ্চর্য্য,—তখন চন্দ্র সূর্য্য এবং পৃথিবী এই তিনটীই কি সুন্দর ভাবে সমরেখার মধ্যে অবস্থিত হয়, কিন্তু এখন কতদূরে অবস্থিত!

করালী। আচ্ছা কম্পাস থাকিলে এখানে দিক্ নির্ণয় হয় কি?

আমি। তা হয় না। কম্পাসের কাঁটা ম্যাগ্‌নেটিক পোলের দিকে থাকে, এত দূরে তাহার ক্ষমতা কোথায়?

তখন করালী বলিল "ঐ দেখ পৃথিবীর কেন্দ্র। যে কেন্দ্র দেখিবার জন্য পৃথিবীর লোক পাগল সেই কেন্দ্র ঐ দেখ। কেবল তুষারময়।

দেখিতে দেখিতে আমরা এক ভীষণ ঘন শ্রেণীবদ্ধ বৃহদাকারের নক্ষত্র মণ্ডলী মধ্যে উপস্থিত হইলাম। সে কি সুন্দর দৃশ্য, আমাদের আশে পাশে ঊর্দ্ধে নিম্নে চতুর্দ্দিকে দীপ্তিমান নক্ষত্র সকল ফুটিয়া রহিয়াছে।

করালী। এ নক্ষত্রগুলি এত ঘন সন্নিবিষ্ট কেন?

আমাদের সঙ্গী বলিলেন "ভাদ্র আশ্বিন মাসে যখন আকাশ নির্ম্মল হয় তখন ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে ছায়া পথ (Milky way) বলে। এখানে যে এত নক্ষত্র আছে,—এত বৃহদাকারের নক্ষত্র আছে, তাহা কয়জন অবগত। ইহাতে যে সূর্য্য অপেক্ষাও অনেক বড় নক্ষত্র বর্ত্তমান—তাহা কয়জন জানেন?

আমরা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সেই নক্ষত্র মালা দেখিতে লাগিলাম। দেখিয়া তদ্‌রচয়িতার প্রতি প্রেমরসে হৃদয় গলিয়া গেল, আর নিজের ক্ষুদ্রত্ব, অকিঞ্চিৎকরত্ব ভাল করিয়া বুঝিলাম। পৃথিবীতে থাকিয়া এমন চিন্তা হৃদয়ে কখন আসেনা, কখন আসিবেও না। হায় মানব, তোমরা কেবল চন্দ্রের পরিবর্ত্তন দেখ, ক্ষয় বৃদ্ধি দেখ, কিন্তু আমরা দেখিতেছি পৃথিবীরও সেই দশা। অমাবস্যায় পৃথিবী জ্যোতির্ম্ময়, পূর্ণিমায় অন্ধকার। তোমরা পূর্ণিমায় মুগ্ধ, আমরা অমাবস্যার দিনে পৃথিবী দেখিয়া সুখী। তখন আমি সেই মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলাম "চন্দ্র অবশ্য পৃথিবীর পূর্ব্বে সৃজিত হইয়াছিলেন?"

তিনি। তাহাতে সন্দেহ কি,—এখন মানুষও তাহা বুঝিয়াছে। নতুবা চন্দ্রের দেব আখ্যা হইত কি?

আমি। আচ্ছা করালী, চন্দ্রের দিবা রাত্রের দীর্ঘত্ব সম্বন্ধে তোমার কি মত?

করালী। পৃথিবীর মত।

আমি হাসিয়া বলিলাম "তাহা নয়, রাত্রি ৩৫৪ ঘণ্টা, দিবাও তাই।"

করালী চমকিয়া বলিল "সে কি?"

আমি। এটা কি আশ্চর্য্য কথা?—পৃথিবীর মধ্যেই এমন দেশ আছে যেথানে ছয় মাস রাত্রি ছয় মাস দিন।

করালী। তা জানি।

আমি। তবে আশ্চর্য্য হও কেন? লোকের বিশ্বাস, চন্দ্র ও পৃথিবী পূর্ব্বে বাষ্পময় ছিল, ক্রমে তাহা এই ভাবে পরিণত হইয়াছে। হয় ত পূর্ব্বে এত দীর্ঘ দিবা রাত্রিও ছিল না। মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে চন্দ্রকে অতি নিকটে আনিতে পারেন, তাহার পাহাড় পর্ব্বত দেখিতে পান, কিন্তু সে দেশের অধিবাসীদের আকার প্রকৃতি এখনও দেখিতে পান নাই। অনেকে বলেন

চন্দ্রে কোন প্রাণী নাই। মনুষ্যের যাহা সাধ্যের অতীত তাহা আমাদের সহজ সাধ্য। চন্দ্র নাকি পৃথিবী হইতে ৮০,০০০ ক্রোশ দুরবর্ত্তী। লর্ড রোসির দুরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পৃথিবীর উচ্চ পর্ব্বত হইতে চন্দ্রকে ২ ক্রোশ দুরে দেখা যায়; কিন্তু সে দেখাই মাত্র।

মহাপুরুষ তখন বলিলেন "এ সকল মনুষ্য বুদ্ধির আয়ত্বাধীন নয়। তবে যোগী ঋষিরা সমস্ত জানেন। সংসারে যাহাকে জ্যোতিষ বলে তাহা এখানে আদৌ কার্য্যকর নয়। বিশেষতঃ এ বিষয়ে ইংরাজের জ্ঞান হিন্দু অপেক্ষা এখনও কম। তাঁহারা যাহা এখন যন্ত্র সাহায্যে দেখেন, হিন্দুরা তৎপূর্ব্বে তাহা যোগবলে মানস চক্ষে অবলোকন করিয়াছিলেন, তবে সে শাস্ত্র এখন লুপ্ত প্রায়,—এ দুর্দ্দিনে আর তাহার উদ্ধার সম্ভবে না।"

এই সময় আমরা চন্দ্রলোকের অতি নিকটবর্ত্তী হইলাম।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার আশা।

মরি মরি কি সৌন্দর্য্য। আমার কথা ছাড়িয়া দাও, অমর কবি কালিদাস এখানে আসিয়া এক ছত্রও যে লিখিতে পারেন নাই, তাহা স্থির নিশ্চয়। আমরা চন্দ্রদেবকে অতিক্রম করিয়া মহাশূন্যে অবস্থান করিলাম। তখন আমাদের উর্দ্ধে ধ্রুবলোক দেখা গেল।

সেই মহাপুরুষটী বলিলেন "দেখ দেখি এখন পৃথিবী দেখিতে পাইতেছ কি?"

আমি। না। বোধ হয় পৃথিবীতে এখন অমাবস্যা।

মহা। তাহা তোমার পক্ষে কিছু নয়। দৃষ্টি শক্তি তোমার এখনও প্রখর হয় নাই।

এই বলিয়া তিনি আমার মস্তক স্পর্শ করিলেন, আমি তখন দিব্য-চক্ষে সেই সসাগরা পৃথিবী দেখিতে পাইলাম।

তিনি বলিলেন "এখন একবার আপনাকে ভাবিবে কি?"

কথা বুঝিলাম না। বলিলাম "সে কিরূপ?"

তিনি। আত্মজ্ঞান। ইহাই যোগের প্রথম সূত্র বলিয়া আমরা মনে করি।

আমি। তাহা ভাবিবার ক্ষমতা কই?

তিনি। আচ্ছা তোমাদিগকে প্রথমতঃ গুটিকত কথা বুঝাইয়া দিতেছি। ক্রমিক আলোচনায় তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবে বলিয়া আশা করি।

আমরা উভয়ে নিস্তব্ধ হইলাম, তিনি বলিলেন "আত্মার যে বিনাশ নাই তাহা বুঝিয়াছ?"

আমি। বুঝিয়াছি। আমরা নিজেই তাহার পরিচয়।

তিনি। এখন পরিণাম জানিতে বাকি। আত্মার পরিণাম আত্মজ্ঞানের অনুসন্ধান, আর তাহার সিদ্ধিই মুক্তি। কর্ম্মফলে মনুষ্য জ্ঞানের উৎকর্ষতা লাভ করে। যাঁহার যত জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাঁহার তত্ত্ব শিক্ষা হয়; কিন্তু এক জন্মে সকলের তাহা সিদ্ধ হয় না।

আমি। তবে কি আবার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়?

তিনি। তুমি যে এত দিন শুক্রগ্রহে ছিলে তাহা কি?—জন্মের রূপ ভেদ আছে। সময়ের দীর্ঘতা কিছু নয়,—কর্ম্মের সিদ্ধিই লক্ষ্য। কেহ সহস্র বর্ষে যাহা লাভ করিতে অসমর্থ, একদণ্ডে অন্যের তাহার সাধ্যায়ত্ত হয়; সুতরাং সে সহস্র বর্ষ অপেক্ষা সেই এক দণ্ডের মূল্য বেশী।—তোমাদের দেশের একটা সামান্য কথা বলি। নিউটন এক মুহূর্ত্তে হৃদয়ে যাহা ধারণা করিয়াছিলেন কত লোক কত শত জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। সকলই সেইরূপ। যোগী ঋষিরা তন্ময়চিত্তে সহস্র সহস্র, কোটী কোটী বৎসর আরাধনা করিয়া তবে জন্ম পরিগ্রহের হস্ত হইতে ত্রাণ পান। হৃদয়ের বিকাশ সাধন করিয়া তবে পৃথিবী ত্যাগ করেন। কিন্তু যাহাদের তাহা হয় না, তাহারা কি করিবে? লক্ষ্যত সকলেরই এক।

আমি। তবে জীবের লক্ষ্য কি?

তিনি। নির্ব্বাণ।

আমি। তাহা এখনও বুঝি না—আমার প্রাণ এখনও ঐ মহাদূরে পৃথিবীতে পড়িয়া রহিয়াছে। এখনও ভ্রাতা, মাতা, ভগিনী, পুত্র, স্ত্রী, পরিবার প্রভৃতি আমার হৃদয়ে জাগিতেছে।

তিনি। জাগিবে বই কি? প্রেমই জগৎ—কিন্তু তাহার উপর যে আবার এক মহা প্রেমময় আছেন, তাহা এখনও তুমি বুঝ নাই।

আমি। কবে বুঝিব?

তিনি। ক্রমে।—এই সময় একবার তোমার বাটারদিকে চাহিয়া দেখ দেখি।

আমি স্থির দৃষ্টে দেখিলাম। দেখিলাম—আমার শ্রাদ্ধ হইতেছে।

বলিলাম "এত দিনে শ্রাদ্ধ।"

তিনি। সময়ের দীর্ঘতা ঘটনায়, দিন রাত্র জ্ঞান আর এখন আছে কি?

আমি। না।

তিনি। তবে সে সব বুঝিবে কি করিয়া? এখন সে কথা যাক্। পৃথিবীতে তোমার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ দেখ, আর একবার সংসার ও তোমায় কি সম্বন্ধ ভাব দেখি।

আমি। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ!

তিনি। হ্যাঁ! পরলোকে সম্বৎসরে একটী মাত্র দিন হয়। সেই দিনের একটী দিন মাত্র অতীত হইয়াছে।

আমি স্থিরভাবে, আমারই শ্রাদ্ধ ক্রিয়া দেখিতে লাগিলাম। ভাবিলাম তবে ত আমার বলিতে এখনও সংসারে আমার লোক বর্ত্তমান। দেখিতে দেখিতে পিণ্ডদান আরম্ভ হইল। মন্ত্রপাঠ হইল—

"যেষাং নমাতা নপিতা নবন্ধু নৈর্ব্বান্ন—"

কি সর্ব্বনাশ! আমার পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব কেহ নাই। আছে—আছে, না থাকিলেও তোমারাও যে আমার হইবে না, তাহা ভাবিতেছ না। আহা কি তৃপ্তি, হৃদয়ে যেন অমৃত ধারা ঢালিয়া দিতেছে। কে বলে পিণ্ডদানে পিতৃ পুরুষের উদর পূর্ত্তি হয় না। কি সন্তোষ, কি আনন্দ! যাহারা আহার কি তাহা জানেনা, জানিবার আবশ্যক হয় না; পিণ্ডদানে তাহাদের জীবনও তৃপ্তিলাভ করে। হৃদয়ের তৃপ্তির সঙ্গে প্রাণের আশীর্ব্বাদ মিশিতেছে। ধন্য আমি, আর ধন্য আমার পিণ্ডদাতারা। আমার স্মৃতি যাহার হৃদয়ে বর্ত্তমান, যে অবোধ শিশুর চক্ষু পিণ্ড দিতে উছলিতেছে, আমি কোন প্রাণে তাহাদিগকে ভুলিব। ভুলিব না, আমায় যে ভাবিবে আমি অবিরত ছায়ার ন্যায় তাহার সঙ্গে থাকিব। এই ভাবিতে ভাবিতে দেখি যে হৃদয় যেন কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জ্ঞান যেন কত বিকাশিত হইয়াছে। বলিলাম "এমন হইল কেন?"

তিনি। প্রকৃত প্রেতত্ব ঘুচিল। পিণ্ডদানের ফল বুঝিয়া দেখ।

আমি। তবে যে কেহ কেহ বলেন "শ্রাদ্ধাদি বৃথা, মরা গরুতে কি আর ঘাস খায়?"

তিনি। যাঁহার যেমন জ্ঞান তিনি তেমনই বলেন। যাঁহার জ্ঞান বুদ্ধি আরও নিকৃষ্ট তিনি তাহা বিশ্বাসও করেন। বৎসরে একবার মাত্র পিণ্ড দিলে সম্বৎসর পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধিত হয়, এ বিশ্বাসেও যে সুখ আছে। কিন্তু পৃথিবীর বহুসংখ্যক লোকই পিতৃ পুরুষদের উদ্দেশে এই ক্রিয়ানুষ্ঠানেও উদাসীন।

আমি। যাঁহারা নরকে আছেন, পিণ্ডে কি তাঁহাদেরও অধিকার আছে?

তিনি। আছে বই কি—কাহার পিণ্ড সুধা রূপে, কাহারও বা মাংস বা মদিরা রূপে পরিণতি প্রাপ্ত হয়।

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। হিন্দু ধর্ম্মের অপার মহিমার কথা ভাবিতে লাগিলাম। তখন তিনি বলিলেন—"এখন এস তোমায় নূতন করিয়া আবার নূতন কাণ্ড দেখাই।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পিতৃদেব।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম "আবার কি দেখাইবেন?"

তিনি। তোমার ত এখনও সকলি দেখিতে বাকি।

আমি। সত্য, কিন্তু পূর্ব্ব ঘটনা সকল স্মরণ করিলে আর নূতন বস্তু দেখিবার উৎসাহ থাকে না।

তিনি। সে ভয় ত্যাগ কর—তোমরা কর্ম্মফলে ঐ সকল ভোগ করিলে। তোমাদের পাপ শেষ হইয়াছে।

আমি। আমার পাপ কম কিসে? আমি ঘোর মাংসাশী ছিলাম। শ্রীমদ্ভাগবতে পাঠ করিয়াছি যে মাংসাসী তাহাকে কুম্ভীপাক নরকে তপ্ত তৈলে পাক করা হয়। আমি পরদার করিয়াছি তাহার জন্য আমার তামিস্র নরকের যাতনা ভোগ করিতে হইবে। তাহার উপর শুক্রগ্রহে যে নরক দেখিয়াছি, তাহার শাস্তির ত কথাই নাই। সেখান হইতে রক্ষা পাইলে বাঁচি। তাহার উপর আরও যে রাশি রাশি কত পাপ করিয়াছি তাহা আর কত বলিব।

তিনি। সকলই জানি, কিন্তু তোমার অনেক গুণ ছিল। তোমার ক্রূরতা ছিল না, তুমি পরোপকারী ছিলে,—মিষ্টভাষী ও পিতা মাতায় ভক্তিমান ছিলে। সেই সকলের জন্য তোমার কৃত পাপের জন্য প্রকৃত নরক যাতনা সহ্য করিতে হইল না।

আমি। কিন্তু অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি।

তিনি। উহাও কি নরক ভোগ নয়,—যাহার যেমন আত্মোন্নতি তাহার তেমনি শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা। তুমি যে নরকের কথা বলিতেছ তাহাত নরকই নয়। শুক্রগ্রহের কারাগার মাত্র। দেহীদিগের কল্পনা সম্ভূত যাতনা দিবার একটী স্থান, কিন্তু সেই মহানুবুদ্ধি জগদীশ্বরের কারাগার যে কি তাহার কল্পনা করিবার ক্ষমতা এখনও নাই। আর তাহা জানিবারও আবশ্যক নাই। যাহা হউক এখন তোমায় একটী অভিনব বস্তু দেখাইব।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম "কি ?"

তিনি। তোমার পিতা—তোমার পুত্র, তোমার আত্মীয় স্বজন।

বলিলাম "সে কি, শুক্রগ্রহে তবে কি দেখিলাম ?"

তিনি হাসিয়া কহিলেন "পাপের ফল ভোগ করিবার জন্য মনে কর কতকগুলি ভৌতিক কাণ্ড দেখিয়াছ।"

আমি। মনে করি বলিলে পারি কই সে হৃদয় বিদারী স্মৃতি ত যায় না।

তিনি। ক্রমে যাইবে, এখন এস।

এই বলিয়া তিনি তাঁহার হস্ত দ্বারা আমাদের উভয়ের চক্ষু স্পর্শ করিলেন। যেন দিব্য দৃষ্টিশক্তি বিকাশ পাইল। এখন যেন কত কি দেখিতেছি।

আর বড় দেখাইতে হয় না, আপনিই দেখি, আপনিই বুঝি। আমার জ্ঞানের যেন ক্রমিক বিকাশ হইতেছে। আপন মনে আপনি আনন্দিত হইতেছি। দেখিতে দেখিতে যেন কত লোক আসিয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। এতদিনে প্রকৃতই আমার আপনার লোক পাইলাম। প্রাণের দারুণ জ্বালা যেন নিবৃত্তি পাইল।

আমি এত দিন কোথায় পিতৃদেবের অনুসন্ধানে গিয়াছিলাম। সেই পুণ্যময় পিতৃদেব সহাস্য বদনে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার সাধের বসন্ত ঐ যে, এই যে হাস্যমুখে আমার কোলে উঠিয়া, সেই বালকের মধুর

হাসি হাসিয়া, তাপিত প্রাণ শীতল করিতেছে। এই যে আমার ভাইটী আমার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।*

পিতা স্নেহভরে বলিলেন "বড় সুখী হইয়াছি যে তুমি আমায় ভুল নাই। তুমি যত বার আমায় মনে করিতে, তত বারই আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইতাম,—তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতাম।"

আমি। আমি ত তাহা কখন বুঝিতে পারিনি।

পিতা। মানুষে তাহা পারে না।

আমি। আমি তবে পৃথিবীতে অনুক্ষণ যাইনা কেন? আমায় কি কেহ স্মরণ করে না।

পিতা। তোমার সে ক্ষমতা বিকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন মনের গতিতে সেখানে যাইতে পারিবে। এমন কি শত শত স্থানে একই সময়ে উপস্থিত হইতে পারিবে।

আমি। আপনার যে এখনও সেই পূর্ব্বরূপ বর্ত্তমান।

পিতা হাসিয়া কহিলেন "নতুবা তুমি আমায় চিনিতে কি করিয়া, তোমার ভক্তি উৎস উছলিত কেমন করিয়া।" তখন তিনি, বসন্ত ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সকলেই আবার জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করিলেন। আমি দেখিলাম আত্মার ছোট বড় নাই। পিতা, বসন্ত বা ভ্রাতার আত্মায় কোন প্রভেদ পরিলক্ষিত হইল না। দেখিলাম এদেশে বালক বালিকা নাই, বৃদ্ধ বৃদ্ধা নাই, সকলেই সুন্দর, সকলেই সুন্দরী, সকলেই যুবা, সকলেই যুবতী। তখন পিতৃদেব,—পিতামহ, পিতামহী প্রভৃতি উর্দ্ধতন কত পুরুষের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। হায়, আমরা যাঁহাদিগকে একবার হয় ত ক্ষণিকের জন্য সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধদিন ভিন্ন অপর কোন দিন ভাবি নাই, আজি তাঁহাদিগের স্নেহ ভালবাসা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম এ দেশ কি ভালবাসাময়? সংসার তুমি একবার এই মহাপুরুষদিগের নিকট ভালবাসা শিক্ষা কর।

---

* The shock that severed me from the earth had been so sudden that at first I was not conscious that, I was in the world of spirits. But my dear father made himself known, and convinced me that I was indeed alive and amongst the ranks of the shining ones. With him was my dear mother. *The Proceedings of the Society for Psychical Research of April 1895, Page 87.*

পিতামহ বলিলেন "আমায় আর তোমার পিতার মত রূপ ধারণ করিতে হইল না, কারণ পৃথিবীতে তুমি আমায় দেখ নাই। কিন্তু এখন বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে আমিই তোমার পিতামহ।"

আমার হৃদয়ে বস্তুতঃ সেই ভক্তি সেই বিশ্বাস বিরাজ করিতেছিল। আমি বলিলাম "হ্যাঁ।"

তিনি বলিলেন "যখন সকল বস্তু এমনি সহজে চিনিবে, তখন তোমার প্রকৃত জ্ঞান হইবে। সংসারে যাঁহারা মহাজ্ঞানী তাঁহারা আর সে মদনমোহন রূপ দেখিতে পাগল হন না, তাঁহারা সর্ব্বজীবে সর্ব্ব দ্রব্যে সেই মহাশক্তির সত্ত্বা অনুভব করিয়া থাকেন।"

আমি। তবে কি সাকার উপাসনার ফল নাই?

পিতামহ। আছে বই কি?—ভগবান ভক্তবৎসল। ভক্ত তাঁহাকে যে ভাবে চায় সে সেই ভাবেই পায়। কাহারও তিনি পিতা, কাহারও সখা, কাহারও সন্তান। সংসারী স্বার্থের দাস তাই ভগবানকে ডাকে সুখ্যাতিশয্য বৃদ্ধির জন্য, সন্তান সন্ততির দীর্ঘ জীবনের জন্য। কিন্তু তিনি যে অন্তর্যামী। তিনি ভক্তের হৃদয় ভাব বুঝিয়া থাকেন, কামনার আগে যে বাসনা পূর্ণ করেন, তাহা বুঝেনা। প্রাণ মন সমর্পণ নাই, কেবল আছে দেহি দেহি।

আমি। এখানে কি সকাম ধর্ম্ম নাই?

পিতামহ। আছে বই কি, আজন্ম পরিপোষিত আশা কি এক দিনে শেষ হয়। তবে এখানে উপদেশ পায়, উপদেশ বুঝে।

আমি। পৃথিবীতে কি উপদেশ পায় না?

পিতামহ। পায় বই কি, কথক মহাশয় ধ্রুবোপাখ্যান বলিতে বলিতে জটিলের আখ্যান বলেন, কিন্তু লোকে জটিলকে ভুলিয়া ধ্রুব যে ভগবানকে ভজনা করিয়া দীর্ঘকাল রাজ্য সুখে কাল কাটাইয়া ছিলেন, সেই ঐহিক সুখ কল্পনার কথাই ভাবিতে থাকে, সার কথা ভাবেনা। এখন বিশ্রাম কর এ সকল কথা পরে বুঝিবে।

এই বলিয়া তাঁহারা একে একে সকলে চলিয়া গেলেন। পিতৃদেব কেবল আমার নিকট বসিয়া রহিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "উহাঁরা কোথায় গেলেন?"

পিতা। আপন আপন স্থানে। স্বর্গ বলিয়া যাহা আখ্যাত, তাহা একটি নয়,—ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন স্বর্গ আছে। যাঁহার যেমন কর্ম্মফল তিনি তেমনি

স্থানে বাস করেন। তবে সকল গুলিই মহা শান্তিময় স্থান। তোমরা সংসারে স্বর্গের যে সুখ কল্পনা করিতে ইহার কাছে তাহা কিছুই নয়।

আমি। আমি প্রথমে একবার একটী সুন্দর স্থান দেখি, তাহার পর শুক্র গ্রহে যাই। সে স্থানটীও সুন্দর বটে কিন্তু ইহা অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। সেটী কোন স্থান?

পিতা। সেটীও একটী নিম্নশ্রেণীর স্বর্গ। আত্তায়ী দেহ নষ্ট হইলে আত্মা যেখানেই থাকুন তাহা স্বর্গ বলিয়া আখ্যাত।

আমি। সকলকেই কি আত্তায়ীদেহ ধারণ করিতে হয়?

পিতা। না,—যুধিষ্ঠির প্রভৃতি অনেকে সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন, যাঁহার চিত্তের যেমন উন্নতি তাঁহার তেমনি ফল প্রাপ্তি।

আমি। তবে পুণ্যাত্মার পারলৌকিক সুখই বেশি।

পিতা। নিশ্চয়।

আমি। ইংরাজরা বলেন মানুষ মৃত্যু মাত্রেই স্বর্গ রাজ্যে গমন করেন, তবে কি তাঁহাদের আত্তায়ী দেহ ধারণ করিতে হয় না।

পিতা। ধর্ম্ম বিভিন্নতায় পারলৌকিক গতির কথঞ্চিৎ বিভিন্নতা দেখায়, কিন্তু তাহা নাম মাত্র;—পরিণাম একই। আত্মা যে সময়টা প্রকৃত উন্নতিলাভে অকৃতকার্য্য হয় সেই সময়টাই আত্তায়ী অবস্থা প্রাপ্তির সময় বুঝিলেই আর গোল থাকেনা।

আমি। তবে আত্মার ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে উন্নত স্বর্গ প্রাপ্তি হয়?

পিতা। আত্মার উন্নতিতেই স্বর্গ সুখ, যত উন্নতিলাভ করিবে সুখও তত বৃদ্ধি পাইবে।

আমি। এস্থান অপেক্ষাও অনেক ভাল স্বর্গ আছে কি?

পিতা। অনেক আছে।

আমি। আমি সে সব দেখিতে পাইব কি?

পিতা। পাইবে।

আমি। আপনি তবে ইহা অপেক্ষাও ভাল স্থানে যান না কেন?

পিতা। যত ঊর্দ্ধে উঠিবে—আত্মীয় স্বজন সংসার ত্যাগ করিলে তত বিলম্বে মিলিত হইবে। তোমার মাতার জন্য আমি এই স্থানেই অপেক্ষা করিতেছি, সেই পুণ্যবতী সতীর সহিত পুনর্মিলন হইলে আমি আরও উন্নত স্বর্গে থাকিব ও থাকিবার যোগ্য হইব।

আমি। তবে এখানেও কি আমার আমার আছে ?

পিতা। শ্রীকৃষ্ণের যদি কমলার প্রতি, মহাদেবের যদি ভগবতীর প্রতি স্নেহ ভালবাসা থাকে, আর সে ভালবাসা যদি দূষ্য না হয়, তবে আমার স্ত্রী পুত্রের প্রতি স্নেহ মমতা দূষ্য কিসে ?

আমি। তবে ত এখানেও পৃথিবীর ভাব বর্ত্তমান।

পিতা। না—অনেক প্রভেদ আছে। সেখানে লোকে আপন স্ত্রী পুত্র আত্মীয় ভিন্ন জানেনা। এখানে আমার,—তোমার উন্নতির জন্যও যে ইচ্ছা, যে আগ্রহ, অপরের জন্যও তাই।

আমি। তবে মার জন্য, আমার জন্য আপনার স্নেহ মমতা বেশি কেন ?

পিতা। সেটা উপাসনার ফল। তুমি আমায় দিবানিশি ভাবিতে, তোমার মাতা ভাবেন, আমি কেমন করিয়া সে সব ভুলিব। ভগবানকে ডাকিলে তিনি স্থির থাকিতে পারেন না, তবে আমি থাকিব কেমন করিয়া ?

আমি। তবে চিন্তার লাঘবতার সঙ্গে সম্বন্ধও কমিয়া যায়।

পিতা। নিশ্চয়। তোমা অপেক্ষা তোমার পুত্র আমার দূর। তোমার প্রতি তাহার যে ভালবাসা আমার প্রতি তত নয়। এইরূপে নৈকট্য কমে। তাই পৃথিবীতে সাত পুরুষের ঊর্দ্ধ সম্পর্কীয়ের সহিত সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়।

আমি। মার পরলোক প্রাপ্তি কি আপনার সুখকর ?

পিতা। অনেকাংশে সুখের বই কি।

আমি। তবে কি আপনি তাহার সত্বর মৃত্যু কামনা করেন ?

পিতা। না না—আমি কি কষ্টে আছি। এ শান্তিময় স্থানে ক্লেশ বলিয়া কোন বস্তু নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই—বাসনা নাই—অতৃপ্তি নাই। আমরা অহর্নিশি-ত আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত। ঐ ত তোমার মা—ঐ ত সকলে রহিয়াছে। তাহাদের কথা শুনিতেছি, তাহারা আমাদিগকে স্মরণ করিয়া যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে, তাহাতে বিমোহিত হইতেছি। তবে আর মৃত্যু কামনা কেন করিব ? আর তাহার উপর নিষ্কামভাবে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে পুরুষ কখনই জ্ঞান নিষ্ঠা লাভ করে না। আমরা তাহা বুঝি।

আমি। তবে ত মাতারও আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চ্চনা করা কাম্যধর্ম্ম ?

পিতা। পতির অর্চ্চনা সতীর ধর্ম্ম, সুতরাং তাহা কাম্যধর্ম্ম নয়,—স্বীয়

ধর্ম্ম প্রতিপালন করা মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই ধর্ম্ম, সুতরাং স্বামীর ধ্যান কি সতীর ধর্ম্ম নয় ?

আমি। সকলের আত্মাই কি সমান ?

পিতা। কর্ম্ম ফলানুযায়ী হয়।—সে সকল তোমায় পরে বুঝাইব। যাহারা নরকে তাহারা সেই স্থানে কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। কর্ম্মফলের নিবৃত্তি পাইলে আবার স্বর্গ রাজ্যের কোন এক স্থানে বাস করিবে। এখানেও সতর্কতা আবশ্যক, সংসারের ন্যায় এখানেও সয়তান আছে; তাহারা মন্দ বুদ্ধি দিয়া আত্মার অবনতি সম্পাদনে যত্নপর হয়।

আমি। উদ্দেশ্য কি ?

পিতা। তাহাদের দলের পুষ্টি সাধন।

তখন তিনি কতকগুলি লোককে দেখাইয়া বলিলেন "দেখ দেখি ইহাদের চেন কি ?"

আমি তাহাদের চিনিতাম বই কি। এক জন নরহত্যা করিয়া ফাঁসী যায়। আর একজন চৌর্য্যাপরাধে কয় বার জেল খাটিয়াছিল। বলিলাম "বাবা ইহারা স্বর্গে কেমন করিয়া ?"

পিতা হাসিয়া বলিলেন—"একজন ক্রোধ পরবশ হইয়া হত্যা করে, তাহার পর অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। অপরে সংসার প্রতিপালনের জন্য চুরি করিয়াছিল, কিন্তু চুরি করিয়া অনুতপ্ত হয়। আরও দেখ, যাহাদিগকে সংসারে অতি বড় ধার্ম্মিক বলিয়া ভাবিতে, তাহাদের কত লোক নরকে কতবা অতি নিম্ন স্বর্গে অবস্থান করিতেছে। মন লইয়া এখানে বিচার, কার্য্য লইয়া নয়।"

আমি। পাপ কার্য্য সম্পাদনের ন্যায় পাপ চিন্তাও কি ভয়ানক দূষ্য ?

পিতা। চিন্তায় না হয় কি ? পাপ চিন্তায় যে হৃদয় অন্ধকার, তাহার বাহ্য কার্য্য যত সৎ হউক না, সে মহাপাপী। এই রূপ কুচিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া কত লোক যাঁহারা সংসারে সাধুর মত ছিলেন তাঁহাদের পুত্রেরা অসাধুত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদান করিয়া লোককে স্তম্ভিত করিতেছে। সেই সকল কুচিন্তার ফল তাহাদের সন্তানে পরিদৃশ্যমান। দোষ সন্তানের নয়—সেই কুচিন্তা পরবশ পিতার।

আমি। সংসারিক লোকের বাহ্যিক চরিত্র দর্শনে তবে তাহার পারলৌকিক গতি নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

পিতা। নিশ্চয়, সংসারে যাহারা কুচরিত্রবান ছিল, তাহারা সুচরিত্রবানের

উপর আসন পাইয়াছে, তাহার কারণও ঐ। হৃদয়ে প্রগাঢ় চিন্তা, প্রগাঢ় অসৎকল্পনা করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত না করিলেও, মহাপাপ; তাহার ফল ভোগ অবশ্যম্ভাবী। এখানে কাহাকেও সাজা দিতে সাক্ষীর আবশ্যক নাই, ঈশ্বরের বিচার শক্তি এমনি!

আমি। স্বর্গীয় মহাত্মারা কেন সাংসারিক লোকদিগের হৃদয়ে সুপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা করেন না?

পিতা। আমাদের অন্তেব সর্ব্বদাই পৃথিবীতে, আমরা সর্ব্বদাই মনুষ্যের উন্নতি সাধনের ইচ্ছা করি, কিন্তু মানুষ আমাদের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিতে পারেনা, আমাদের উপদেশ বুঝিতে পারেনা।

আমি। তাহার কারণ কি?

পিতা। সংসারে স্নেহ, মায়া, ভয়, ভক্তি প্রভৃতি কম, তাই এত দুঃখ, তাই সে স্থান অশান্তিতে পূর্ণ। যদি সকলে ভাবে আমার মৃত পিতা, মাতা, আত্মীয়, স্বজন আমার কার্য্য কলাপ দেখিতেছেন, তাহা হইলে মনে ভয় হয়, লজ্জা হয়, অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্তি কমে;—কিন্তু মানুষ প্রায়ই নাস্তিক। তাই তাহা ভাবেনা, আত্মা যে অমর তাহা বুঝে না। তাহার উপর আরও ভাবিবার আছে। মুখে তাহারা বলে বটে যে, বিশ্ববিধাতার বিশ্বব্যাপী চক্ষু, কিন্তু কার্য্যের সময় সে জ্ঞান নাই, থাকিলে মানুষ দেবতা হইত। স্বর্গ বলিয়া অন্যস্থান খুঁজিতে হইত না। পৃথিবীই স্বর্গে পরিণত হইত।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বর্গরাজ্য।

আমি। অনেকে বলিয়া থাকেন পৃথিবীতেই স্বর্গ ও নরক বর্ত্তমান। সেটা কি?

পিতা। সেটা হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতার পরিচয়। রাজার রাজ্যসুখ ও দরিদ্রের কষ্ট দেখিয়া তাঁহারা সংসারে স্বর্গ ও নরকভোগের কল্পনা করেন, কিন্তু তাহা কিছুই নয়। রাজার বাহ্যিক সুখ, আর দরিদ্রের বাহ্যিক দুঃখ। যাহার প্রাণে তৃপ্তি আছে তাহার সংসারে কষ্ট নাই। তোমায় তন্ন তন্ন করিয়া বিভিন্ন স্বর্গ রাজ্য দেখাইব। তুমি ত স্বর্গরাজ্যের কিয়দংশ দেখিয়াছ, কিন্তু বল দেখি মর্ত্তে স্বর্গের যে সুখ-কল্পনা করিতে ইহাও কি তাই?

আমি। তাহাতে ইহাতে অনেক প্রভেদ, সে সকল কিছুই নয়;—এ কল্পনা করিবার উপায় নাই।

পিতা। স্বর্গীয় চিন্তা সদত প্রেমময়—কিন্তু পৃথিবীতে তাহা নয়,—আমরা প্রেমময় অলৌকিক প্রেমসম্পন্ন ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী তাই এখানে এত প্রেম!—পৃথিবীতে নাই, কেবল লোকে ঈশ্বরের তত নিকটবর্ত্তী নয় বলিয়া। কিন্তু সংসারেও যে সকল হৃদয় প্রেমে মাতোয়ারা তাঁহারা শত ধন্য। তুমি রামকৃষ্ণ পরমহংসকে জানিতে—সে প্রেমময় হৃদয়ের কথা জানিতে,—তিনি নররূপী দেবতা—স্বর্গে আমরা তাঁহার পূজা করি। তেমন কত আছেন। কিন্তু জানিয়া রাখ যেখানে প্রেম নাই, সেখানে নরক বিরাজমান।

আমি। পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, ভ্রাতা, ভগিনী এ সকলের ভালবাসাও কি পবিত্র?

পিতা। নিশ্চয়, কেননা ভালবাসায় অপবিত্রতা নাই;—আর যেখানে দেখিবে ভালবাসা আছে সেইখানেই জানিবে, অনন্ত প্রেমময় বিশ্ব-প্রেমিকের প্রেমকণা আছে। মনুষ্য আপনার আপনার করিয়া মত্ত তাই সে ভালবাসার বিস্তৃতি হয় না। কিন্তু যেখানে আছে সেখানে প্রকৃত দেবত্বও আছে।

আমি। ভালবাসার বিস্তৃতিই কি তবে মহাধর্ম্ম?

পিতা। তার সন্দেহ কি? আমি যখন সংসারী তখন একদিন একটী বণিক একছড়া হীরার হার বেচিতে আসেন। তুমি সেটী দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলে। অনেক দাম বলিয়া কিনিয়া দিতে পারিলাম না। বণিক বিদায় হইলে তোমায় কোলে করিয়া ঘন ঘন মুখ চুম্বন করিলাম; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় হারটী দিতে পারিলাম না বলিয়া আমার চক্ষে অশ্রুকণাও দেখা দিল। কিন্তু ভাব দেখি সংসারে সেই সময় তোমার মত কত সন্তান এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত ছিল। তুমিও ঈশ্বরের যেমন আদরের, তাহারাও তেমনি, কিন্তু সে কথা তখন মনে আসে নাই। যাঁহার আসে তিনিই বিশ্বপ্রেমিক। তাঁহাকে পূজা করিলেই হয়—পূজা করিবার জন্য আর দেবতা খুঁজিতে হয় না। জগতে আর কিছু শিক্ষা করিতে হয় না, কেবল শিক্ষা করিতে হয় ভালবাসা। ভাল-বাসা আর ভালবাসা, ইহাই মোক্ষ লাভের মহামন্ত্র।

আমি। স্বার্থময় ভালবাসা কিরূপ?

পিতা। মহাদোষ,—যেখানে স্বার্থ, সেইখানেই ক্রূরতা, তাই ভগবান গীতায় কেবল নিঃস্বার্থ ভাব শিক্ষা দিয়াছেন। জগতে মার তুল্য নিঃস্বার্থ ভালবাসা কম—তাই জননী স্বর্গাদপি গরীয়সি—তাই জননী প্রত্যক্ষ দেবী—তাই জননী স্বর্গের দ্বারবর্ত্তিনী—তাই আদ্যাশক্তি জীব দেহে মাতৃ রূপে অবস্থান করেন।* জননীর অক্ষয় ভালবাসায় যদি ধরাতল বঞ্চিত হইত, তাহা হইলে মনুষ্যকে আর নূতন করিয়া নরকের কল্পনা করিতে হইত না। সংসারই মহানরকে পতিত হইত। বস্তুতঃ ভালবাসাতেই স্বর্গ আমাদের নিকটবর্ত্তী হয়। ভালবাসাই সংসারের স্বর্গ।

আমি। ঈশ্বরের ভালবাসা কেমন?

পিতা। তাহা আর বলিতে হইবে কেন? ভালবাসাই ঈশ্বর—প্রকৃত ভালবাসার মধ্যে মানস চক্ষে যে কেহ ঈশ্বরের প্রেমময় বদন প্রভা দেখিতে পায়। ঈশ্বর প্রেমময় তাঁহার কাছে প্রেম ছাড়া কথা নাই। তিনি অনন্ত প্রেমিক। জগতে যেন কেহ ভালবাসিতে ভুলে না, ভালবাসা যত বিলাইবে তত বাড়িবে। ভাবিবার বস্তু আর কিছু নাই—কেবল প্রেম, প্রেম আর প্রেম। তখন চক্ষু জলে ভরিয়া যাইবে, হৃদয় অমৃত রসে সিক্ত হইবে। সেই সুধাসিক্ত অমর হৃদয়ে দেখিবে—সেই সুধাময় ভক্ত-বৎসল ভগবান বিরাজমান!

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বর্গীয় নিদ্রা।

তখন সহসা যেন দিঙ্মণ্ডল কি এক মধুর সৌরভে আপ্লুত হইল, কি এক সুমধুর ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইল। কি এক আনন্দ রসে হৃদয় আর্দ্র হইল। পিতৃদেব ত্রস্তভাবে বলিলেন "সন্ধ্যা সমাগত, এইবার একবার "সোঽহং"ভাবে বিভোর হইয়া এই ত্রিলোকধামের রজনী যাপনের সুখানুভব কর দেখি।"

---

* যা দেবী সর্ব্বজীবেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ চণ্ডী।

আমি তখন তন্ময় চিত্তে সেই অনাথনাথের ধ্যানে মগ্ন হইলাম। দেখিলাম চেষ্টায় চঞ্চল চিত্তও স্থির হয়। সে তন্ময়ত্বের কি অনির্ব্বচনীয় সুখ—কি চিত্তহারিণী শান্তি। মনে হইল ইহাই প্রকৃত নিদ্রা;—সুখ আছে কিন্তু অবসাদ নাই। নিদ্রান্তে যেমন শারীরিক ক্লান্তি দূর হয় ইহাতে তাহার অধিক হয়, কিন্তু জড়তা নাই। এ আবার কেমন নিদ্রা?—

তখন দেখিলাম, শত শত সুন্দরী স্বর্গীয়া যুবতী, হস্তে সুবর্ণ থালে সুবর্ণ দীপরাশি জ্বালিয়া এক মধুর ভাবে এই গীতটী গাহিতেছেন।

জয় জয় হরি, গোলোকবিহারী,'
পীতাম্বরধারী জয় মধুসূদন।
কংস-নিসূদন, গোপিকামোহন,
জয় বিশ্বপতি গোবর্দ্ধনধারণ॥
কালীয়দমন, , ভব-ভয়তারণ,
জয় ভকত-সখা, দৈবকীনন্দন।
শিরে শিখিপাখা, বামে ঈষৎ বাঁকা,
রাসবিহারী হরি; জয় জনার্দ্দন॥
ত্রিভুবনপালক, ভব-ভীতিনাশক,
জয় দিনবন্ধু দীন-জন-তারণ।
গরুড়বাহন, কৌস্তুভধারণ,
জয় জয় পদ্ম-পলাশলোচন॥
শঙ্খ চক্র গদা, করেতে শোভে সদা,
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ শ্রীচরণ শোভন।
বংশী-বিনোদন, অধর শোভন,
জয় নিখিলনাথ, সুদর্শনধারণ॥

আমি অনেকক্ষণ সেইভাবে বিভোর হইয়া রহিলাম মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব হইল। তেমন সুখ আমি আর কখন উপভোগ করি নাই। অনেকক্ষণ পরে বলিলাম "মনুষ্য মৃতব্যক্তির জন্য সর্ব্বদা অনুতপ্ত কেন?"

পিতৃদেব কহিলেন "আত্মার অমরত্বে মনুষ্যের প্রকৃত বিশ্বাস নাই। যে অত্যন্ত রাগান্বিত তাহাকে "কেন রাগ কর" বলিলে তিনি যেমন বলেন "কই রাগ কিসের।" ভীত ব্যক্তিকে "ভয় কি" বলিলে তিনি যেমন বলেন "না, ভয় ত করিনি।" তেমনি মানব আত্মার অমরত্বে

ধ্রুব বিশ্বাস না করিলেও বলিয়া থাকেন "আত্মা অবিনশ্বর বই কি।" আত্মা অবিনশ্বর জ্ঞান থাকিলে মৃতের জন্য সংসারীর অশ্রুজলের মাত্রা কম হইত। প্রকৃত জ্ঞানী—মৃত বা জীবিত ব্যক্তির জন্য শোক করেন না। কারণ শোকের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই, উহা মনোবৃত্তি মাত্র। পর ও আপনার জ্ঞান তিরোহিত হইলে তবে মনুষ্যের সুখ দুঃখের অবসান হয়, নতুবা হয় না। পরের জন্য দুঃখ নাই কিন্তু নিজের আত্মীয় স্বজনের জন্য আছে। আজ যাহার জন্য ব্যথিত, কাল আর নই। এ ভাব মনুষ্য হৃদয়ে সর্ব্বদা বিদ্যমান, তাই বলি সুখ দুঃখ মনোবৃত্তি মাত্র। জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র পরিধান করার ন্যায় আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অভিনব দেহান্তর পরিগ্রহ করেন। ইহারই নাম মৃত্যু।*

আমি। তবে সংসারস্থ আত্মীয়গণ আর আমাদিগকে মন মধ্যে স্থান দিবে না?

পিতা। আমি তাহা বলি নাই তাহাদের চিন্তা আর তাহাদের জন্য দুঃখ করা এক কথা নয়। আমরা দেহোৎপত্তির পূর্ব্বেও ছিলাম এখনও আছি ভবিষ্যতেও থাকিব। জীব দেহে আত্মার বাল্য কৌমার যৌবন বার্দ্ধক্য প্রভৃতি এক একটা প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন মাত্র, মৃত্যুও তদ্রূপ একটী অবস্থা বিশেষ।†

---

* বসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নব গৃহ্ণাতি নরোঽপরানি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ গীতা।

† *What is Death?—A Physiological View.* To say that death is the separation of soul and body, is to give what sounds like a theological rather than a physiological definition. Yet this is the final definition that is reached by Dr. Leon Meunier, after treating the question strictly from the physiologist's point of view. While thus acknowledging the existence of the soul, Dr. Meunier, who writes (in *Cosmos*, Paris, November 18th 1899) on "The Causes and Mechanism of Death," asserts that the soul and body can not separate until certain physiological conditions are fulfilled, and his endeavour is to ascertain and describe what the nature of these conditions is.

"Professor Weismann, of Friburg, says Death, is not a primitive attribute of living matter; it is of secondary origin. There are animals that never die; for instance, infuseria and rhizopods and in general all unicellular organisms. Anameba divides into two almost equal parts, each of which continues to live, and later divides again, so that there is never any corpse. Death appears only among pluricellular organisms with differentiated cellules (and is then) based solely on utility. * * * Used-up individuals must give place, for the good of the species, to healthy ones. Hence we must regard death as an opportune institution, not as a necessity of life."

তাহাতে দেহেরই একটী পরিবর্ত্তন মাত্র হয়, আত্মা পূর্ব্বমতই থাকে।* কোন বিদেশবাসী আত্মীয় পরিবারসহ সুখে আছেন জানিলে আমরা ব্যথিত হই না। কারণ তিনি যত্ন করিবার লোকের কাছে যত্নে আছেন, কিন্তু মৃত ব্যক্তি যে যত্নের আধার জগজ্জীবনের কাছে আছেন, তাহা ভাবিতে পারেনা।

আমি। সংসারীকে আপনারা তাহা বুঝাইয়া দেন না কেন?

পিতা। আমরা সর্ব্বদা আত্মীয়দের সম্মুখে বিরাজমান, কিন্তু তাঁহারা আমাদের সত্বা অনুভব করিতে পারেন না। রাত্রে সকলে অসংখ্য নক্ষত্র দেখিতে পান কিন্তু দিবসে পান না, কিন্তু তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে যে দিনে আকাশে তারা নাই? যখন সূর্য্যগ্রহণের পূর্ণগ্রাসকালে তারা বাহির হয়, যখন যন্ত্র সাহায্যে দিবসে তারা দেখা যায়, তখন তাহা আর অবিশ্বাসের বস্তু নয়।—তেমনি জ্ঞানীর নিকট আমরা সদত যে মানবগণের নিকটবর্ত্তী তাহা সম্পূর্ণ সত্য। যাহাদের সেরূপ জ্ঞান নাই তাঁহারা তাহা অনুভব করিতে পারেন না, কিন্তু এই অনুভূতি শক্তির হ্রাস কি ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস লাঘবের অন্যতম কারণ নয়?

আমি। এক ভাবে তাই বটে, কিন্তু মৃত্যুর ভয় মনুষ্যের যে বড় বেশী।

পিতা। পাপীর পক্ষে মৃত্যু মহাভয়ের কথা। যাহার পরলোকে বিশ্বাস স্থাপনের আস্থা কম, তাহাদের পক্ষে নাস্তিকতাই সুখের। কিন্তু বিবেকী মরণকে ভয় করেন না। আত্মার অমরত্ব চিন্তায় তাঁহাদের ভয় দূরে গিয়া পরজন্মের সুখ কল্পনাই হৃদয়ে জাগে।

আমি। এখানে আর সেখানে মৃত্যু জ্ঞানের তারতম্য অনেক।

পিতা। হইবারই কথা, মনুষ্য হারাইয়া কাঁদে কিন্তু এখানে হারাণ ধনের পুনঃ প্রাপ্তির আশায় উৎফুল্ল হয়। তবে দুঃখ কোথায়? মনুষ্য যেখানে কিছু দেখিতে পায় না তাহাই অন্ধকার বলিয়া ভাবে, পরজন্ম তাহাদের পক্ষে

Dr. Meunier makes the following comment in closing his article :

"As the catechism teaches us, death is characterized by the separation of soul and body ; but we must recognize the fact that it begins with a condition of the organs that renders them incapable of following and manifesting the will of their master. Life may be only suspended ; death becomes definitive when the cellular elements, profoundly altered, are positively unable to obey any longer."

* দেহিনোঽস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

তাই অন্ধকারময়;—তাই পরজন্মে ভয় হয়। কিন্তু যেখানে কত ভাল-বাসার ধন বিরাজমান সেখানে যাইতে ভয় কি? আর যদি প্রকৃত ভয়ই হয়, তবে আর সংসারের সুখ কোথায়? কত ভালবাসার বস্তু আমরা নিত্য হারাইতেছি কিন্তু তাহাদের পুনঃ প্রাপ্তির আশাও কি মহা সুখের মহা সন্তোষের কথা নয়? কিন্তু কয়জন তাহা ভাবেন?

আমি। মনুষ্য তবে অমর হইতে বাসনা করে কেন?

পিতা। সেইটাই পাপ। যেখানে মনুষ্য মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আত্মঘাতী হইতে বাসনা করে, কেহবা হয়;—কেহ বা সময়ে সময়ে ভগবানকে কাতরভাবে তাহার জীবন শেষ করিবার জন্য ডাকে, সেখানে অমর হইলে সুখ কোথায়? এক একটী শোকে লোক অধীর হয়,—চিরদিন শোক সহ্য করিতে কে পারে? অর্থ, কষ্ট, মনস্তাপ, শোক, দুঃখ প্রভৃতিতে সংসার ভরা; সেখানে অমর হইলে সুখ আছে কি? কিন্তু মানুষ ভাবে বটে যে আমি যদি অমর হইতাম। সে কেবল পরজন্মের ভয়ের জন্য আর পরলোকের অবিশ্বাসের জন্য।

আমি। তবে কি অমর কেহ নাই?

পিতা। সেই বিশ্বস্রষ্টাই অমর,—আর অমর তিনি, যিনি তাঁহাতে অনুরক্ত। মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতে ময়দানবের সুখৈশ্চর্য্য বর্ণনাকালে একস্থানে লিখিয়াছেন যে "ঐ স্থানের অধিবাসীরা নিরন্তর দিব্য ঔষধি, রস, অশন পান করাতে তাহাদের কখন মনঃপীড়া, ব্যাধি, মাংসলোলিত্য বা জরা হয় না। শারীরিক দৌর্গন্ধ্য, ঘর্ম্ম, শ্রম প্রভৃতি হয় না। বয়সের নিমিত্ত অবস্থা ভেদও হইবার সম্ভাবনা নাই অর্থাৎ তাহারা চির যৌবনের সুখ ভোগে নিরত।* ইহা পাঠে অল্প বুদ্ধি সেই ঔষধি পান করিয়া সেইরূপ জরা বিহীন দেহ ও চির যৌবনলাভ করিতে পারিলে জীবন কি সুখের হয় তাহাই ভাবে, কিন্তু বুদ্ধিবান বুঝিতে পারেন সে রস কি? এবং যিনি পান করিবেন তিনি ত অমর! তাহার আবার বলি পলিতাদি কি? কিন্তু সে আধ্যাত্মিক ভাব সংগ্রহ করিলেও কোন ফল নাই, তদনুরূপ কার্য্য সম্পাদনের বাসনাই বস্তু।

---

* নচা এতেষু বসতং দিব্যৌষধি রসরসায়নাশন,
পান স্নানাদিভিরাধয়ো ব্যাধয়ো বলি পলিতা।
জরাদয়শ্চ দেহবৈবর্ণ্যং দৌর্গন্ধং স্বেদঃ,
ক্লমোগ্লানি রিতি বয়োবস্থাশ্চ ভবন্তি॥

আমি। আমার বোধ হয় মৃত্যু অপেক্ষা মনুষ্যের মৃত্যু যাতনারই ভয় বেশী।

পিতা। তাহা নিশ্চয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মৃত্যু তত ভয়ের নয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে রোগ যাতনা অনেকটা কষ্টকর বটে, কিন্তু প্রকৃত মৃত্যু নয়। সন্তান প্রসব করিবার কষ্ট যথেষ্ট কিন্তু প্রসব সময় অতি সামান্য। রমণী প্রসবের কষ্ট পায়, কিন্তু আবার সন্তান কামনা করে। কেননা জানে তাহার পরিণাম কি। কিন্তু মৃত্যুর পারিণামের অনুভব শক্তি যে দিন মনুষ্যের হইবে, সেদিন মৃত্যু ভয়ও কমিবে। মৃত ব্যক্তিও মৃত্যুর পর প্রকৃত মৃত কি জীবিত, তাহা সহসা বুঝিতে পারেনা, মৃত কায়ার প্রতি লক্ষ্য হইলে তবে বুঝিতে পারে যে আমি মরিয়াছি।* মৃত্যুর পর মনুষ্যের দিব্য চক্ষু হয় কিন্তু পাপাত্মা সে সুখে বঞ্চিত হইয়া নরককুণ্ডে স্বীয় প্রায়শ্চিত্তের জন্য যায়।

আমি। তবে কি মৃত্যুর প্রকৃতই কোন যাতনা নাই?

পিতা। তুমি কি কোন কষ্ট অনুভব করিয়াছিলে?

আমি। না।

পিতা। তবে আর জিজ্ঞাসা কেন?

আমি। যদি লোক বিশেষে যাতনার তারতম্য থাকে?

পিতা। না তা নাই। যাঁহারা লোককে মরিতে দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহা স্বীকার করিবেন। এই রোগী রোগ যাতনা ভোগ করিতেছে, এই নাই। মরণের যাতনা থাকিলে মরণের পূর্ব্ব লক্ষণে তাহা দেখা যাইত, কিন্তু তাহা যায় না। কে কবে দেখিয়াছ মরণের পূর্ব্বে রোগী অসীম যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া উঠিল? বরং তাহার বিপরীতভাব দেখিতে পায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে রোগ যেন কমিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

আমি। রোগের মৃত্যুতে না হয় তাহাই হইল, কিন্তু কাহাকেও কাটিয়া ফেলিলে কি হয়?

পিতা। সেই একই ভাব।

---

* I found myself force from my body. It was such a strange new feeling. I was standing close to the bedside on which my body was lying; I saw every thing in the room just as before I closed my eyes. I did not feel any pain in 'dying'; I felt only a great calm and peace. Then I awoke, and I was standing out-side my old body in the room. There was no one there at first, just myself and my body. At first I wandered I was so strangely well. Then I saw that I had passed over.—*Letters from Julia* p. 1.

আমি। এটা বুঝিলাম না। পাঁঠা কাটা দেখিয়াছি, সে কি কম যাতনা।

পিতা। যাতনা বুঝিলে কি করে?

আমি। তার হাত পা ছোড়া দেখে।

পিতা। সেটা স্নায়ুর আকুঞ্চন বিস্ফারণ, প্রকৃত যাতনা নয়। টিক্‌টিকির লেজ কাটিয়া দিলে দেখা যায় যে সেই কাটা লেজ ছট্‌ফট্‌ করে, কিন্তু টিক্‌টিকি করে না। এখানে কি বলিবে যে সেই কাটা লেজের অনুভব শক্তি আছে?

আমি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম, দুঃখের জন্য নয়, মনের একটা ধোঁকা যেন ভাল করিয়া জাগিয়া উঠিল, বলিলাম "তবে মাংসাহারে দোষ কি?"

পিতা। এ অন্য কথা। নিজের উদর পূর্ত্তির জন্য প্রাণীহত্যা পৈশাচিক ব্যাপার। আহারের জন্য জীবন নয়, জীবনের জন্যই আহার। মানুষ তাহা সহজে বুঝেনা, তবে বুঝে, যখন ঈশ্বরের প্রাণী নষ্ট করি কেন বলিয়া জ্ঞান হয়—যখন ঈশ্বর সকল দেহে বর্ত্তমান বলিয়া মনে হয়। সে ভাব বড় বিরল।

আমি। বিরল কেন?—অনেকেত মাংস খান না।

পিতা। ঠিক সে জ্ঞানের জন্য নয়, সে জ্ঞান জন্মিলে মাছ খাওয়াও হয় না, বিছানার ছারপোকা মারাও চলে না। মানুষ প্রাণীর আকার ভেদে প্রাণী হত্যার পাপের তারতম্য করে। আবার আচার ব্যবহার ভেদেও জ্ঞানের তারতম্য হয়। মুসলমান বা ইংরাজ মাংসাহার করিয়াও মোক্ষ লাভ করিতে পারে, কিন্তু মাংসাসী হিন্দুর প্রকৃত হরি সাধনা সম্ভবে না। যোগীরা সেই জন্য মাংসাহার করিতেন না। মাংসে হৃদয়ে পাশবিক ভাবের উদ্দীপনা করে, কিন্তু প্রেততত্ত্ববাদীদের মধ্যে কেহ তাহা স্বীকার করেন, কেহবা করেন না।*

---

* I do not think, for the purposes that I have in view, it is well to insist upon vegitarian diet. If you had been always a vegeterian, that would be different. It might, and possibly would, be better for you. But for you, and all those who are accustomed to a mixed diet, to become vegetarian in order to be better claivoyants would not be wise. And, on the same principle, I do not think that for married people there is any duty of abstinence from conjugal union as a condition of success. There must never be union without love. See *Julia's Open Door to the Open Secret* p. 124.

আমি। সে কথা যাক, এখন জিজ্ঞাসা করি মনুষ্য কি আমাদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইতে পারেন।

পিতা। অতি বড় উন্নত প্রাণ মহাপুরুষই তাহা পারেন। ইউরোপ খণ্ডে প্রেততত্ত্ববিদেরা যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন আমি সে কথা বলি না। কিন্তু যে যোগ—যে মনের স্থৈর্য্যতা দেহী মাত্রকে পরলোক পর্য্যন্ত দেখাইতে সক্ষম, সে ক্ষমতার পরিচালনা কমিয়া আসিতেছে। তাই আমাদের সহিত ক্রমিক দূরত্ব স্থাপিত হইতেছে।

আমি। সে অভাব দূর করিবার কি কোন উপায় নাই?

পিতা। আছে—আমাদের চিন্তা।

আমি। পাশ্চাত্য প্রেততত্ত্ববিদরা ত নিবিষ্ট মনে সেই চিন্তা দ্বারাই পরলোকগত ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে যত্নশীল হইয়াছেন।

পিতা। সত্য, কিন্তু তাহা, কিছুই নয়। প্রবীণ বিজ্ঞ ইংরাজই আবার তাহা স্বীকার করেন। জ্ঞানের নামই প্রকৃত যোগ।* আমি তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ দেশে সয়তানের অভাব নাই, তাহারই কৌতুহল পরবশ প্রেততত্ত্ববিদদের আশ্রয় করে। তাহাতে তাহাদের স্বার্থ আছে। এ কথাও আধুনিক প্রেততত্ত্ববাদীরা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।†

আমি। আমাদের আর পৃথিবীতে যাইতে বাসনা হয় না কেন?

পিতা। সুখ দুঃখের বিচার কালে এই বুঝা যায় যে আমরা আর পৃথিবীতে যাইতে চাই না। আত্মীয় স্বজনের জন্য ক্ষণতরেও সে বাসনা

---

* The leading article in the April number is a 'Message' the contents of which astounded Mr. Stead far more than they will any student of Raja-Yoga, even though but little advanced in his acquaintance with Patanjali's System. The facts are as old as Aryan time, and the only wonder is that Mr. Stead should be learning them at this late hour—*Theosophist*. Edited by Colonel Olcott.

† There are those, who are by no means so few in number, who will wish to perpetuate a sinful relationship. They will not admit this. But they will seek it earnestly, desperately, more often than you imagine. And it may be granted them. The alliance that had been severed by the grave may be resumed. Yes, this is possible and is done. There is possibility of the resumption of relations, which you believed had been severed for ever by death. There is danger here, and it is a danger against which you must be on your guard. Therefore, I say, do not think that the Bureau will be unmixed good!

Men will find what they bring. And the majority of men will seek not good, but what they desire. Now, the desire of men is by no means always for that which is highest and best—*Spirit Communications* p. 113.

হয় না। সুতরাং সে সংসার অপেক্ষা এ সংসার যে সুখময় তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

আমি। এখানে কি আকাঙ্ক্ষা একবারে নাই?

পিতা। আছে,—পৃথিবী অপেক্ষা আর একটী বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা এখানে বলবতী। সেটী শিখিবার ইচ্ছা। আমরা নিত্য নূতন দেখি। নক্ষত্রে নক্ষত্রে, গ্রহে উপগ্রহে, যেন পরিচিত স্থানের মত বিচরণ করিয়া বেড়াই, কিন্তু তবু সেই অনন্ত জ্ঞানময়ের অনন্ত জ্ঞানের কণামাত্রও বুঝিতে পারি না। তাই সর্ব্বদাই প্রাণে শিক্ষার বলবতী ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে, তাহার বুঝি কখন নিবৃত্তি নাই।

আমি। মনুষ্যের নরকে বিশ্বাস আছে কি?

পিতা। পাশ্চাত্য সভ্য-জগতে এককালে নরকে বিশ্বাস ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত মিল্‌টন। কিন্তু এখন আর তাহা নাই। সেই ঘোর অগ্নিময় মহানরকের অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন না।* সেটা পাপের প্রসার বৃদ্ধি করা মাত্র। অনুতাপ মহানরক, প্রকৃত অনুতাপ সংসারে নাই—এখানে আছে, কিন্তু তাহার যাতনা অসীম। সুতরাং তাহাও এক মহা নরক।

আমি তখন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম "নরকে বিশ্বাস সম্বন্ধে তাহারা এখন যাহাই ভাবুক, পর জন্মের কোমল সুখময় চিত্র অনেকটা শিখিয়াছে। জর্জ্জ এণ্ডারসন্ সেদিন আত্মার "অমরত্ব" সম্বন্ধে একটী সুমধুর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার শেষ অংশটুকু পড়িলে মনে হয় কে যেন তাঁহার হৃদয়ে পরলোকের অস্তিত্বের ছায়া আঁকিতে আঁকিতে আবার সরিয়া গিয়াছেন।†

---

* People don't believe in the hell of fire any more. *Lights from the Borderland* p. 99.

† Of all the millions of the dear death-parted
No Soul hath e'er returned the tale to tell
No sign—no word—to cheer the broken-hearted,
Or give the sweet assurance, "*All is well.*"

We ask for proof, and not for poet's fancies;
We hope, but with a dim and starless hope,
Clouded with doubt, that evermore enhances
The dark uncertainly in which we grope.

পিতা। আন্তরিক মনের উদ্বেগ ও জানিবার ইচ্ছায় কতক সাফল্য লাভ করা যায়, কিন্তু তাঁহাদের এখনও জানা নাই যে দিব্য চক্ষে মৃত ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমি। তাহার কারণ কি?

পিতা। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বা বৈদ্যুতিক বলের অসাধারণত্ব মানুষ দেখিতে পায় না, কিন্তু তাহার সত্বা বিশ্বাস করে, কারণ তাহাদের এমন জ্ঞান জন্মিয়াছে যে তাহাতে ঐ সকল বিশ্বাস করা বিধেয়। তেমনি সকল বিষয় জানিবারই সেইরূপ জ্ঞানের আবশ্যক। সে জ্ঞানের অভাব বলিয়াই পরলোক—পরলোকের স্থায়িত্ব বা আত্মার অমরত্ব তাহাদের নিকট এখনও অন্ধকার। কতদিনে যে সে অন্ধকার ঘুচিবে, তাহা কে বলিবে?

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আত্মায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

আমি বলিলাম "তবে সকল আত্মাতেই ত ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন?"

পিতা। আছেন, কিন্তু সে জ্ঞান মনুষ্যের সহজে হয় না। থাকিলে আত্মার পবিত্রতা সম্পাদনে সকলে যত্নশীল হইতেন।

আমি। এ জ্ঞানের বিকাশ সাধন না হইবার কারণ কি?

পিতা। একাগ্রভাবে চিন্তার অভাব। মনুষ্য একাগ্র চিত্তে দেবমন্দিরে হত্যা দিয়া সদ্য প্রাণনাশকারী রোগ হইতে মুক্ত হয়। কে তাহাকে অভীপ্সিত বর দেয়? সেই আত্মা। যে আত্মায় ঈশ্বর নিত্য বিদ্যমান, সেই ঈশ্বররূপী আত্মা সকল পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। কিন্তু তবু মনুষ্য

Oh! give us back our early faith unshaken,
That our dear dead are watching us for aye,
And know and love us, though on earth forsaken,
Soon re-united for eternal day.

No answer comes to that vain supplication,
And none will come—or ever come before,
For widow's hope or mother's consolation,
Our dead, alas! are gone, and gone for evermore.

আত্মায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সহজে বিশ্বাস করিবে না। সকল আত্মাই যে অমর এবং ঈশ্বরের মহান আত্মার অংশ বিশেষ, তাহা স্বীকার করিবে না।*

আমি। তাহার কারণ কি?

পিতা। সত্যে বিশ্বাস হীনতা।

আমি। তবে কি দেবমন্দিরে দেবতার অধিষ্ঠান নাই?

পিতা। ঈশ্বর যখন বিশ্বরূপী তখন তিনি নাই কোথায়? তিনি মন্দিরে আছেন, প্রান্তরেও আছেন। যে যেখানে তাঁহাকে ডাকিবে সেই খানেই পাইবে। তোমার মা আছেন, কিন্তু বাটীর কোন ঘরে আছেন তাহা বলিতে হয় না, কেননা সর্ব্ব স্থানেই তাঁহার থাকা সম্ভব। তুমি যে ঘর হইতে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিবে সেই ঘরেই তাঁহাকে আসিতে দেখিবে।—তেমনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সেই জগন্মাতার আবাস স্থান, তিনি নাই কোথায়?—একবার মা বলিয়া ডাকিতে পারিলেই হয়।

মনে বড় তৃপ্তি অনুভব করিলাম, সজল নেত্রে পিতার দিকে চাহিয়া বলিলাম "তবে লোকে কেন বৃথা এত দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে?"

পিতা নয়ন বিস্ফারিত করিয়া জিহ্বা কাটিয়া ঘাড় নাড়িলেন, বলিলেন "বৃথা নয়,—উহাই যথার্থ। সংসারে সকলের হৃদয় সমান উন্নত নয়,—দেবমন্দির সাধারণতঃ মানব মনে ভক্তিভাব উদ্দীপিত করে। বিষয়াসক্ত মানব-মনে যত সে ভাব আসে ততই ভাল। পথে দেবমন্দির দেখিলে অমনি প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়, ক্ষণতরেও দেবতাকে মনে পড়ে, সন্ধ্যা-কালে যখন কাঁশর ঘণ্টা বাজিতে থাকে, ধূপ ধূনা পুষ্পাদির গন্ধে সেস্থান পূর্ণ হয়, তখন সেই পবিত্রতার মধ্যে সেই পবিত্রময় ভগবানকে মনে পড়ে। তাঁহাকে যতই মনে পড়ে ততই মঙ্গল। সেই জন্য দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা মহাধর্ম্ম। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ সদত বিরাজমান, কেননা তিনি বলিয়াছেন "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।" লোক এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বৃন্দাবনের রজঃ মাখিয়া ভক্তিভরে গদ্গদ হয়। অন্যত্র সেভাব আসেনা। বকুলতলায় ভূত আছে, এই যে প্রবাদ ইহা যায় না।—বকুলতলায় গভীর রাত্রে একাকী গেলেই ভয় হয়। মনোবৃত্তির গতি এমনি। কিন্তু

* All souls are eternal, being parts of the Divine Essence. *Light from the Borderland* p. 161.

যাঁহার মনের দৃঢ় ধারণা আছে, যিনি মা আমার সকল ঘরেই আছেন বলিয়া জানেন তাঁহাকে সে ধোঁকায় পড়িতে হয় না।

আমি। তবে কি তীর্থদর্শন বৃথা ?

পিতা। যে স্থানে দিবানিশি কত মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় সে স্থান পরিদর্শনে মহাফল।

আমি। সে ফল কি ?

পিতা। চিত্ত শুদ্ধিই সর্ব্বপ্রধান। তীর্থদর্শনে তাহা না হইলে কিছুই হইল না। গঙ্গাস্নানে সহস্র জন্মের পাপ বিনাশ হয়, কিন্তু কে গঙ্গাস্নানান্তে একাগ্র মনে ভাবিতে পারে যে আমি নিষ্পাপ। একবার কাশীধামে পদার্পণ করিলে আর তাহার উদ্ধারের ভয় নাই,—একবার রথে জগন্নাথদেব দর্শন করিলে তাঁহার পুনর্জ্জন্ম নাই, কিন্তু সে কথা কে ভাবিতে পারে ?—চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত এ ভাবনা হয় না,—আর সে ভাব যাঁহার হৃদয়ে না আসে, তাঁহার তীর্থদর্শন বৃথা।

আমি। সে বিশ্বাস জন্মে কিসে ?

পিতা। বিশ্বাসই জ্ঞানের পরিচয়। সদ্যজাত শিশুর আত্মা আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে কিন্তু আত্মা আছে বলিয়া কি তাহাকে গীতা বুঝাইতে হইবে ? না বুঝাইলেই সে বুঝিবে ? তেমনি অধিকাংশ লোকেরই বুঝিবার ক্ষমতার বিকাশ হয় না। বুঝাইলেও বুঝেনা, বা আত্মাহংকারে মত্ত হইয়া না বুঝিবার চেষ্টা করে, সুতরাং বিশ্বাসও জন্মে না।

আমি। জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে কি ভ্রূণের দিব্য জ্ঞান থাকে ?

পিতা। থাকে, কিন্তু জন্মগ্রহণ মাত্র পূর্ব্ব জ্ঞানের বিলোপ পায়। মৃত্যুর পর আবার নূতন জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া নূতন জীবনের আরম্ভ হয়। এ সকল তুমি ক্রমে বুঝিবে। এখানে প্রাণকে যতই প্রেমরসে সিক্ত করিতে পারিবে ততই মানসিক উন্নতি লাভ করিবে। স্বর্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থান যতই দেখিবে ততই তুমি সে কথা বুঝিবে। স্বর্গীয় ভালবাসায় চিত্ত প্রমত্ত হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ভালবাসার অসারত্ব উপলব্ধি করিবে।

মন যে কত প্রফুল্লিত হইল তাহা আর কি বলিব। আমি বলিলাম "ঈশ্বরে লীন হওয়ার নামই কি নির্ব্বাণ ?"

পিতা। নির্ব্বাণ স্বতন্ত্র। তিনি বিশ্বরূপী; জলে, স্থলে, অনিলে, শূন্যে সর্ব্বত্র বিরাজিত। আমরা অহরহ তাঁহাতে লীন হইয়া আছি। সেই ভক্ত-

ভয়-ভঞ্জনের অনন্ত প্রেমসাগরে ডুবিয়া অবিরত তাঁহার অনন্ত প্রেমের আস্বাদনে বিভোর হইয়া আছি। আত্মা অমর,—আর আমিই তিনি ভাবিলে, তাঁহার সুখই আমার সুখ, তাঁহার কার্য্যই আমার কার্য্য। তখন আর তিনি আমি প্রভেদ থাকে কই? তখনই আমরা প্রকৃত তাঁহাতে লীন বলিয়া মনে করি, আর সেই ভাবের নামই নির্ব্বাণ।

আমি। সংসারে নানা রূপ ধর্ম্ম বর্ত্তমান। কেহ বৈষ্ণব, কেহ শাক্ত, এইরূপ। দেব দেবীতেও ইতর বিশেষ জ্ঞান আছে। কেহ বলেন কালী বড়, কেহ বলেন শিব বড়, কেহ বলেন হরি বড়, কিন্তু প্রকৃত বড় কে?

পিতা একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "মনুষ্যের অল্প বুদ্ধি ও অজ্ঞানতাই ইহার পরিচয়। আমার আত্মাই ঈশ্বরের, সুতরাং আমার আত্মাও ঈশ্বর, প্রকৃত যাঁহার এ জ্ঞান হয় তাঁহারই—"সোঽহং" জ্ঞান জন্মিল। সে জ্ঞান যখন আমার জন্মিবে তখন কে শ্রীকৃষ্ণ কে আমি তাহা ত আর পৃথক্ করিতে পারিব না। একটু গঙ্গাজলে আর একটু গঙ্গাজল মিশাইলে কোনটী এটী আর কোনটী সেটী, ইহা যেমন বুঝিবার উপায় নাই, তেমনি "সোঽহং" জ্ঞানের পূর্ণবিকাশে কে হরি, কে আমি ইহা পৃথক্ করা যায় না। তখন আমি তাঁহার প্রসাদ খাই, বা তিনি আমার প্রসাদ খান, তাহার জ্ঞান থাকিবে না। যখন এ জ্ঞান জন্মিবে তখন আর তাঁহাকে বুঝাইতে হইবে না যে কালী বড়, কি কৃষ্ণ বড়। ঈশ্বরই সব, আর সবই ঈশ্বর। মনুষ্য ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাই দেব দেবীতে পার্থক্য করে। সংসারে যেমন অর্থবান বা বলবানের সম্মান বেশী, তেমনি দেবতার বল বা ক্ষমতা প্রভৃতির ইতর বিশেষ দেখিয়া বড় ছোট করে। কিন্তু ঐশী শক্তি যে সকলে সমান, তাহা জ্ঞানী ভিন্ন বুঝিতে পারে না। রেল গাড়িতে অনেক কামরা থাকে, যে যেখানে থাক সেইখানেই সেই একই বল, একই গতি অনুভব করিবে। গাড়ি বিশেষে গতির ইতর বৃদ্ধি নাই। তেমনি সকল দেব দেবীতেই জগদীশ্বরের সত্ত্বা বর্ত্তমান, কাহাকে ছোট কাহাকে বড় বলিব? ছোট কেহই নয়। আমাদের অজ্ঞানতাই ছোট বড় করে, নতুবা তাঁহারা সকলেই সমান। প্রেমবিহ্বলা শ্রীরাধা সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শন করিয়া তমাল তরুকে কৃষ্ণ বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তেমন চিত্তের তন্ময়ত্ব না জন্মিলে ঈশ্বর জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ হয় না।

আমি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম "এতক্ষণে বুঝিলাম।" বস্তুতঃ

আমার হৃদয়ে তখন যেন একটী মহা সমতা, ক্ষমতা বিস্তার করিল। হৃদয়ে এক মহা ভাবান্তর উপস্থিত হইল; তখন যেন সর্ব্বত্র ঈশ্বর বিদ্যমান বুঝিতে লাগিলাম। প্রহ্লাদ এই জ্ঞানে বিভোর হইয়াছিলেন, আজি সেই জ্ঞান যেন ধীরে ধীরে আমার অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন হৃদয় মৃদু আলোকিত করিতে লাগিল। আমার চক্ষে বস্তুতই জল আসিল, বলিলাম "বাবা, আমি কি একবার সেই সর্ব্বজীবময়, বিশ্বদেহী গোপিকারঞ্জন গোলোকবিহারী শ্রীহরিকে দেখিতে পাইব না?"

পিতা। পাইবে বই কি,—তিনি যে সর্ব্বক্ষণ হৃদয়গোলোকে বর্ত্তমান—কতবার নয়ন সম্মুখে মুরলী অধরে বাঁকা হইয়া দাড়াইয়া তোমার হৃদয়পদ্ম আলো করিয়াছিলেন, তাহা ত তুমি দেখিতে পাও নাই। তিনি যে সকলের সখা, সখা কবে কাহাকে দর্শন দানে বিরত।

আমি। আমি সেই বামে হেলা যুগল মূর্ত্তি দেখিব।

পিতা। তাহাই দেখাইব,—এখানেই দেখাইতাম, কিন্তু তাহাতে তোমার তৃপ্তি হইবে না;—চল সেই নিত্য নব বৃন্দাবন স্বরূপ গোলোকধামে যাই।—ইহার পর আর তাহা করিতে হইবে না, একবার চিনিলে তাঁহাকে যেখানে সেখানে দেখিবে। মানুষ তীর্থে যায় এই ধোঁকায় পড়িয়া—কেন না তীর্থে ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রশান্তভাবে আসে, এস তোমায় গোলোকধামে লইয়া যাই। যাহা চন্দ্রলোকে নাই, সূর্য্য লোকে নাই, ধ্রুব লোকে নাই—তাহা বৈকুণ্ঠে আছে। এস বাপ্ তবে আর বসিয়া কেন একবার অনন্ত শান্তিময় বৈকুণ্ঠধামে যাইয়া সেই বৈকুণ্ঠপতিকে দেখিয়া জীবনের, আত্মার, মনের, ইন্দ্রিয়ের প্রকৃত চরিতার্থতা সম্পাদন কর।

তখন পিতার সঙ্গে চলিলাম। মনে উৎসাহের কথা আর কি বলিব? আমি গোলোকপতিকে দেখিতে যাইতেছি, ইহা কি কম আনন্দ! তখন ভাবিতেছি সে গোলোক না জানি কেমন, সেখানে বুঝি চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, আছে কেবল ইন্দ্রধনুর নয়নানন্দপ্রদ অনন্ত শোভা। সেখানে দুঃখ নাই, শোক নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, নিরাশা নাই,—আছে কেবল শান্তি, সুখ, আর তৃপ্তি। সেই সর্ব্বনিয়ন্তা, সেই সুখময় স্থানে রাধিকাকে লইয়া বাঁকা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হায় ভক্তবৎসল শ্রীহরি, না জানি তোমার কি অপরূপ রূপ! যাঁহার নয়ন সে রূপে মুগ্ধ, না জানি তিনি কি ভাগ্যধর! আর আমিও মহাভাগ্যধর যে সেই রূপ—যেরূপে ত্রিভুবন মুগ্ধ, সেই রূপ দেখিতে যাইতেছি।

এমন সময় কে যেন আমায় বলিল "আজ যে বড় ঘুম,—কত বেলা হল দেখ দেখি।"

একি এ যে পূর্ব্ব পরিচিত স্বর,—কি সর্ব্বনাশ—এমন সময় আমায় কে ডাকে, কে আমার শ্রীহরি দেখার বাসনা ঘুচায়?

তখন অঙ্গে হাত পড়িল, আবার সেই স্বর, বলিল "বলি শুনচ?"

ত্রস্তভাবে উঠিয়া বসিলাম, চক্ষু মর্দ্দিত করিলাম। কিন্তু কি দেখিলাম—যাহা দেখিতে আর ইচ্ছা হয় না আবার যে তাহাই দেখিতেছি। এ যে কুসুম—অধরে যে সেই হাসি—হৃদয়ে যে সেই ভালবাসা। মধুর হাসিয়া কহিলেন "অমন করে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে আছ কেন?"

ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিলাম,—এত সেই ঘর। ভাবিলাম তবে কি আমি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম। বুঝিলাম স্বপ্নই বটে—তখন কুসুমের স্কন্ধে বাম হস্তটী অর্পণ করিয়া সেই বিস্ময় বিস্ফারিত বদনের দিকে সকরুণ নেত্রে চাহিয়া বলিলাম "কুসুম কেন আমার ঘুম ভাঙ্গাইলে, আমায় একবার সেই বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরির শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে দিলে না।"

কুসুম অবাক্ হইলেন। অবাক্ হইবার কথা বটে,—ভাবিলেন—এত দিনে বুঝি আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, স্বামী উন্মত্ত, এ কথাবার্ত্তা ত পাগলেরই মত।"

আমি কোন কথা কহিলাম না, কেবল ভাবিতে লাগিলাম "একি হইল, কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম। আবার সংসার মায়ায় মুগ্ধ হইলাম।"

কুসুমের দুই চক্ষু বহিয়া দর্দর্ ধারে অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল, বলিলেন "কথা কওনা কেন গা?"

হায় মায়া, তুমি কর কি? কুসুমের চক্ষের জল দেখিয়া আবার আমার প্রাণ কাঁদিতেছে। গোলোকনাথের পরিবর্ত্তে সন্তানগুলিকে, জননীকে, ভ্রাতৃগণকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমি যে নিদ্রা হইতে উঠিলাম তাহা যেন আর মনে হইতেছে না, মনে হইতেছে আমি কতকাল যেন তাহাদিগকে দেখি নাই। আমার মুখভাব দেখিয়া কুসুমের ধারণা আরও দৃঢ়ীভূত হইল, বলিলেন "অমন করে চেয়ে কেন?"

আমি। মনের যেন ঠিক নাই।

কুসুম। কেন?

আমি। তা জানিনা।

কুসুম অতি কাতরভাবে আমার কপালে, বক্ষে হাত দিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিলেন না। কেবল উদাস প্রাণে—বিকল হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন "কেন এমন হইল।"

কুসুমের অবস্থা দেখিয়া আর আমি থাকিতে পারিলাম না, হাসিয়া ফেলিলাম। হাসি আরও কাল হইল। কুসুম মাকে ডাকিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া বলিলাম "কি ভাবিতেছ।"

কুসুম। তুমি বসো, আমি আসৃচি।

আমি। আর যেতে হবেনা।

কুসুম আবার অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইলেন।

কুসুমের মানসিক অবস্থার গতি বুঝিতে পারিয়া বড় দুঃখ হইল, তখন তাহাকে সযত্নে পার্শ্বে বসাইয়া সমস্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলাম। কুসুম স্তম্ভিতা হইলেন, বিস্মিতা হইলেন—বলিলেন "অন্যায় করিয়াছি বটে—কিন্তু উপায় ত নাই। এখন হইতে আমরা দিবানিশি ভাবিব সেই যুগল মূর্ত্তি আর সেই রাজিব চরণ কমল। সেই ধ্যানেই এ জীবন কাটাইব, তাহা হইলেও কি আমাদের প্রতি তাঁর দয়া হবে না? অন্তিমে একবার, এক মুহূর্ত্তের জন্যও দেখা দিবেন না?"

সমাপ্ত।

রাঙ্গা-বৌ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৌ--মা।

"বৌ মা ও বৌমা ?"

উত্তর নাই।

"শুনতে পাচ্ছ না কি, বলি ও বৌ-মা ?"

আবার উত্তর নাই।

শাশুড়ী চটিলেন, বলিলেন "এমন বেয়াড়া বৌ আমি বাপের জন্মে দেখিনি, বলি ও বৌমা ?"

বৌমা তখন আপন কক্ষে দর্পণ সম্মুখে বসিয়া এক গাছা চুলের দড়ি দাঁতে চাপিয়া খোঁপা বাঁধিতে ছিলেন। বৌমার বয়স আন্দাজ আঠার বৎসর, ফিট্ গৌরবর্ণ, নাক মুখ চোখ বেশ। বৌমার কোলে একটী ছেলে, বয়স আন্দাজি দুই বৎসর, কিন্তু বৌ-এর গায়ের বাঁধুনিটী আছে ভাল, ছেলের মা বলিয়া জানায় না। তায় আবার বৌমা কিছু ফিট-ফাট্। বৌমার বাপের বাড়ী পাড়াগাঁয়ে, শ্বশুর বাড়ীও তাই, কিন্তু বৌমা প্রত্যহ মাথা বাঁধিবার সময় "জবাকুসুম তৈল" ব্যবহার করেন, পাড়ার লোক হাসিলেও সেমিজ পরেন, বডি আঁটেন, আর সময়ে সময়ে কাঁচুলিও পরেন। নিজের বিলাসিতার ছায়া ছেলেটীতে বর্ত্তিয়াছে, সন্ধ্যাকালে প্যারাম্বুলেটারে একটু না বেড়াইলে তাহার নাকি রাত্রে ঘুম হয় না।

বৌমার শ্বশুর বাড়ীটী পাকা ঘর নয়, মাটীর, তারই আবার দোতালা। সহরের পাঠক হয়ত মাটীর দোতালা শুনিয়া হাসিবেন, প্রকৃতই তাই। বাহিরে একটী চণ্ডিমণ্ডপ তাহারই পার্শ্বে এক বকুল গাছ। গাছটীতে যখন ফুল ধরে তখন পাড়ার য

খানে আসিয়া ফুল কুড়ায়, মালা গাঁথে, আর কেহ বা কুড়াইয়া গৃহে লইয়া যায়, নিশিথে কোন বিলাসিনী সে গুলি শয্যা পার্শ্বে স্থাপনা করিয়া সুখ-বাসর করেন কিনা তাহা দেখি নাই।

ঘর গুলির আস্‌বাব তেমন জাঁকাল নয়, সামান্য তক্তাপোষ, দেয়ালে দুই একটা আর্টষ্টুডিওর পুরাতন ছবি, তাহার খানিক আর্শলায় খাইয়াছে, কোণে মাকড়সার জাল, কোন ঘরে কড়ির আল্‌না তার উপর সরা বাঁধা, ময়ূরপুচ্ছের পাখা, কড়ির আয়না, ঘরের পার্শ্বে দুই একটী টিন ও বেতের তোরঙ্গ, দুই একটা কাপড় বাঁধা পুঁটুলি, দুটা বা বেতের ধামা, তায় জিনিস পত্র, এক কোণে বা জল চৌকিতে বাসন সাজান, দাওয়ায় পিতলের ঘড়া, তার কোনটা জল ভরা, কোনটা খালি। বাটীতে দাস দাসীর বাহুল্য নাই, একটী বৃদ্ধা মাসিক ॥৹ আনা বেতনে কাজ কর্ম্ম করে। তবে বৌমার একটী খাস ঝি আছে, সে ছেলে লইয়াই থাকে, ঘরের ত ব্যাপার এই, তবে বৌমার এত চলে কিসে?

গৃহের কৃতি সন্তান বৌমার স্বামী, তিনি পুলিশের সব ইন্‌স্পেক্টর। বৌমা জালি বোটের মত জাহাজের পেছুতেই থাকেন কিন্তু আজ এক মাস হইল বাটী আসিয়াছেন। স্বামী বিদেশে, তাঁহার নাম হরিচরণ।

হরিচরণ বাবুর আর তিনটী ভাই, তিনটিই নিষ্কর্ম্মা। সকলেরই বিবাহ হইয়াছে। তবে হরি বাবু স্বগ্রামেই বিবাহ করিয়াছেন। তাই বুঝি গ্রামের মেয়ে বলিয়া বৌমা বড় কাহাকেও খাতিরে আনেন না। বউ গুলি সবই দেখিতে ভাল, তবে হরি বাবুর স্ত্রী সর্ব্বাপেক্ষা টক্‌টকে, তাই শাশুড়ী আদর করিয়া নাম রাখিয়াছেন "রাঙ্গা-বৌ।"

সংসারে রাঙ্গা বৌএর খাতির বেশী, আর না হবেই বা কেন? হরি বাবুর পয়সায় সকলে সংসারী, সুতরাং তাঁহার স্ত্রী সকলের উপর না হইবেন কেন? রাঙ্গা বৌমার বেশ বিন্যাস, আর দর্পণে মুখ দেখাতেই দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়, তবে বৌমা আর কাজ কর্ম্ম করেন কখন। তাহার উপর তাঁহাকে কাজ কর্ম্ম করিতে বলে এত সাহসই বা কার? যাঁহার তাঁবে পাঁচশত চৌকিদার, দশ জন কনষ্টেবল, দুইজন ...র, একজন হেড কনষ্টেবল তাঁহার গৃহিণী কি সোজা গৃহিণী!

...রর বেতন ৬০৲টী মাত্র টাকা হইলেও তিনি ঘর করিয়াছেন, ...রিণী কিনিয়াছেন, নয়-শো টাকা খ...চ করিয়া বড় ভ্রাতার

বিবাহ দিয়াছেন, নিজের বিবাহেও প্রায় এক হাজার টাকা খরচ হয়। ছোট ভাইটির বিবাহেও নাকি হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহার উপর দুশো একশো ধার দেওয়া অনেককেই আছে। ইহাতে বে-বনিয়াদি হরি চরণ বাবুর টনক্ ত নড়িবেই।—তাঁহার ভ্রাতাদেরও বেশ নড়িয়াছে, মার নড়িয়াছে, তবে আর রাঙ্গা বৌএর কথা বলিতে হইবে কেন?

রাঙ্গা বৌ মাথা বাঁধিতেছেন এমন সময় তথায় শাশুড়ী ঠাকুরাণী আসিয়া বলিলেন, "বলি হ্যাগা, কাণে কি কম শোন?"

রাঙ্গা বৌ ভ্রূকুটী করিলেন, বলিলেন "বালাই, আমি কেন কম শুন্‌বো, তুমি শোন।"

"ডেকে ডেকে যে গলা চিরে গেল।"

বৌমা মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন "ডাক কেন?"

"ঝক্‌মারি!"

"দু-শোবার।"

"কাপড় চোপড় কাচ্‌বেনা কি? সব্বাই যে সেরে এল?"

"সে খোঁজ তোমার কেন?"

"সেহ তেবাস্তর পুকুরে একলা যাবে কি?"

"যাই না যাই সে ভাবনা কেন?"

"যতক্ষণ আছ ভাব্‌তে হয়।"

"আমার ভাবনা কাকেও ভাব্‌তে হবে না।"

"এই কথা, তা বেশ।"

এই বলিয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণী রাগ করিয়া হাত দুলাইতে দুলাইতে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। আর বৌকে বেয়াড়া আদর দেওয়ার জন্য পুত্রকেও মনে মনে পাঁচ কথা বলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ময়রা সই।

রাঙ্গা বৌএর চুল বাঁধা শেষ হইলে, গামছার একপ্রান্তে দুইটী অঙ্গুলি দিয়া সর্ব্বাঙ্গের ময়লা উত্তম করিয়া পরিষ্কার করিলেন। সেই ঘর্ষণে মুখ

বুক লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু তবু মন উঠেনা। দর্পণে একবার নিচেকার ঠোঁট্‌টি উল্টাইয়া দেখিলেন, বেশ রাঙ্গা হইয়াছে। তখন দর্পণে আর একবার আপনার মুখটি ভাল করিয়া দেখিলেন, চক্ষু যেন ঢলিয়া পড়িল, সে ভঙ্গি বড় বিষম, দর্পণের প্রাণ থাকিলে বুঝিতাম দর্পণ ভস্ম হয় কিনা! তাহার পর গ্রীবাদেশ ঈষৎ বাঁকাইয়া সেই সঙ্গে বক্ষের স্ফীতিসহ শ্রীঅঙ্গের বঙ্কিম ভাব কি রূপ প্রতিফলিত হয দেখিয়া রাঙ্গা বৌ প্রকৃতই আবেগে যেন ঢলিয়া পড়িলেন। তখন অঞ্চল কোণে চাবি সুদ্ধ রিং ঝুলিল, স্কন্ধে তোয়ালে পড়িল, তাহার উপর অর্দ্ধ ঘোমটাবেড়া অঞ্চল বাম স্কন্ধে স্থান পাইল। রাঙ্গা বৌ কোমরে সোনার গোট ঝুলাইয়া, হাতে ডায়মণ্ডকাটা তাবিজ, বালা ও অনন্ত পরিয়া, গলায় হার, কাণে ইহুদি মাকড়ী এবং চরণ-যুগলে ছ-গাছা মলের বাহার দিয়া বড় যাকে বলিলেন——

"দিদির ও সব শেষ নাকি?"

"আরও, বেলা আর নেই, তবু অনেকক্ষণ তোমার জন্যে ছিলাম!"

"তা থাক্‌বে কেন ভাই—আমি কেবল দুদিনের জন্যে বৈ ত নয়?"

"তা বল্‌বে বই কি। এখন দাঁড়াতে যেতে হয় ত বল।"

"আমার ময়রা সই বেঁচে থাক, সঙ্গীর ভাব্‌না কি?"

এই বলিয়া রাঙ্গা বৌ ধীর পাদবিক্ষেপে পথের দুধারের লোকের চিত্তাকর্ষণ করিয়া ঝম্‌ঝম্ করিয়া চলিলেন।

গ্রামের নাম নিতাইপুর, হুগলী জেলার এক প্রান্তে অবস্থিত। নিতাই-পুরের আবার একপ্রান্তে কামারপুকুর; সেই কামারপুকুরে রাঙ্গা বৌ প্রত্যহ কাপড় কাচেন। গ্রামের অপরাপর কুলকামিনীরা ততদূর যাইতে নারাজ, সেটী একে নির্জ্জনস্থান, তায় গ্রামের একপ্রান্তে, তাই সেখানে সকলে যায় না। কিন্তু পুষ্করণীটীর জল বড় পরিষ্কার, কাঁকুরে মাটী, আসে পাশে পানিফলের গাছ, আবার মাঝে মাঝে দুই একটী রক্তকম্বল ফুটিয়া সেই কাল জলের বড়ই শোভা সম্পাদন করে, সেই বড় বড় পাতা গুলি কেমন সলিলের মৃদুহিল্লোলে নাচিতে থাকে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সেটী ফাল্গুন মাসের শেষ। বস-ন্তের বিপুল রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে। বৃক্ষ সকল নূতন বেশ ধারণ করি-তেছে কিন্তু তখনও উলঙ্গ ভাবের কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়।

রাঙ্গা বৌ, ময়রা সইএর বাটী হইতে তাহাকে ডাকিলেন। সই প্রকৃতই

অপেক্ষায় ছিলেন। ময়রা বৌএর নাম গৌরী,—গৌরী রাঙ্গা বৌএর সমবয়সী দেখিতেও বড় সুন্দরী।—ময়রা সই গ্রামের খাটী বৌ, সুতরাং ঘোমটার ভিতর হইতে অমনি ধীরে, তারই মধ্যে রঙ্গ ভরে, তারই মধ্যে ঢং করিয়া, চক্ষু দুটী ঈষৎ কাঁপাইয়া বলিলেন "বলি সই নাকি?"

রা। বলি তাই ত।

কতক দূর যাইয়া ময়রা সই দুইবার নিশ্বাস টানিয়া কিসের আঘ্রাণ লইয়া বলিলেন "হাঁ ভাই সত্তি বলনা তোমার গায়ে কিসের খোস্‌বায় বেরোয়?"

রাঙ্গা বৌ হাসিয়া বলিলেন "বকুল ফুল বেটে মাখি"।

গৌরী। দূর—ও যে কেমন মিঠে গোলাপী গন্ধ!

রা। তবে গোলাপী আতরের।

গৌরী। মাগো, আতরে মাথা ধরে যায়—এ যে কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কি এক রকম গন্ধ। আঃ—আমার বড় ভাল লাগ্‌চে।

রা। সত্তি বল্‌বো কিসের গন্ধ?

গৌরী। বলনা সই।

রা। রতি পতি রতির জন্য ইন্দ্রের নন্দন-কানন থেকে রাত্রে একটী ফুটন্ত পারিজাত চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তারি একটী পাপ্‌ড়ী কুড়িয়ে পেয়েছি। সেটী ভাল ৮ টাকা বোত্‌লের ফুলেল তেলে ফেল্‌লিই এই গন্ধ হয়।

গৌরী। আবার ঠাট্টা!

রাঙ্গা বৌ হাসিয়া কহিলেন "পাড়াগেঁয়ে মেয়ে হওয়া বড় পাপ, তোরা কিছু জানিস্ নে। এ একটা তেলের গন্ধ—একে "জবাকুসুম তৈল বলে। দেশের রাজা রাজ্‌ড়া যত বড় লোকে এই তেল মাখেন। এতে চুল বাড়ে, মাথা ঠাণ্ডা হয়, গা হাত জ্বালা যায়, মনে স্ফূর্ত্তি হয়, টাক-মরামাস থাকে না। মাথার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ কি যেন এক মধুর সুখাস্বাদনে বিভোর হয়।

গৌরী। সে সব হোগ্ আর না হোগ্, গন্ধেই যে প্রাণটা কেমন করে ওঠে। মাখ্‌তে ইচ্ছে হয়।

রা। লোকে বাবু গিরিই বলুগ, আর যাই বলুগ্, আমার ত "জবা কুসুম" ভিন্ন চলে না। আগে রোল্যাণ্ডের ম্যাকেসার ট্যাকেসার মাখ্‌তাম,

এখন সে সব ছেড়েছি। "জবা কুসুমের" কাছে সে সব লাগে না। এ তেল দামেও সস্তা, জিনিসও ভাল, বল্‌তে কি "জবাকুসুম" যেন আমার প্রাণের সঙ্গে কথা কয়, তেমনটী আর কোন তেলে হয় নি।

গৌরী। কত দাম ভাই?

রাঙ্গা বৌ অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া বলিলেন "এম্‌নি ছোট ছোট শিশি টাকা করে।"

গৌরী। তবে আর আমাদের মাথা চলে না।

রা। কাল মাথা বাঁধ্‌বার সময় আমার কাছে যাস্‌, বেশ করে মেখে আস্‌বি।

গৌরী। আমি সব কাজ ফেলে আগে যাব।

রা। যাস্‌, দেখিস্‌ তেল মাখার কি গুণ, কাল নূতন করে আদরের ঘটাটা দেখিস্‌।

ময়রা বৌ মুচকে মধুর হাসিলেন, কিন্তু আর কোন কথা কহিলেন না। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা গ্রাম ছাড়াইলেন, তখন উভয়ের ঘোম্‌টা ঘুচিল, দিব্য খোঁপা বাহির হইল। রাঙ্গা বৌএর খোঁপায় সোনার ফুল বিকাশ পাইল। তখন উভয়ে উভয়ের গলা ধরিলেন, উভয়ে সেই নীল আকাশ পানে চাহিয়া, বিদায় পর সূর্য্যের অস্তদিকে চাহিয়া—সেই ম্লান মুখ চন্দ্রের প্রতি তাকাইয়া গজেন্দ্রগমনে চলিলেন, কিন্তু রাঙ্গা বৌ প্রকৃতির সে বিপুল শোভা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, গাহিলেন—

চাঁদের পানে চাইতে নারি বুকের বসন বায় খসে,
কসি খুলে গড়িয়ে পড়ে পরাণ ভরা আবেশে।

গৌরী। দূর ছুড়ী করিস্‌ কি?

রা। কি আর করলাম্‌।

গৌরী। কেউ শুনতে পাগ।

রা। "তা পেলেই বা" "বলিয়া খল্‌ খল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

গৌরী। মাইরি ভাই, তুই পাগল।

রা। মাইরি ভাই—তা না হলে আমা হেন সোনার চাঁদের ভাগ্যে কালাচাঁদ!

গৌরী। সোয়ামীর আবার রাঙ্গা কাল কিলা?

রা। নে লো নে, যার হয় সেই জানে। তুই যদি লেখা পড়া

জানতিস্ তা হলে বুঝ্তিস্ জগৎ সিং কেমন, প্রতাপ কেমন, আর আমার সে কাল মাণিক কেমন।

গৌরী। দুর পাপীষ্ঠী বাম্‌নী, তোর মুখ দেখ্তে নেই। ঐ জন্যেই ত বলি মেয়ে মানুষকে লেখা পড়া শেখাতে নেই।

রা। আর সে কাল নেই, শেখা দূরের কথা, এখন শেখাই। একজামিন জানিস্, তাই করি। বুড় বুড় ছোঁড়ারা আমাদের কাছে ঘাড় হেঁট করে পাশ দেয়।

গৌরী। সে আবার কি?

রা। তুই তার কি বুঝ্‌বি, আমরা দিন কতক পরে উকিল হব, হাকিম হব। আমাদের একজন এরই মধ্যে উকিল হবার চেষ্টা কর্‌চেন।

গৌরী বিস্মিতা হইয়া বলিলেন "বলিস্ কি লো?"

রা। ঠিক বল্‌চি। আর কি সে দিন আছে? ঈশ্বর গুপ্ত বলেছিলেন—

"আর কি এরা তেমন করে সাঁজ সেঁজুতির ব্রত নেবে,
আর কি এরা তেমন করে পিঁড়ি পেতে অন্ন দেবে,
আর কিছুদিন থাক্‌লে বেচেঁ সবাই দেখ্‌তে পাবেই পাবে,
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগি গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"

আজ তিনি বেঁচে থাক্‌লে দেখ্‌তেন তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয়েছে। আমরা সত্তিই গাড়ি হাঁকাচ্চি।

গৌরী। এত বাড় ভাল নয়—এর পর টের পাবে।

রাঙ্গা বৌ হাসিয়া কহিলেন "সে যা'হয় হবে, এখানে আর কেউ নেই গান শোন্।"

এই বলিয়া গাহিলেন:—

চাঁদের পানে চাইতে নারি বুকের বসন যায় খসে,
কসি খুলে গড়িয়ে পড়ে পরাণ পোরা আবেশে।
কমলকলি হয় ব্যাকুলি, আমার প্রাণের ভ্রমর কই আসে,
মিছার জীবন কি ছার হবে শুধু তার আশার আশে।

গৌরী। কার আশার আশে এত?

রা। কপালে থাকে ত দেখ্‌বি।

গৌরী। পোড়া কপাল দেখার।

রা। তবে তাই পুড়ুক।

এই বলিতে বলিতে উভয়ে সেই কামার পুকুরের নির্ম্মল সলিলে অবতরণ করিলেন। পুকুরটীকে একটী দিঘি বলা না গেলেও ছোট নয়; পূর্ব্বে কোন্ কামার ইহা কাটাইয়া ছিলেন তাহা কেহ বলিতে পারে না কিন্তু আজ পঞ্চাশ বৎসর পুষ্করিণীটী তাহাদের অধিকার চ্যুত হইলেও নামে সেই কামার পুকুরই আছে।

পুকুরটীর পাড় খুব উচ্চ। তাহাব উপর অনেক গুলি তাল গাছ। কোথাও গাছ বর্ত্তমান, কোথাও গাছ কাটা গোড়া বর্ত্তমান, দুই একটী বৃহদাকাবের তিন্তিড়ি বৃক্ষও আছে। ঘাটের পশ্চিমে একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ। বৃক্ষে বানরের পাল সেই কচি কচি পাতা খাইতেছে। অতি ছোট কাল কাল ছানা গুলি এক একবার মাতার ক্রোড়ে যাইয়া লুকাইতেছে, আবার এক একবার অল্প অল্প লম্ফ দিয়া আপন আপন পারদর্শিতা পরীক্ষা করিতেছে। একটী উচ্চ শাখায় একটী বীর পা দুখানি একটী শাখায় স্থাপিত করিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছে এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বানর সম্প্রদায়ে আপন উচ্চাসন উচ্চাধিকারিত্বের পরিচয় দিতেছে। ডারউইন বানর যে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ তাহা এক প্রকার স্থির করিয়াছেন, তাই কি সময় সময় বানর প্রকৃতি মনুষ্য মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জল-ক্রীড়া।

যুবতীদ্বয় যখন জলে নামিলেন তখন আর বেলা নাই, দক্ষিণ দিক দিয়া ঝুর্ ঝুর্ করিয়া মৃদু মন্দ সমীরণ বহিতেছে, সেই সমীরণে সলিল রাশি অল্প অল্প শিহরাইতেছে।—তর তর, থর থর করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিরাজি সলিল সঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে। আকাশের চাঁদ সেই জলে যেন মৃদু মন্দ কাঁপিতে ছিলেন, এমন সময় যুবতীদ্বয় সেই জল মধ্যে অবগাহন করিলেন, জল কাঁপিয়া উঠিল, চাঁদ নাচিয়া উঠিল, রাঙ্গা বৌ বলিলেন "দেখ্ লো দেখ পোড়ার মুখো চাঁদ নাচ্‌চে।"

গৌরী। তোকে ধর্‌বে।

রা। তা হলে ত বাঁচি।

গৌরী। ধরা দিবি ত?

রা। দিয়েই আছি তা দেব কি?

তখন বক্ষের বসন চ্যুত হইল, অঙ্গ মার্জ্জনা আরম্ভ হইল, অঙ্গ সঞ্চালনে সলিল সঞ্চালিত হইয়া সেই কোমল বুকেই প্রতিঘাত হইতে লাগিল। সেই মৃদু তরঙ্গে দুইটী সুকুমার দেহ মৃদু কম্পিত হইল। তখন রাঙ্গা বৌ একবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বুকের জল লাফ দিল, গড়াইল না। দৃশ্য লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল না। রাঙ্গা বৌ মনে মনে হাসিয়া বলিলেন "সবাই সমান।"

তখন রাঙ্গা বৌ বলিলেন "সই একটা গান কর না?

গৌরী। আর কেউ যদি শোনে।

রা। এখানে আবার আস্‌বে কে?

গৌরী। যদি আসে তা হলে যে ঘেন্নায় মরে যাব।

রা। তোর গলাটী মিষ্টি বলেই এত করে বল্‌চি।

গৌরী। আমি ময়রার বৌ—দিন রাত গুড় খাই, আমার গলা মিঠে হবে না ত কি তোর আলচাল খেকো গলা মিষ্টি হবে।

রা। তাই ত বল্‌চি।

গৌরী। বল্‌লে কি হয়, কাযে যে হবে না।

রা। না হয় না হবে, আমিই গাই।

এই বলিয়া রাঙ্গা বৌ আবার গাহিলেন—

রসিক সুজন মনের মতন, পেলে কি আর কারেও ডরি,
আপনি ভুলে আপন কথা মন প্রাণ সব স'প্‌তে পারি,
সরম করম নারীর ভূষণ, বলা সুধু দাগাদারি।
সুধাকরে দেখলো বেড়ে উঠ্‌তেছে ঐ তারার সারি।

গাইতে গাইতে সেই জল মধ্যেই রাঙ্গা বৌএর বিপুল নিতম্ব রঙ্গভরে নাচিয়া উঠিল।

গৌরী বলিল "মরণ কবিস কি?"

রাঙ্গা বৌ হাসিয়া কহিলেন "কর্‌বো আর কি, একটু নাচ্‌চি।"

গৌরী। কেউ দেখ্‌লে বল্‌বে কি?

রা। বল্‌বে রাঙ্গা বৌ পাগল হয়েছে।

গৌরী। তোর লজ্জা হবে না।

রা। লজ্জা কি তা জানিনে। লজ্জা কর্‌বার মত লোক কখন পাইনি। লজ্জা বোঝে এমন লোক পাই ত লজ্জা করি।

গৌরী। আমরা ত পুরুষ দেখ্‌লেই লজ্জায় মরি।

রা। তাদের পনের আনা ত জানোয়ার, জানোয়ার দেখে আবার লজ্জা কর্‌তে হবে?

গৌরী। যা ইচ্ছা করো।

রা। তাই হবে এখন শোন শোন।

গৌরী। না আর কাজ নেই।

রা। এবার ভাল গান গাব।

গৌরী। তবে একটা শ্যামা বিষয় গাও।

রা। তাই গাচ্চি।

রাঙ্গা বৌ এই বলিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া গাহিল;—

এবার তারা তোমায় খাব, খাব আর বগল বাজাব,
মদের বোতল কেড়ে নিয়ে প্রাণটা পূরে পান করিব।
নেসার ঝোঁকে এঁকে বেঁকে (কত) কাঁটা খোঁচায় আছাড় খাব,
(তোমার) দিগম্বরে কেড়ে নিয়ে, আপনি দিগম্বরী হবো।
দানা দৈত্য তাড়িয়ে দিয়ে, কসে গাঁজায় দম্ মারিব।
নেসায় হলে দিশে হারা, আর কিছু না দেখ্‌তে পাব,
(তখন) আপন ভাবে বিভোর হয়ে এই কাল জলে ডুব পাড়িব।

গৌরী। তোমার সকলি অদ্ভুত।

রা। সেটা কি আজ জান্‌লে?

গৌরী। না রোজই জান্‌চি।

রা। তবে তুমি আমার সই হবার যোগ্য নও।

গৌরী। কেন?

রা। আমি এক আঁচড়ে জান্‌তে পারি।

গৌরী। তত বিদ্যে আমার নেই।

রা। ঐ ত জ্বালা।

এমন সময় দূরে একটী মনুষ্য মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গেল। কোন ভদ্র বেশধারী যুবক যেন সেই দিকে আসিতেছেন বলিয়া বোধ হইল। কার্য্যেও

প্রকৃত তাহাই হইল। যুবকটীর বয়স আন্দাজ কুড়ি বৎসর, দিব্য বেশ ভূষা। যুবক যুবতীদ্বয়ের সম্মুখের ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গৌরী শশব্যস্তে মাথার কাপড় টানিল, কিন্তু রাঙ্গা বৌএর ভ্রূক্ষেপ নাই। মুখভরা হাসি—চক্ষু উছলিয়া বাহির হইতেছে বুক পোরা আনন্দ—বুকের ভিতর তুফান খেলাইতেছে, হৃদয় পোরা প্রেম—সর্ব্ব অঙ্গ কেমন করিয়া দিতেছে।

গৌরী মৃদুস্বরে বলিলেন "আয় সই পালাই।"

রা। যাব ত, কাপড় যে খুঁজে পাইনে।

গৌরী। সে কিলো ?

রা। মাইরি ভাই।

গৌরী। এ লোকটা বড় বেহায়া ত।

রাঙ্গা বৌ বলিলেন "তাই বটে।" তখন যুবকটীকে বলিলেন "তোমার কি চোক নাই, দেখ্‌চ না গেরস্তর বৌ-ঝি কাপড় কাচ্‌চে।

যুবক নিরুত্তর।

রা। আ মরণ কথা কয় না যে লো।

গৌরী। করিস্ কি ?

রা। বলি ও পোড়ার মুখ, এখানে কেন ?

যুবক নিরুত্তর।

তখন রাঙ্গা বৌ বলিলেন "ভাই এ ভূত নাকি ?"

গৌরী অমনি জল হইতে উঠিয়াই "রাম রাম" বলিতে বলিতে ছুটিল। রাঙ্গা বৌ বলিল "আমায় ভূতের হাতে একলা ফেলে যাস্‌নে, আমার মাথা খাস্।"

গৌরী আর সে কথায় কাণ দিল না। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

রাঙ্গা বৌ তখন বুকের কাপড় হাতে করিয়া জল হইতে উঠিয়া সেই ভূতের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল "এখানে কোথা থেকে ?"

যুবক। ছুটি নিয়ে।

রা। কেন এলে ?

যুবক। তোমায় দেখ্‌তে।

রা। আমি কি জন্মের মত এইচি নাকি ?

যুবক। একদিন আমার যে যুগ বলে মনে হয়।

রা। মাইরি এত্ত জান। পুরুষদের কথার ছটাটা খুব আছে।

যুবক একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "যা ইচ্ছা বল।"

রা। এই ত দেখা হল, এখন যাও।

"তোমার মাথায় হাত দিয়ে বল্‌চি আমি গেলাম, আমায় বাঁচাও। আমি একদণ্ড তোমায় না দেখ্‌লে বাঁচিব না।"

যুবক এই বলিয়া যুবতীর অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়া তাহাকে আপন ভুজ পাশে আবদ্ধ করিলেন। জলে জামা ভিজিল, কোঁচার কাপড় সিক্ত হইল। নয়ন ধারা রাঙ্গা বৌএর গণ্ডস্থল ভিজাইল।

রা। তুমি পাগল।

যুবক। ছিলাম না, তুমি করেছ।

রা। এখানে আসা কি ভাল হয়েছে ?

যুবক। কি কর্‌ব, থাক্‌তে পার্‌লাম না যে।

রা। তুমি নিজেও মজ্‌বে, আর আমাকেও মজাবে।

যুবক। আমার আর মজ্‌তে বাকি কি।

রা। এখন কি কর্‌তে বল ?

যুবক। আমার হও।

রাঙ্গা বৌ তখন ভুবন ভুলানি চক্ষে সেই চন্দ্রালোক সাহায্যে একটী কটাক্ষ হানিয়া বলিলেন "তোমারই ত আছি।"

যুবক। একেবারে আমার হও।

রা। কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে ?

যুবক। হলেই বা।

রা। তুমি ত রাইটার বাবু, ৮৲ টাকার চাকুরে। আপনি কি খাবে, আর আমাকেই বা কি খাওয়াবে ?

যুবক। মাসে ত ২৫।৩০৲ টাকা পাই, তাতে এক রকম কষ্টে স্বষ্টে চল্‌বে।

রা। সখের প্রেমে কষ্ট কর্‌বো কেন ?

যুবক। তবে কি হবে ?

রা। এখান থেকে এখনি যাও,—সেখানে যেমন গোপনে দেখা হয় তেমনি হবে।

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে বলিল "বৌ তোমার এই কাজ ?"

যুবক যুবতীকে ছাড়িয়া দৌড় দিলেন, যুবতী বুকে মাথায় কাপড় দিয়া বলিলেন "কে ঠাকুর পো ?"

ঠা। তুমি আমার মাথা কাট্‌লে, কুলে কালি দিলে ও শালা কে? কোথা গেল, ওর মাথাটা কাট্‌বো না।

রাঙ্গা বৌ হাসিয়া বলিলেন "বীর বটে, এতক্ষণ কাট্‌তে পারনি। তুমি আবার পুরুষ, বল্‌তে লজ্জা হয় না। ওযে রাস্তায় আমার পথ আগ্‌লালে তার কথা নেই—ওকে মার ধোর নেই—আমাকে বলা হচ্ছে কুল মজালে। তোমরা যাই কুলাঙ্গার তাই এমন কথা, তোমার দাদা আসুক তখন এর বিচার হবে।

ঠা। এখন তা বল্‌বে বই কি, তুমি যে ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে কথা কচ্ছিলে?

রা। ছুঁচো কোথাকার—যত বড় মুখ তত বড় কথা, কি কথা কইচি বল্‌তো?

ঠা। তা শুনিনি।

রা। আমি বলবোনা, পাপাত্মা আমায় ছেড়েদে, আমি বল্‌বো না আমি ব্রাহ্মণকন্যা আমার অঙ্গস্পর্শ কর্‌লে তোব সর্ব্বনাশ হবে।

ঠাকুর-পো অপ্রতিভ হইলেন, রাঙ্গা বৌ তখন কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন "আজ মাকে গিয়ে এই সব কথা বলিতো, দেখি তিনি এর কি বিচার করেন! তার মাথাটা কাট্‌তে পার্‌লে না, আর আমি অবলা তোমাদের আশ্রয়ে আছি, তাই আমার উপর চোট।"

রাঙ্গা-বৌ এইবার সত্য সত্যই চক্ষের জল মুছিলেন।

ঠাকুর পো অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "বউ মাপ্‌ কর।"

রা। মাপ্‌ টাপ্‌ জানিনে, আমায় আজই তাঁর কাছে পাঠিয়ে দাও।

ঠা। রাগ করলে বৌ দিদি?

রাঙ্গা বৌ ঘাড়টী অবনত করিয়া বলিলেন "রাগ আর কি, দুঃখ ত হয়।"

ঠা। আমি অন্যায় কবেছি,—আমি না বুঝে তোমায় পাঁচ কথা বলেছি।

রা। মুখের কথা আর হাতের ঢিল সাবধান হয়ে ছাড়্‌তে হয়।

ঠা। এইবার শিখ্‌লাম।

রা। তুমি এখানে কি কর্‌তে এসেছিলে?

ঠা। তোমার দেরি দেখে মা পাঠিয়ে দিলেন।

রা। গিয়ে কি বল্‌বে?

ঠা। তুমি আসছিলে পথে দেখা হলো।

রাঙ্গা বৌ মনে মনে হাসিয়া আর কোন কথা না কহিয়া চলিলেন। ঠাকুর পো বলিলেন "এ কথা আর প্রকাশ কর না, আমার মাথা খাও, মা কি দাদা শুন্‌লে আমার মুখ দেখান দায় হবে।"

রাঙ্গা বৌ কৃত্রিম কোপ সহ বলিলেন "তাই হওয়াই ভাল।"

ঠা। বৌদিদি—দেখ আর কখন এমন হবে না।

তখন রাঙ্গা বৌ বলিলেন "যখন অত বল্‌চ তখন আর কি কর্‌বো।"

ঠাকুর পো আশ্বস্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পুত্র-স্নেহ।

মধ্যাহ্ন সময়ে রাঙ্গা বৌ একটী কক্ষ মধ্যে অর্গল বদ্ধ করিয়া আপনার শিশু সন্তান সতীশকে ঘুম পাড়াইতে ছিলেন। বালক ঘুমায় না, কেবল এ কথা আর সে কথা, ইচ্ছা ঘরের দ্বার খুলিয়া বাহিরে যাইয়া দৌড়াদৌড়ী করে, কিন্তু মা তাহাতে অসম্মতা।

বালক কখন বালিসকে ঘোড়া করিয়া তাহাতে চাপিতেছে, কখন পাখা খুঁজিতেছে, কখন রাঙ্গা বৌএর হাসিমাখা মুখ খানি ধরিয়া টানিতেছে, তাঁহাকে ঘুমাইতে দিবে না, ইহাই ইচ্ছা। রাঙ্গা বৌ দেখিলেন বালক ঘুমাইতে দিবেনা, তখন তাহাকে কৌশলে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিলেন।

বলিলেন "লক্ষ্মী বাপ আমার ঘুমাও ত।"

"না—মা—আ—"

রা। খেল্‌না কিনে দেবো, ঘুমোও ত।

স। তি দিবি?

রা। কত কি দেবো।

তখন বালক মাতার হাতটী লইয়া আপন গালে স্থাপিত করিয়া "আ—আ—" করিতে লাগিল। মা বালকের মনের কথা বুঝিয়া তাহার গাল চাপড়াইয়া সুর করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি ঘুমের বাড়ী যেও,
বাটা ভরে দিব পান গাল ভরে খেও।"

ক্রমে মাতৃমন পুত্রস্নেহে উথলিল, তিনি সস্নেহে বলিতে লাগিলেন—

"কে দিল এ কুসুমের কমনীয় গাল,
কে দিল এ চাঁদ ভাঙ্গা অধরোষ্ঠ লাল।
কে দিল এ মেঘ ভাঙ্গা ঘন কৃষ্ণ চুল,
কে দিল এ চাঁদ মুখ চারু-চাঁপা-ফুল।
কে দিল এ আলোকরা চাঁদনীর হাস,
কে দিল এ আধ আধ কোকিলের ভাষ।
কে দিল এ মন্দাকিনী নয়নের কোণে,
কে দিল এ সরলতা সতীশের প্রাণে।
চোখে জল মুখে হাসি কে আঁকিল ছবি,
আঁধার ঘরের এই প্রভাময় রবি।"

ক্রমে বালক ঘুমাইল, জননী এটা সেটা পাঁচ কথা ভাবিয়া ঘুমাইবেন, চক্ষু জড়াইয়া আসিতেছে, এমন সময় ঝি ডাকিল "বৌ দিদি।"

রাঙ্গা বৌ চুপ করিয়া রহিলেন।

ঝি আবার বলিল "ঘুমুলে গা?"

রাঙ্গা বৌ চটিলেন, বলিলেন—"কেন্‌লা পোড়ারমুখী।"

ঝি। ডাকওয়ালা তোমায় একটা চিঠি দিয়ে গেল।

রাঙ্গা বৌ বিরক্ত ভাবে উঠিয়া দরজাটী খুলিয়া পত্রখানি লইলেন, দেখিলেন শ্রীহস্তের লেখা—বালিশের নীচে রাখিয়া দিয়া শয়ন করিলেন কিন্তু ঘুম আসিল না, তখন অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন —তাহা এইরূপ—

সতীশের মা!

যে হেতু কাল নিশিতে শুইবার কালে একখানি পত্র পাইলাম তাহাতে তোমার অন্যায় কথা লেখা আছে। বিশ্বাসও হয় অবিশ্বাসও হয়, তাই পাঠাইলাম ব্যাওরা লিখিবেক। অন্যথা না হয়। যেহেতু আমার মন বড় খারাপ হইয়াছে রাগও হইতেছে।

বেনামি পত্র খানা অত্র সহ গাঁথিয়া দিলাম ওয়াকিব হাল হইয়া উত্তর দিবা। বেশী আর কি লিখিব. তোমায় দেখবার জন্য চিত্ত চাঞ্চল্য

ভাব স্মরণ করেছে। ইতি সন ১৩০৬ সাল ২৪শে ফাল্গুন রাত্রি ৯-৩৫ পি, এম।

নিঃ—

শ্রীহরিচরণ।

পত্র পড়িয়া যুবতী মুখ খানা বাঁকাইয়া বলিলেন "যেহেতু ভূতে তোমার ঘাড় বাঁকাইয়াছে—তাই তোমার মতি ভ্রম হইয়াছে—ভেয়ের দাদা ত তুমি। আ মরি রাগ ত কত—চিত্ত চাঞ্চল্য ভাবেই সব প্রকাশ হয়েছে—আমার বড় পোড়া কপাল, ছি ছি! পত্র দেখ, পড়লে ন্যাকার আসে। যেমন বেহায়া তেমনি বুদ্ধি, তেমনি সঙ্গ, তেমনি কথাবার্ত্তা। মানুষের একটা সভ্য থাকে, এ পোড়া কপালের কিছুই নেই।—না কথা কইতে জানে, না বস্‌তে জানে, না আদর যত্ন জানে, তবে জানে কি? জানে কেবল ঘুম নিতে, আর মদ খেতে আর—"এই বলিয়া কি বলিতে বলিতে বলিলেন না। তাহার পর সেই সুন্দর নাসিকাটী কুঞ্চিত করিয়া মুখটী অল্প বাঁকাইয়া আবার বলিলেন "ওর মাথা মুণ্ড বেনামী চিঠিটে কি—

প্রণামা শতকোটী নিবেদন মিদং—

লেখা উচিত নয়, তথাপি না লিখিয়াও থাকিতে পারিলাম না, কিছু মনে করিবেন না। আপনার স্ত্রীর রাইটার কং বিনোদবিহারী কর্ম্মকারের সঙ্গে প্রসক্তি আছে। আমরা ঠিক জানি, ছুটী লইয়া উক্ত বিনোদবিহারী স্বদেশ না গিয়া নিতাইপুর গিয়াছে, সত্য মিথ্যা অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন। নিবেদন ইতি

শ্রীঃ —

পত্রখানি পড়িয়া বলিলেন আ মলো এযে রাম না হতেই রামায়ণ। তখন ক্ষণেক কি চিন্তা করিয়া বলিলেন "এ কার কাজ? আমার কথায় লোকে থাকে কেন? তবে কি বিনোদ এ কথা কারও কাছে প্রকাশ করেছে? তাই নিশ্চয়, নইলে লোক জানাজানির কোন কারণ নেই। তবে ত সে আমায় ভাল বাসেনা। ভালবাস্‌লে এ কথা বন্ধু বান্ধবদের কাছে প্রকাশ কর্‌তো না—আচ্ছা এই শেষ।" আবার কি ভাবিয়া বলিলেন "ভালবাসা ছায়াবাজি—ওটা আবার কি? চাই প্রাণের পরিতোষ। যেখানে যাতনা, যেখানে অশান্তি, সেখানে আবার সুখ কোথায়? গাছের পাতা শোভার জন্য, একটা পাতা ছিঁড়্‌লে কি গাছ মরে? আমার প্রাণের একটা পরদা ছিঁড়ে গেল, যাগ,

তায় দুঃখ কি তাতে ত আর প্রাণে মর্‌বো না।" রাঙ্গা বৌ তখন কাগজ কলম লইয়া একখানি পত্র লিখিলেন তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

জীবন সর্ব্বস্ব!—

মনে করিতেছি আজ কাপড় কাচিতে যাইয়া কামার পুকুরের কাল জলে ডুবিয়া মরিব। আর কেন, যখন আমি তোমার কোমল হৃদয় হইতেও বিশ্বাস হারাইয়াছি তখন আর এ ছার জীবন কেন? মরিতে পারি, মরিতাম—নিশ্চয় মরিতাম,—কিন্তু মরা হইল না, আমার ঘুমন্ত সতীশের চাঁদ মুখ দেখিয়া মরিতে পারিলাম না। যাহার বদনপ্রান্তে তোমার কম-কান্তির জীবন্ত প্রতিকৃতি উছলিয়া উঠিতেছে, সে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক সোনার চাঁদকে মা হারা করিতে প্রাণ চায়না, তাই মরিতে পারিলাম না, আর মরিতে পারিলাম না তুমি কাছে নাই বলিয়া, যে রূপ দেখিতে আমার চক্ষু পলকহীন হয়,—যে বদনসরোজ মনে হয় কোন স্বর্গীয় প্রভায় প্রভান্বিত—যে মধুর কথা আমার কাণে অমৃত বর্ষণ করে, সে সকল আমি কাঙ্গালিনী হইয়া কেমন করিয়া ছাড়িয়া যাইব? এখনও আমার হৃদয়ের আশা মিটে নাই, তোমাকে দেখার পিপাসা পরিতৃপ্ত হয় নাই, আমার তৃষিত প্রাণ শান্তি পায় নাই, আমার এই অসম্পূর্ণ প্রাণ লইয়া মরি কেমন করিয়া? কিন্তু আবার বলি আমার মরণই মঙ্গল। আমার সে নয়নের তারা, নিদ্রার স্বপ্ন, হৃদয়ের আকিঞ্চন, আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি তার মুখে এই কথা? ছি, এ প্রাণ কি রাখিতে আছে, ঈশ্বর কবে আমার জীবনের শেষ করিবেন। আমি জগৎময় যেরূপ দেখি তাহার মুখে এই কঠোর—বজ্রাদপি কঠোর বাক্য! তাই বলি এ প্রাণ কি আর রাখিতে আছে?

আর তোমায় অধিক কি বলিব তুমি বুদ্ধিমান, সুচতুর, রসিক, স্নেহ-বান্ ও প্রেমময় হইয়া কি করিয়া বিশ্বাস করিলে, কি করিয়া ক্ষণেকের জন্যও মনোমধ্যে স্থান দিলে যে আমি তোমার গৃহিণী হইয়া, ব্রাহ্মণ কন্যা হইয়া সেই অস্পৃশ্য কর্ম্মকারকে স্পর্শ করি! ছি ছি, কি লজ্জা, কি ঘৃণা! দেখিতেছি ভাল বাসিয়া জগতে বিপদে পড়িতে হয়, পরের চক্ষু-শূল হইতে হয়, পাপিষ্ঠ লোকে সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়, অতৃপ্তিতে কুকথা রটনা করে। তুমি তোমার রাজকার্য্যে সে ঘটনার কি ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওনা? আমি অল্পমতী রমণী, কেমন করিয়া সকল কথা তোমার হৃদয়ঙ্গম

করাইব, নাথ! তবে সতীর একটী বস্তু আছে—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে ছিল, এই কলিতেও আছে, সেটী দীর্ঘনিশ্বাস—সেই দীর্ঘনিশ্বাস আজ বহিল; সতীর দীর্ঘনিশ্বাসের, পবিত্রা ব্রাহ্মণ কন্যার দীর্ঘনিশ্বাসের যদি বল থাকে, যদি আমি পতিব্রতা পতিপ্রাণা হই, পতি ভিন্ন অন্যগতি নাই বলিয়া যদি আমার ধারণা থাকে, তবে যে তোমায় এমন মিথ্যা পত্র লিখিয়া মনোকষ্ট দিয়াছে, আমি নিশ্চয় বলিতেছি তাহার সর্ব্বনাশ হইবে।

কবে আবার তোমায় দেখিব, কবে তোমার সুধামুখের কথা আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবে? হা ঈশ্বর সে দিন তুমি কবে দিবে? তোমার হইয়া সতীশের শত শত মুখচুম্বন করিলাম। সে তোমায় ডাকে আর কত কাঁদে, আমি কেবল চক্ষের জল মুছি—আর তাহাকে সান্ত্বনা করি, প্রাণেশ্বর, আর কতকাল আমায় এ প্রবল যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে বলিয়া দাও। তোমা বিহনে যে আমি ত্রিজগৎ অন্ধকার দেখিতেছি।

একান্ত তোমারই
সেই পোড়াকপালী।

পুঃ—

এন্, কে, দাসের দোকানে গিনি সোনার চেনহার ছড়াটা গড়াইতে দিয়াছি, তাহা আর না গড়াইলেই ভাল হয়। আর কেন?—আমি ত তোমার হৃদয়ের বিশ্বাস হারাইয়াছি, আর আমার গহনা কেন?—আমার মাথার দিব্য তাহা আর গড়াইও না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পত্রের পরিণাম।

হাবুয়া থানার সব ইনস্পেকটর হরিচরণ বাবু। সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি হিতবাদীর একখানি উপহার গ্রন্থ পাঠ করিতে ছিলেন। হরিচরণ বাবু দেখিতে লম্বাকৃতি, বয়স আন্দাজ ৪৬।৪৭, মাথার চুল কতক পাকিয়াছে কতক কাঁচা, গোঁপেও পাক ধরিয়াছে। রং কাল, বেশ কাল—তায় জৌলুষ নাই—চক্ষু ছোট এবং কোটর গত, ঠোঁট দুটী পুরু পুরু আর সামনে ঠেলা, দাঁতগুলিও শোভাহীন। তবে গালভরা দাড়ি আছে. কিন্তু তাহাতে কদর্য্যতারই বৃদ্ধি হইয়াছে।

হরিচরণ বাবুর রূপ নাই বলিয়াই কি রাঙ্গা বৌএর মনে ধরেনা? কিন্তু আমরা এ কথা বুঝিতে পারিনা। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে ডেস্‌ডিমোনা ওথেলোকে ভালবাসিতে পারিত না। সঙ্গে সঙ্গে অনেক বাবুকে চক্ষের জলে ভাসিতে হইত কিন্তু তাহাতে হয় না, তবে কেমন করিয়া বলিব রূপ না থাকিলে তাহাকে ভালবাসা চলেনা? তবে পাপিষ্ঠার কথা স্বতন্ত্র রাঙ্গা বৌ সেই পাপিষ্ঠাদের একজন। তাঁহার হৃদয়ে নভেলি নায়কের চিত্র আঁকা, তাহার অতৃপ্তিতে যাতনা। দলনী বেগমের ন্যায় স্বামী প্রেম অনুগ্রহ মাত্র বলিয়া মনে নাই,—কেবল বাসনা, আমি যাহাকে ভালবাসিব—সে আমায় প্রাণ দিয়া ভালবাসিবে, আমা বই অন্য কিছু জানিবেনা, কথাবার্ত্তায় ভালবাসার কথা ছড়াছড়ি যাইবে। বস্তুতঃ রাঙ্গা বৌ যাহা চায় তাহা পায়না, তাই তাহার প্রাণ শূন্যময়। আমরা কাহার দোষ দিব? রাঙ্গা বৌএর না হরিচরণ বাবুর? বস্তুতঃ কাহার দোষে যে সংসারে এইরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন।

দারোগা বাবু একখানি সতরঞ্চি পাড়া তক্তাপোষে দেয়ালে ঠেস্ দিয়া হাঁটু দুটি উচু করিয়া, অঙ্গ অল্প হেলাইয়া পাঠ করিতেছেন। দুই জন রাইটার কন্সটেবল ডায়েরি ও "এফারমের" নকল করিতেছে। এমন সময় হেড্ কন্সটেবল সমসুদ্দীন সাহেব বলিলেন "আর কেন বইটা রাখুন না।"

দারোগা। রাখ্‌চি।

হেড। আর জানেন?

দারোগা। কি?

সমসুদ্দীন সুর করিয়া গাহিল—

"গত নিশি শ্যাম গেছে ফিরে"

দারোগা। কে?

সম। সেই বৈষ্ণবী।

দারোগা। দূর।

হে। মাইরী বাবু—কাল রাত্রে এসে আপনার দরজা ঠেলেছিল।

দারোগা। তা হবে, আমি কাল ত দোয়ার খুলে রাখিনি।

এমন সময় ডাকপিয়ন কতকগুলি সরকারী লেপাফা ও পত্র আনিয়া দিল, তাহার মধ্যে রাঙ্গা বৌএর সেই পত্র আসিয়া উপস্থিত। বাবু এক-

বার দুইবার তিনবার সেই পত্র খানিকে পড়িয়া সমস্নুদ্দিনকে বাহিরে ডাকিয়া বলিলেন "সমস্নুদ্দিন সেই পত্রের উত্তর দেখ।"

সমস্নুদ্দিন পত্র পড়িয়া বলিলেন "তোবা তোবা, তেমন মেয়ে কি আর আছে বাবু—তাঁর উপর সন্দেহ, ছি ছি।

দারোগা বাবু শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন "তাই ত কি অন্যায় করেছি, মেয়ে মানুষ কি করতে কি করে।

সম। আমার কথা শোনেন ত কাল বিলম্ব নয়, আজই বাড়ি গিয়ে তাঁদের নিয়ে আসুন।

দারোগা। যাই কি করে?

সম। ভয় কি আমি ত আছি।

দারোগা। কি জানি যদি কোন সঙ্গীন মোকদ্দমা হয়।

সম। তা ত কত, আর ৩।৪, দিন মধ্যে ত ফিরবেন।

দারোগা। তা ঠিক।

সম। তবে আর বিলম্ব নয়, আজ রাত্রেই যান।

তাহাই ঠিক হইল, সকাল করিয়া আহারের বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া বলিলেন "সে বেনামী পত্র কার লেখা বলে বোধ হয়?"

হে। তা ত এখনও ঠাওরাতে পারি নি।

দারোগা। তবু কি বোঝ?

হে। বোধ হয় মাষ্টার মশাইয়ের।

দারোগা। দু কথা এক হয়েছে—আমারও তাই মনে হয়,—কি পাজি লোক।

হে। তা আর বল্‌তে, ওর মুখ দেখ্‌তে আছে।

দারোগা। এখন জব্দ করা যায় কিসে?

হে। যাতে বলেন, আপনি আজ বল্‌লে কাল ওর নামে একটা যে সে মোকর্দ্দমা রুজু করে একেবারে চালান দি।

দারোগা। সাক্ষী জুট্‌বে?

হে। ঢের, বলুন না, ফাঁসি দিইএ দি।

দারোগা। তুমিও ঠাওরাও, আমিও ঠাওরাই, ফিরে এসে যা হয় করতে হবে। আর দেখ আজ কন্‌ফিডেনসেল লিখে পাঠাই যে মাষ্টার সংবাদ পত্রে লেখে, কংগ্রেসের পক্ষীয় লোক, আর যা মনে আসে। আমি তার

পর ওকে বুঝ্‌চি। বাবা ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ ত দেখনি, এবার ফাঁদ দেখিয়ে দেবো। মরি মরি মন্‌রো সাহেব কি কলই বানিয়ে গেছেন্‌।

সম। তার আর কথা কি। ঐ আমাদের মহাস্ত্র, সাহেবরাও খুব মেহেরবাণী করে সেই সব আবার বিশ্বাস করেন। ভাবেন আমরা বুঝি আল্লার দোস্ত, মিথ্যা কথা কইতে জানিনে। কিন্তু এদিকে যে সব্‌ই বিশমোল্লায় গলদ, তা জানেন না।

হরি। এ সব দয়া-না থাক্‌লে আমাদের চাকরী করা হত না। সাহেব গাল দিক, বকুগ, মারুগ সব ত ঐ সুখেই সই।

সমসুদ্দিন কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। দারোগা বাবু ভাবিতে লাগিলেন কেবল সেই সতীশের মা—তাহার ভালবাসা—তাহার প্রেম, আর নিজের সৌভাগ্য যে তেমন গুণবতী ভার্য্যা পাইয়াছেন। সে তেজস্বিনী ভাষায় লিখিত পত্রখানি হরি বাবু গোপন করিতে পারিলেন না, বন্ধু বান্ধবদিগকে নানা ছলে নানা কৌশলে দেখাইলেন। ইচ্ছা সংবাদ পত্রে ছাপিয়া জগৎ শুদ্ধ লোককে মোহিত করেন। কিন্তু তাহা যে হইবার নয় ইহাই দুঃখ।

হরিচরণ বাবু বাটী গেলেন কিন্তু প্রিয়তমা সঙ্গে আসিলেন না। শরীর ভাল নয়, সতীশ বড় থ্যাৎ থ্যাতে হইয়াছে, হয় ত অসুখ কর্‌বে, এইরূপ নানা কথায় আসা বন্ধ হইল। তবে হরিচরণ বাবু ভাল বাসার চূড়ান্ত দেখিলেন, প্রিয়তমার অগাধ ভালবাসার রসাস্বাদনে বিভোর হইলেন, কিন্তু দুঃখ বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না, একদিন পরেই আবার হারুয়ায় ফিরিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনি পিসী।

এবার চৈত্রের প্রারম্ভেই দোল, বগড়ীর কৃষ্ণরায় দেখিবার জন্য দলে দলে লোক চলিয়াছে।—দারুণ গরম তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই; পুঁটুলি মাথায় কোমর বাঁধা মেয়ের দল এক পা ধুলা করিয়া কোঁচড়ের মুড়ি ও পাকা শশা চিবাইতে চিবাইতে, গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে। রাশি রাশি গরুর

গাড়ি কোনটা মাল লইয়া, কোনটা যাত্রী লইয়া চলিয়াছে। কত বয়াটে ছেলে বাঁয়া বাজাইয়া গান করিতেছে, কেহ বা কোন স্ত্রীলোককে লক্ষ্য করিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেছে, সারা রাত লোকের আর বিরাম নাই।

ছোক্‌রা বাবুদের বেশ-ভূষার কিছু বিশেষত্ব আছে, কোরাকাপড়ের উপর কেহ বা গব্‌নেটের জামা পরিয়াছে, তাহার উপর ধোয়া কালাপেড়ে চাদর, কাহারও পায়ে মোজা, অঙ্গে ইস্ত্রীহীন লম্বাসার্ট হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলিতেছে, তাহার উপর সেই দুরন্ত গ্রীষ্মে চাদনীর তৈয়ারি সার্জ্জের ওয়েষ্ঠ কোর্টও ফ্রক কোর্ট। কোর্টের সমস্ত বোতাম খোলা। ওয়েষ্ট কোর্টের পকেটে একখানি লাল বর্ণের ছিন্ন সিল্কের রুমাল সবটাই প্রায় বাহির হইয়া রহিয়াছে। প্রায় অনেকেরই বেশভূষার পারিপাট্য এইরূপ। যাহার যে ভাল কাপড় খানি, যে ভাল জামাটী আছে, তিনি তাহাই দেখাইবার জন্য ব্যস্ত। এইরূপ অসভ্য শ্রেণীর দর্শকই বেশী।

স্ত্রীলোকদেব দশাও তদ্রূপ। তবে বিধবার ভাগই বেশী বলিয়া তাহাদের বিজাতীয় সৌন্দর্য্য স্পৃহার আর উল্লেখ করিলাম না।

চাঁচরের দিন কৃষ্ণনগর লোকে লোকারণ্য, শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকস্থ আমবাগান লোক ও দোকানে গিস্‌গিস্‌ করিতেছে, শীলাবতীর নিকটস্থ বকুল তলায় অনেক দোকানপাট বসিয়াছে, নিরবে শীলাবতী দক্ষিণ দিক দিয়া প্রবাহিতা।—কৃষ্ণরায় মন্দির হইতে স্রোতস্বিনীর প্রতি যেন স্নেহপূর্ণ সকরুণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন। সেই উল্লাসে যেন সিংহদ্বার হইতে নহবৎ বাজিতেছে "গেলনা কেন প্রাণ।"

আজ অনি পিসীও কৃষ্ণরায়ের ধাম সেই কৃষ্ণনগরে উপস্থিত। তাহার ঠাকুর দেখিতেও আশা বটে আর কাজও আছে। অনি পিসী কড়েরাঁড়ী একাদশ বৎসরে বিধবা হইয়া পর্য্যন্ত পিতৃভবনে প্রতিপালিতা—আজ সে কম দিনের নয়, প্রায় ৩০ বৎসরের কথা। তখন অনি পিসীর মা ছিল, বাপ ছিল, কত ভাই ছিল, ঘর পোরা লোক, কিন্তু কালের কি চঞ্চল পরিবর্ত্তন আজ আর তাঁহাদের কেহই নাই—অনি পিসীর ছোট ভাইটী মাত্র সম্বল, তাহার নাম ভোলানাথ। ভোলানাথ গৌরীর স্বামী, আজ স্ত্রীর নামে স্বামীর পরিচয় দিলাম বলিয়া পাঠক কিছু মনে করিবেন না। চলন হইয়া আসিতেছে।

ভোলানাথ কৃষ্ণ নগরে ময়রার দোকান খুলিয়াছে, ভোলানাথের ৩২

বৎসর বয়ক্রম হইলেও অনি পিসী তাহাকে একটা মানুষ বলিয়াই মনে করে না। গৌরী ছাড়েনা বলে ঠাকুর দেখিব। অনি পিসী কত মুখ ঝামটা দিয়াছিল, কিন্তু ভাই নানারূপে বুঝাইয়া যে গাড়ীতে ঘি ও গুড় ইত্যাদি আসিয়াছিল তাহারই এক পাশে তাহাকে বসাইয়া আনিয়াছে। অনি পিসী এই অন্যায় কার্য্যের জন্য সেই ঘর হইতে বকিতে আরম্ভ করিয়া এখানে আসিয়াও শেষ করিতে পারে নাই। এত তিরস্কার তবু ভোলা আজ গৌরীর মান বাড়াইতে তাহাকে সঙ্গে আনিয়াছে।

বাল্যকালে বিধবা হইলে স্ত্রীলোকের স্বভাব কিছু খিট্‌খিটে হয়, পুরুষ ভুক্তভোগী নয় বলিয়া সময়ে সময়ে তাহাদের উপর রাগ করে, কিন্তু রাগ করিবার কথা কি? অনি পিসী ঝগড়াটে নয়—পাড়ার লোক তাহার কলহের জন্য ভীত নয়—ভয় অনি পিসী কাহারো খাতির রাখিয়া কথা কয়না। একটা কথা না কহিলে হয় কিন্তু অনি পিসীর মুখ কেমন গুড়গুড় করে, তাই কথা কহিয়া ফেলে। কিন্তু অনি পিসীর স্বভাব চরিত্র বড় ভাল, কখন কেহ তাহার কোন দোষের কথা শুনে নাই, তাই সকলেই তাহাকে ভালবাসে।

আজ অনি পিসী থালায় জিলাপী সাজাইতেছে আর বলিতেছে "বলি না এলেই কি নয়—ঘরের বৌ হাটে কেন? তা ছোঁড়ায় আবার সাধ, এবার একটা পাগ্‌ড়ী বাঁধ আর তার উপর বৌকে শেলাই করে বসিয়ে দে।"

ভোলা। যা হবার হয়ে গেছে আর বক্‌চো কেন?

অনি। বক্‌বো না, এক-শোবার বক্‌বো, আমি বাড়ীর কেউ নই—আমার কথাটা কি কথা নয়—আমি কি তোদের ভালয় নয় কেবল মন্দতেই আছি?

ভোলা। আমি কি তাই বল্‌চি।

অনি। তা নয় ত কি, বলার কি আর হাত পা আছে, আমি যে তোর্ বয়সেও কখন কৃষ্ণরায় দেখিনি।

ভোলানাথ বুঝিল দিদির এ কথাটা ঠিক নয়, কিন্তু তথাপি তাহার কোন প্রতিবাদ না করিয়া বলিল "ময়রা'র মেয়েরা দোকানপাটে বেরুলে জাত যায়না।"

আর কোথা আছে। সহসা অনির কণ্ঠস্বর সাত গ্রাম উঁচু সুরে বাঁধিয়া গেল, বলিল "তবে আর কি, এইবার বৌকে নিয়ে দোকান খুলে কিছু করে নে।"

ভোলানাথ চুপ্ করিয়া রহিল। অনি পিসী তখন পরাজিত ভ্রাতার দিকে ফিরিয়া বলিল "কথা কস্‌নে যে, চুপ্ কর্‌লি কেন, আমি অন্যায় বলে থাকি পাঁচ জন মানুষ ত আছে বলুক। এই সোমত্ত বউ নিয়ে এই ঘরে আমি কোথায় কৌটোর মধ্যে পুরে রাখি তা বল্।"

ভোলা। ঐ ত ঘরে বসে আছে।

অনি। বসে থাক্‌লে ত চল্‌বে না, পেট ত আছে—আমি দোকান দেখ্‌ব না ওর খাওয়া দাওয়ার আয়োজন কর্‌বো।

ভোলা। ও না এলে ত তোমায় রাঁধতে হত।

অনি। ওরে তা হলে আর দোকানদারি হয় না, এতদিন অনিকে ভিক্ষের ঝুলি নিতে হত। আমি মুড়ি খেয়ে থাক্‌তাম, তুইও তার উপর না হয় ছুটো ভাঙ্গা মেঠাই খেতিস্।

ভোলা। ওরও তাই না হয় হবে।

অনি। তবে তুই সংসার কর আমি চলে যাই—আর আমায় কেন—এখন ত দিন পেয়েছিস্ সর্ব্বস্ব খুইয়ে তোর বিয়ে দিয়েছি, দোকান কর্‌তে ৫০০ টাকা দিয়েছি,—আজ না হয় ভগবান দিন দিয়েছেন। তাই হোক্ আমি চলে যাই।

ভোলা। দিদি ও কথা কেন?

অনি। আবার কি করে বলে—বৌ উপোসী থাক্‌বে?

ভোলা। আর বক্‌তে পারিনা, যা হয় কর।

অনি। কেন বৌ ছুটো শিখিয়ে দিগ্‌না।

গৌরী আধ্ ঘোম্‌টার মধ্য হইতে বলিল "হ্যাঁ ঠাকুর ঝি, তুমি কেবল ঐ কথাই বল। আমি ওকে শেখাই?"

অনি। খুব শেখাস্—নইলে ওর কি সাহস যে তোকে আনে। ওমা কুলের বৌ হাটের মাঝে। ছি ছি, ঘেন্নায় যে আমি মলাম।

গৌরী। সেখানে কার আছে থাক্‌তাম?

অনি। কেন, পাড়ায় লোক নাই? নে লো নে নেকামী রাখ, বল যে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বিনে। আজ কাল তোর বলে নয় দেশ শুদ্ধ ঐ দেখ্‌চি। ঘেন্নাও নেই।

গৌরী অধোবদনে ঘাড় হেঁট করিল।

দোকানে বেচা কেনার ভিড় লাগিয়া গেল, জিনিস প্রস্তুত করিয়া উঠা

ভার্ হইল, দিনে আর রাঁধা হইল না।* তিন জনে চিঁড়ে ভিঁজাইয়া খাইয়া রহিল। সন্ধ্যা হয়—দোকানে তেমনি ভিড় ঠাকুর ও পার হইতে আসিতে অনেক দেরি, কিন্তু লোক যেমন, বেচা কেনাও তেমনি। অনি পিসী এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বলিল "রাত্রে ত রাঁধ্‌তে হবে—এখন আমি দোকান ফেলে যাই কোথা?"

ভোলা। আমি ত আছি।

অনি। তুই ত সে দিনের—তোর হাতে আমি কোন্ সাহসে দোকান রেখে যাই—বৌকে কোথা রাখি।

ভোলা। আমি কি মানুষ নই?

অনি। তোর গালে যদি একজন চড়িয়ে দেয়, ত তোর দাঁত্ কপাটী লাগ্‌বে,—আমি কি তা পারি।

ভোলা দিদিকে চিনিত, সুতরাং আর কোন কথা কহিল না। তখন অনি পিসী গৌরীকে ডাকিয়া বলিল "আয় একটা কলসী নে, চ কাপড় কেচে আনি।"

গৌরী শশব্যস্তে কলসী লইয়া চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অনি পিসীর রাগ।

কোথাও গরুর গাড়ি সার,—কোথাও গাছে হাঁড়ি টাঙ্গান, কোথাও মাটীর চাঙ্গড় দিয়া উনান করিয়া তাহাতে রন্ধন হইতেছে। তাহার চতুর্দ্দিকে লোক বসিয়া গল্প জুড়িয়াছে, কেহ বা জাল দিতেছে, কেহ বা ঘটর ঘটর করিয়া হাঁড়িতে কাঠি দিতেছে। কেহ মাদুর পাতিয়াছে, কেহ ছোট সতরঞ্চ পাতিতেছে, সঙ্গী বিশেষের জন্য কেহ বা একটা কাপড় টাঙ্গাইয়া আড়াল করিয়াছে। দলে দলে ছোঁড়ার দল অপূর্ব্ব সাজ সজ্জার বাহার দিয়া এদিক সেদিক করিয়া বেড়াইতেছে। কোন কোন স্থানে আবার ভিড়ের ভাগ বেশী। তাহার মধ্যেই কত রসের কথা, কত উদ্দেশে ঠাট্টা বিদ্রূপ চলিতেছে। আবার কোথাও বা মুখের কথায় সানাইতেছে না, হাতাহাতি লাঠালাঠিও চলিতেছে।

অনি মুখটা বিকট সিকট করিয়া এই জনতার মধ্য দিয়া চলিয়াছেন। তাহার কিছু ভাল লাগিতেছে না, মনটা বড় খারাপ, কেবল বউকে সাম্‌লা-ইতেছে; ভিড় ঠেলিয়া, গাল পাড়িয়া পথ পরিষ্কার করিতেছে। গৌরী সুন্দরী, গৌরী যুবতী—তায় অবগুণ্ঠনবতী, সুতরাং সে চাঁদমুখ দেখিবার জন্য যে অনেকে উৎসুক তাহা আর বলিতে হইবে কেন? দল বাঁধিয়া ভিড় করিয়া তাহার পথ রোধ করিয়াও কোন ফল হইতেছে না। অনির মুখের তোড়ে পথ ছাড়িতে হইতেছে,—কিন্তু অনির গাত্রদাহ তাহাতে ঘুচিতেছে না। অনি অস্ফুট স্বরে গৌরী ও ভোলানাথকে যে কত প্রকার তিরস্কার করিতেছে তাহার আর শেষ নাই।

ক্রমে সে জনতা পার হইয়া নদীতটে উপস্থিত হইল। কিন্তু তবু ত্রাণ নাই, সেখানেও লোকের অভাব নাই, কেহ গা ধুইতেছে, কেহ জল তুলিতেছে, কেহ বা সঙ্গে দাড়াইতে আসিয়াছে। অনি পিসী সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অবশেষে আপন ইপ্সিত স্থানে উপস্থিত হইল।

অনি পিসী শীলাবতীর জলে পা দিয়াই বলিল "মাগো এ জল ত খাওয়া যাবে না, চল উপর দিকে যাই।"

তখন উভয়ে বালি রাশির উপর দিয়া জনতা ঠেলিয়া পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিল। অনি পিসী এই নূতন কৃষ্ণনগরে আসে নাই, আরও অনেকবার আসিয়াছিল সুতরাং পথ ঘাট সকলই চিনিত। অনি গ্রামে লোকের পিসী হইলেও যে কৃষ্ণনগরের লোকের অনি পিসী হইবে তাহা তাহার ইচ্ছা নয়। একবার অনি পিসী বলায় পিসীর সঙ্গে গ্রামস্থ ছেলে-দের কলহ হয়। আজ সন্ধ্যাকালে কতিপয় বালক পিসীকে দেখিয়া বলিল "ওরে পিসী এসেছে।"

আর কোথা আছে, অনি পিসী রাগে গর্ গর্ করিয়া বলিল-"কে রে তোরা আমায় পিসী বলিস্?"

বালকগণ তখন তাহাকে বেষ্টন করিয়া "অনি পিসী—অনি পিসী" বলিয়া চতুর্দ্দিকে করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল। অনি পিসী তখন বৌ ভুলিল, বালকগণকে যথেষ্ট গালি দিয়া তাহাদের তাড়া করিয়া বলিল "দাঁড়াত পোড়াকপালে ছোঁড়ারা, তোদের মুখে আগুণ জ্বেলে দি।"

বালকরা দূরে পলাইয়া আবার বলিতে লাগিল—

অনি আমার পিসী,

বাবার ছিল মাসী,
যেন খোদার খাসি,
নিয়ে যাব কাশি।

অনি পিসী আরও জ্বলিয়া উঠিল। বলিল "তবে রে পোড়ার মুখরা, আমি খাসি? তোরা খাসি, তোদের বাপ খাসি, মা খাসি, তাদের কাশী নিয়ে যা, আমি কাশী যাব আমার দায় পড়েছে।

বালকেরা আবার "পিসী যাবে কাশী" বলিয়া মহা আস্ফালন করিয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিল। অনি পিসী "আমি কাশী যাব দাঁড়া ত, আমার গঙ্গা বাগে পা হয়েছে বটে," বলিয়া বালকদের পশ্চাৎ ধাবিতা হইল। বালকেরা আবার ছড়া কাটিতে কাটিতে ছুটিল, কিন্তু অনি পিসী ফিরিবার নয়, তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল এবং তাহাদের পিতা হইতে উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের খাদ্যের বড় কুব্যবস্থা করিতে লাগিল।

খানিক পরে বৌকে মনে পড়িল, পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে বৌ ত নাই, —কি সর্ব্বনাশ বৌ কোথা? তখন অনি পিসী সকল ভুলিল, ছড়া ভুলিল, বালকদের দল ভুলিল। চিৎকার করিয়া ডাকিল "বৌ, ও বৌ—বৌগো।"

কোথায় বৌ, কে উত্তর দিবে। তখন পিসী চীৎকার করিতে করিতে ছুটিল "আমাদের বৌ কোথা গেল গো,—সোমত্ত বৌ যে গো।"

সেইখানে একদল যুবক দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা বলিল "কি হয়েছে গো?"

অনি। আর বাবা সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমাদের সোনার বৌ হারিয়েছে গো।

"কোথায় হারিয়েছে?"

"এইখানে কোথায় গো, এইখানে কোথায়। ওগো, তোমরা বকুল তলার দোকানে আমাদের ভোলাকে খবর দাও গো।"

"কিসের দোকান।"

"জিলিপী মেঠায়ের দোকান।"

একজন ছুটিল আর বাকি সকলে বলিল "কাঁদিস্ নে মাগী, আমরা তোর বৌকে খুঁজে দিচ্ছি।"

"কি সর্ব্বনাশ—তোরা খুঁজ্‌বি কি, সে যে আমাব সোমত্ত বৌ।"

যুবকেরা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া খুঁজিতে লাগিল, আর অনি পিসী তাহাদের গালি পাড়িতে লাগিল। এমন সময়ে ভোলা ছুটীয়া

আসিল। "ভোলাকে দেখিয়া অনি পিসী আরও কাঁদিয়া উঠিল। ভোলানাথ সকল শুনিল, তখন গৌরীকে খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু অনি পিসীর চিৎকার শব্দে সে স্থান লোকে লোকারণ্য হইল। রাত্রি আটটা বাজিল, তবুও বৌকে পাওয়া গেল না। তখন ভোলানাথ বিমর্ষ চিত্তে ফিরিল। অনি পিসী ভোলানাথকে গালি পাড়িতে লাগিল। আর বলিতে লাগিল "তুই গুরুর কথা মানিস্ নে, পথে নারী বিবর্জ্জিত" তা জানিস্নে, এখন আন্ বৌ, আমার ছ-শো টাকার বৌ—তা নইলে তুই আছিস্ আর আমি আছি, আমি পেটে খাই নি—কত কষ্টে টাকা জমিয়ে বৌ কিনেছি, আজ আমার সে বৌ কোথা গেল।"

ভোলানাথের মুখে আর কথা নাই, দিদিকে আর কি বলিবে, আপন মনে আপনাকে শত ধিক্কার দিতে লাগিল। চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। সে অতি কষ্টে তাহা দমন করিল কিন্তু বেশীক্ষণ পারিল না। ভোলানাথ কাঁদিয়া ফেলিল। তখন অনি পিসী আর চলিতে পারিল না, থপ্ করিয়া শীলাবতীর কুলে বালির উপর বসিয়া পড়িয়া পা দুটী ছড়াইয়া দিয়া, আরও কাঁদিতে লাগিল, এবং শিক্নি ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল "ভোলা তুই কাঁদিস্নে, আমি যেমন করে পারি আবার তোর বিয়ে দেবো, তবে নাকে কানে খৎ দে যে আর বৌকে বাড়ির বার কর্‌বিনে।"

ভোলা তাহার কোন উত্তর না দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অনির হাত ধরিয়া দোকানের দিকে লইয়া চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গৌরী এই যে!

দোকানে প্রবেশ করিয়া ভোলানাথ একটী কেরোসিনের বাক্সে বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, অনি পিসী মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া আপনার কণ্ঠস্বরকে একমাত্রা উচ্চসুরে বাঁধিয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিল "ওগো আমাদের কি সর্ব্বনাশ হলো গো।"

গৌরী এতক্ষণ চাঁচের আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল ব্যাপার ভাল বুঝিল না, কিন্তু স্বামীর বিমর্ষভাব ও ঠাকুরঝির ক্রন্দন শব্দে বুঝিল যে একটা কিছু

ঘোর অনিষ্ট হইয়াছে। তখন গৌরী মনে মনে মনটা ও গলাটা সময়ের উপযোগী করিয়া লইয়া ঠাকুরঝির পার্শ্বে ধীরভাবে আছাড় খাইয়া পড়িয়া সক্রন্দনে বলিল "ঠাকুরঝি আমাদের কি হলো গো।"

ভোলানাথ চমকিল, ঠাকুরঝি উঠিয়া বসিল, বলিল "বৌ ?"

গৌরী সক্রন্দনে বলিল "হ্যাঁ, আমাদের কি হয়েছে ঠাকুরঝি ?"

অনি। মাথা আর মুণ্ড হয়েছে, তুই ছিলি কোথা ?

গৌরী। কোথা আর থাক্‌বো, তুমি আমায় ফেলে ছেলেদের তাড়া কর্‌লে দেখে, আমি আস্তে আস্তে চলে এলাম।

অনি। তাড়া কর্‌বো না, আমায় বলে পিসী ও অনি পিসী।

ভোলা। তাতে আর দোষ কি ?

অনি। দোষ নয়, আমি কি যার তার পিসী হবো। তাই না হয়, তাড়া করে ছিলাম তুই একলা এলি কেন ?

গৌরী। কোথায় থাক্‌বো ?

অনি। যেখানে দাঁড়ায়ে ছিলি সেই খানে।

গৌরী। আমি একলা সেইখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারি।

অনি। পারিস্‌নে তা জানি, কিন্তু আমাদের হায়্‌রানিটে ভাব্‌ দেখি।

গৌরী আর কোন কথা কহিল না। তখন অনি পিসী ভোলার উপর পড়িল। বলিল "আমি না হয় মেয়ে মানুষ না বুঝে দিশাহারা হলাম, আমার দশ হাত কাপড়ে কাছা নেই। হাঁরে ভোলা তুই না পুরুষ, তুই না কাছা দিয়ে কাপড় পরিস্‌, তুই দোকান ফেলে ছুট্‌লী কেন ? দোকানে আর যে কিছু নেই রে ভোলা।"

ভোলা। তা আমি কি করবো—তুমি যে ডেকেছিলে।

অনি। আমি ডেকেছিলাম তা জান্‌লি কি করে ?

ভোলা। তারা যে বল্‌লে।

অনি। তারা কি মিছে বল্‌তে জানেনা, তারা জোচ্চোর, সিঁদেল—তুই তাদের কথা শুন্‌বি ?

ভোলা। অত বুঝ্‌তে পারিনি।

অনি। তা ত জানি যে তুই পার্‌বিনে। তুই মেয়ে মানুষের বাড়া—তোর বৌকে আনা কেন ? আমার যে সর্ব্বস্ব লোকে খেয়ে গেল, তার কি হবে তা বল্‌।

ভোলা। তাইত—এমন সব লোকও ত দেখিনি।

অনি। সেই ড্যাক্‌রা, যে তোকে ডেকে ছিল, সেই সব খেয়ে গেছে। ওরে বাবো একগাড়ি খাবার। আহা আমি একখানা জিলিপি বৌয়ের হাতে দিইনে গো, আমার সব জিলিপি খেয়ে গেল।

ভোলা। তা আর কাঁদ্‌লে কি হবে।

অনি। কাঁদ্‌বো না—এ কি না কেঁদে থাকা যায় রে ভোলা? তুই যত অনর্থের গোড়া—ওরে এ বৌ কি হারায় রে পাগল। এযে আমার সোনার চাঁদ বৌ,—আমাব ছ-শো টাকার বৌ।

গৌরী অনেক কষ্টে ঠাকুরঝিকে সান্ত্বনা করিল। কিন্তু সে রাত্রে আর কাহারও আহাব হইল না, হাই হুতাশ করিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল। গৌরীর আব ঠাকুব দেখা হইল না।

ভোলানাথ দোকান ঘরে ঘুমাইয়া পড়িলে, অনি পিসী গৌরীকে জাগাইয়া আস্তে আস্তে বলিল "বৌ, সত্তি কথা বল্‌বি?"

গৌরী। কি কথা ঠাকুরঝি?

অনি। সেই ছোঁড়া গুলো তোকে ধরেছিল?

গৌরী। ও কি কথা ঠাকুরঝি।

অনি। তোর দোষ নেই, তবু জিজ্ঞেসা কর্‌ছি।

"সে কি ঠাকুবঝি" বলিয়া গৌরী কাঁদিযা ফেলিল। তখন অনি পিসী একটী কেবোসিনের ডিপে জ্বালিয়া গৌরীর গাল দুটী ভাল করিয়া দেখিল, বুকের কাপড় সরাইয়া বুক দেখিল, মাথার খোঁপা দেখিল, তাহার পর আলো নিবাইয়া দিয়া বলিল "বালাই—আমার কেমন স্বভাব।"

গৌরীর মন বড় খারাপ হইল, ভাল ঘুম হইল না। ভোলানাথ তাহার পরদিন আর দোকান খুলিল না, সকলকে লইয়া বাটী চলিয়া আসিল। গৌরীর বড় দুঃখ বহিল যে ঠাকুর দেখা হইল না, তাহার এত কষ্ট সকলই বৃথা হইল। তখন মনে মনে বলিল "আমি ঘোর পাপী আমার ভাগ্যে কি কৃষ্ণরায় দেখা হয়।" ভাবিতে ভাবিতে গৌরীর চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

বৈষ্ণবী দিদি।

দোলের দুইদিন পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যার সময় একটী বৈষ্ণবী রাঙ্গা বৌদের বাটীতে উপস্থিত। বৈষ্ণবীর বগলে ঝুলি, হাতে কাচের জুবিলি চুড়ি, পরণে একখানি সরু রাঙ্গা পেড়ে বিলাতী ধুতি। দিব্য পেটেপাড়া চুল, কানে ফুল, নাকে রসকলি। বৈষ্ণবী "জয় রাধে কৃষ্ণ" বলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বৈষ্ণবীর বয়স কাঁচা।

গৃহিণী বলিলেন "বড় বৌমা, একে দুটী ভিক্ষা দাও ত।"

বৈষ্ণবী গৃহিণীর নিকটস্থ দাওয়ায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া বলিল "আপনারা ?"

গৃহিণী। ব্রাহ্মণ।

বৈষ্ণবী তখন গলায় কাপড় দিয়া গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় দিল। গৃহিণী বৈষ্ণবীর দিব্য শ্রী দেখিয়া বলিলেন "তুমি কে বাছা ?"

বৈষ্ণবী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আমরা রামাত বৈষ্ণব, একদিন পাঁচজনের একজন ছিলাম। ভগবান বিধবা করেছেন, সেই পর্য্যন্ত অনাথিনী; পরের দোয়ারে ঘুরে বেড়াই।"

গৃহিণী। তোমার ত ঘোর্‌বার বয়স নয় বাছা।

বৈষ্ণবী। সাতকুলে কেউ না থাক্‌লে এমনিই কর্‌তে হয়।

গৃহিণী। ছেলে পিলে হয়নি ?

বৈষ্ণবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "না মা, তা হলে এমন করে ভাস্‌বো কেন ?"

গৃহিণী। ভাই টাইও নাই ?

বৈষ্ণবী। কেউ না মা, কেউ না।

গৃহিণী। কোথায় যাবে ?

বৈষ্ণবী। কৃষ্ণরায় দেখ্‌তে।

গৃহিণী। সঙ্গে কেউ আছে ?

বৈষ্ণবী। ভগবান!

গৃহিণী। হ্যাঁগা, এই বয়সে এত রূপ নিয়ে তুমি একা বেড়াচ্চ ?

বৈষ্ণবী। ভয় কি মা, ভগবান—অনাথের সহায়। রাত্রে কোন

গৃহস্থের বাটীতে থাকি, দিবসে পাঁচজনের সঙ্গে পথ চলি, আজ যদি দয়া করে স্থান দেন, এইখানে রাত্রিযাপন করি। যার তার বাড়ীতে ত থাকতে পারিনা।

গৃহিণী বলিলেন "তাই ত, ছেলেরা আজ বাড়ী নেই।"

বৈষ্ণবী। তার ভয় কি মা।

ছোট বউটী এতক্ষণ হাঁ করিয়া বৈষ্ণবীকে দেখিতেছিল, বৈষ্ণবী থাকিতে চায় শুনিয়া বলিল "তা থাক্‌না মা।"

বড় বৌ বলিলেন "তা থাক।" সেজ বউও তাই বলিলেন।

বৈষ্ণবী। এ তিনটী তোমার বউ?

গৃহিণী। হাঁ বাছা—আর এইটী আমার মেজ বৌ।

এই বলিয়া রাঙ্গা বউকে দেখাইয়া দিলেন। রাঙ্গা বৌ সকলের অপেক্ষা বেশী অবাক্‌ভাবে বৈষ্ণবীকে দেখিতেছিলেন। বৈষ্ণবী তখন ভাল করিয়া রাঙ্গা বৌয়ের দিকে ফিরিয়া কহিল "আহা কি রূপ, নারায়ণ করুন বেঁচে থাকুক, হাতের নো ক্ষয় যাক্।"

গৃহিণী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "তাই বল বাছা।"

তখন গৃহিণীর আদেশে বৈষ্ণবী খিড়্‌কির পুকুরে হাত মুখ ধুইতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ছোট বউ পথ দেখাইতে গেলেন। আসিবার সময় বলিলেন, "হ্যাঁগা বৈষ্ণবী দিদি তুমি গান জাননা?"

বৈষ্ণবী মৃদু হাসিয়া বলিল "আমি তোমার দিদি হলাম।"

ছোট বউ। হ্যাঁ।

বৈষ্ণবী। ভাল গান জানিনা, তবে দুই একটা শুনাতে পারিব।

তখন বৈষ্ণবী আসিয়া গৃহিণীকে বলিল "মা তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী, এমন ঠাণ্ডা বউ ত কার দেখিনি। ছোট বউ আমায় বৈষ্ণবী দিদি বলেছে।"

গৃহিণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "তা বেশ ত, আর জন্মে ওর মা নাকি বৈষ্ণবের সঙ্গে ভেক নিয়েছিল সেই জন্যে আরও তুমি ওর দিদি।"

বৈষ্ণবী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কেবল একটু হাসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীও হাসিলেন।

ছোট বউ বৈষ্ণবীকে ছাড়েনা, গান গাহিতেই হইবে। শেষ বড় বউ, সেজ বউ অনুরোধ করিলেন, অবশেষে রাঙ্গা বউ বলিলেন "এত বল্‌চে, যদি জান ত একটা গাওই না ছাই।"

গৃহিনী রন্ধনশালায় গেলেন, দেখিলেন বৌদের যাইবার গা নাই, বড় বউ মধ্যে মধ্যে এক আধ্‌বার শাশুড়ীকে দেখা দিতে লাগিলেন, ইহারা খবরই লইল না।

তখন বৈষ্ণবী "যমুনা-পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী" গানটী গাহিল। বৈষ্ণবীর গলা যেমনি সুমিষ্ট গাহিবার ভঙ্গীও তেমনি সুন্দর। ছোট বউ গানের উপর গান ফরমাইস্‌ করিতে লাগিলেন, তখন মানভঞ্জন, প্রভাস, বিরহ প্রভৃতি কত গান হইল। রাঙ্গা বউ বলিলেন "বলি ও বৈষ্ণবী দিদি।"

বৈষ্ণবী। কেন দিদি।

রা। নিধুর টপ্পা জান ?

বৈষ্ণবী। জানি, কিন্তু গাইলে তোমার শাশুড়ী যে রাগ কর্‌বেন ভাই।

রা। আস্তে গাওনা।

ছোট বউ নিধুব টপ্পা কি তাহা না জানিলেও শুনিতে বড় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বৈষ্ণবী তখন গাহিল——

"ভাল বাসিবে বলে ভালবাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে;
বিধুমুখে মধুর হাসি,
আমি বড় ভালবাসি,
তাই দেখিবারে আসি দেখা দিতে আসিনে।"

কি কায়দা—কি খোঁচ্—কি ভঙ্গী, কি ঢং—গান শুনিতে শুনিতে রাঙ্গাবৌএর গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইল, চক্ষু আপনা হইতে নামিয়া পড়িল, অঙ্গ অবশ হইয়া উঠিল।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, সকলের আহারাদি হইল, সকলে শয়ন করিবেন এমন সময় বড়বউ বলিলেন "বৈষ্ণবী দিদি শোবে কোথায় ?"

গৃহিনী। কেন এই দাওয়ায়।

বৈষ্ণবী ঘাড় হেঁট করিয়া আঙ্গুল টিপিতে টিপিতে বলিল "আমার বড় কফের ধাত, কোন ঘরের মেজেয় একটু স্থান দিলে হয়।"

ছোট বউ তখন বলিলেন "আমার ঘরে শুয়োও।" বড় বউ বলিলেন "না না আমার ঘরে শোবে" এমন সময় রাঙ্গা বউ বলিলেন "আর অত হাঙ্গামে কাজ নেই, বৈষ্ণবী দিদি আমারই ঘরে শোবে।"

বৈষ্ণবী তাহাতে সাহ্লাদে সম্মতা হইল। গৃহিণীর ইচ্ছা নয় বৈষ্ণবী ঘরে শোয়, কিন্তু কি করেন রাঙ্গা বউ স্থান দিতেছেন, তখন আর উপায় কি ?

গৃহিণী তখন বৈষ্ণবীকে একটী পুরাতন মাছর দিয়া বলিলেন ''তবে শোওগে. বালিশ টালিশ নেই বাছা।"

বৈষ্ণবী। আমাদের আবার বালিশ!

তখন সকলে আপনাপন কক্ষে শয়ন করিতে গেলেন। ছোট বৌএর ইচ্ছা আরও ছুটা গান শোনে, কিন্তু অনেক রাত্রি হইয়াছে বলিয়া তাহা আর হইল না! কেবল বলিলেন ''বৈষ্ণবী দিদি কাল থাক্‌বে ত?"

বৈষ্ণবী। অনেক পথ যেতে হবে।

ছোট বউ। তা হোগ একদিন থেকে যাও।

বৈষ্ণবী অগত্যা স্বীকৃতা হইলেন। ছোট বউ আশ্বস্তা হইলেন। বৈষ্ণবী রাঙ্গা বৌএর ঘরের মেজেটীতে যাইয়া শয়ন করিয়া আপন মনে ঠাকুরদের নাম করিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিনোদবিহারী।

রাঙ্গা বৌ ঘরে প্রবেশ করিবার অগ্রে বলিলেন "বৈষ্ণবী দিদি ঘুমুলে?" বৈষ্ণবী দিদির উত্তর নাই,—তখন রাঙ্গা বৌ ঘরে প্রবেশ করিলেন, ঘরের দ্বার বন্ধ করিলেন। দ্বার বন্ধ হইবা মাত্র বৈষ্ণবী উঠিয়া দাঁড়াইল, মাথার কৃত্রিম চুল খুলিল, বক্ষের কাঁচুলি খুলিল, রাঙ্গা বৌকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিল "আমায় মার্জ্জনা কর, আমার জ্ঞান নেই।"

রা। তুমি আমায় মজাবে।

বৈষ্ণবী আর কেহ নহে, সেই রাইটার কনেষ্টবল বিনোদ বিহারী কর্ম্মকার। বিনোদ তখন কত সোহাগে কত আদরে বলিল "আর মজিতে হইবে না, আমায় শ্বাশুড়ী মারা গিয়াছেন, তাঁহার পঞ্চাশ হাজার টাকার বিষয় ও ১০ হাজার টাকা নগদ পাইয়াছি, দশ হাজার টাকার নোট সঙ্গে আছে নাও।"

এই বলিয়া হাজার টাকা করিয়া ১০ খানি নোট রাঙ্গা বৌএর হাতে দিল, রাঙ্গা বৌ নোট গুলি লইয়া পরীক্ষা করিলেন, দেখিলেন সত্যই দশ হাজার টাকার নোট, তখন বলিলেন "এখন কি হবে।"

বিনোদ। তুমি আমার সঙ্গে চল কল্‌কাতায় বাসা ঠিক আছে। তোমার দাস দাসী গাড়ী ঘোড়া প্রস্তুত।

রা। আমার ছেলের দশা কি হবে?

বিনোদ। ওকে যত্ন কর্‌বার অনেক লোক আছে।

রা। না বিনোদ, তত সাহস আমার হয় না।

বিনোদ। তবে তুমি আমায় ভালবাস না, যদি ভালবাস্‌বে না, তবে কেন ভালবাসালে? আমার সুখের জীবন কেন অসার করলে? আমার সংসারসুখে কেন কণ্টক দাব কর্‌লে? বল্‌তে কি আমি আব আমাতে নাই—আমি কি নিদ্রায় কি জাগ্রতে কেবল তোমার চিন্তায় মগ্ন আছি। মার প্রতি ভক্তি হারায়েছি, স্ত্রীর প্রতি স্নেহ মমতা ভালবাসা নাই,—আমার এমন সর্ব্বনাশ কেন কর্‌লে?

রা। বিনোদ তুমি কি সত্যই আমায় অত ভালবাস, না আমায় উপন্যাস শুনাচ্চ?

বিনোদ। ঈশ্বর সে কথার উত্তর দিতে পারেন, আমি পারি না, বিশ্বাস না হয় বুক চিরে দেখ, সেখানে আর কিছু নেই, কেবল এই চাঁদ মুখখানি আঁকা আছে।

এই বলিয়া রাঙ্গা বৌএর চিবুকদেশে হস্ত প্রদান করিলেন।

রা। যাবে কি করে?

বিনোদ। মাঠের ধারে পাল্‌কী আছে বেহারা আছে। এখনি বর্দ্ধমান রওনা হবী। আর কে ধরে।

রা। আচ্ছা বিনোদ, সত্যই কি তুমি আমায় ভালবাস?

বিনোদ। সে কথা কি আর জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয়।

রা। আমি শুনেছি অনেকে এম্‌নি করে কুলবধূকে মজিয়ে শেষে অশেষ দুর্গতি করে।

বিনোদ। আমার কথা আমি জানি, পরের কথা কি করে জান্‌বো ভাই।

রা। তুমিই যে তাই কর্‌বে না তারই বা ঠিক কি?

বিনোদ। যারা করে তাদের জন্মের ঠিক নেই।

রাঙ্গা বৌএর মুখ বন্ধ হইল, সুতরাং অন্য কথা পাড়িয়া বলিলেন "তুমি যদি আমার স্বামী হতে।"

বিনোদ। তাই ত হবো। তোমাকে যে যত্ন কর্‌বো, লোকে আপন স্ত্রীকে তত করে না।

রাঙ্গা বৌয়ের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া যেন একটী দীর্ঘনিশ্বাস বহিল। বিনোদ বলিল "আর নিশ্বাস ফেল কেন?"

রাঙ্গা বৌ মস্তকটী অবনত করিয়া বলিলেন "আমি সব পাব, কিন্তু আমার সতীশকে ত পাব না।"

বিনোদ তখন নানা কথায় রাঙ্গা বৌএর মন ভুলাইয়া সান্ত্বনা করিল।

রাঙ্গা বৌ বলিলেন "এই ভাব চিরদিন থাক্‌বে ত?"

বিনোদ। ঈশ্বরের শপথ করে বল্‌তে পারি চিরদিনই থাক্‌বে।

তখন রাঙ্গা বৌ যুবককে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "বিনোদ আমি তোমারি—তোমার মত আর কাহাকেও কখন ভাল বাসিনি।"

বিনোদ সেই স্ফুরিত বিম্বাধর সাদরে চুম্বন করিয়া তাহার উত্তর দিলেন, কোন কথা কহিলেন না। তখন রাঙ্গা বৌ নিদ্রিত সন্তান সতীশের মুখ চুম্বন করিলেন, আলোক ধরিয়া সেই বালকের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলেন, চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, যুবতী চক্ষের জল মুছিয়া মশারি ফেলিয়া দিলেন, তাহার চতুর্দ্দিকে বেশ করিয়া গুঁজিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেও সাধ মিটিল না, আবার একবার মশারি তুলিলেন, আবার সতীশকে ঘন ঘন চুম্বন করিলেন, তখন একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিনোদের হাত ধরিয়া বলিলেন "দেখো বিনোদ।"

বিনোদ। কোন চিন্তা নাই।

বিনোদ ঘরের দ্বার খুলিল, ধীরে ধীরে উভয়ে বাটী হইতে বাহির হইয়া সেই প্রগাঢ় নিশীথে মাঠের দিকে চলিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। তখন দুশ্চারিণী রাঙ্গা বৌ যদিও কুলে জলাঞ্জলি দিল তবু ভাবিতেছে সতীশ আর তাহার সেই চিরঘৃণ্য স্বামী হরিচরণ! কেবল চিন্তা হইতেছে কাজ কি ভাল করিলাম। কিন্তু সঙ্গে যে বিনোদ,—যে বিনোদ প্রাণের প্রাণ, সে যে সঙ্গে, তবে ভালই হইয়াছে!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গেল কোথায়?

পরদিন অতি প্রত্যুষে গৃহিণী দেখিলেন ঘরের দ্বার খোলা, রাঙ্গা বৌ বা বৈষ্ণবী কেহই ঘরে নাই। প্রথমে পুকুর ধার, নিকটের মাঠ, বাগান খোঁজা হইল, শেষে মহা হুলস্থুল বাধিয়া গেল, পাড়া তোলপাড় হইল। রাঙ্গা বৌ কোথাও নাই। বৃদ্ধার সন্তানত্রয় পূর্ব্বদিন নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গিয়াছিলেন। বেলা ৮টা বাজিল তবু দেখা নাই। বৃদ্ধা ছট্ ফট্ করিতেছেন, ভোরে আসিবার কথা এখনও আসিল না কেন? ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে এমন সময় তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত। ঘটনা শুনিতে বাকি রহিল না, তখন ছোট ছেলে বলিলেন "অত হাউ চাউ কেন, ঠাকুর দেখ্‌তে কি কেউ যায় না। আমি এখনি আন্‌তে যাচ্চি।"

এই বলিয়া তৎপর স্নান করিয়া দুধ দিয়া মুড়ি ভিজাইয়া খাইয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণনগর রওনা হইলেন। অপর ভ্রাতারা সঙ্গে না গেলেও ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করিলেন। বড় বৌ বলিয়াছিল "দেখ আমার কেমন সন্দেহ হয় বৈষ্ণবীটে যেন পুরুষ পুরুষ।" তাই বড়র মনে সুখ নাই। আর তা ছাড়া বেনামি পত্রের একটু আভাষও হরিবাবু বড় ভাইকে পাঠাইয়া সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলিয়া ছিলেন, আজ ভাই কি বলিবেন, এই ভাবনা বিষম হইয়া দাঁড়াইল।

ছোট ভাইটীর সঙ্গে পথে ভোলানাথের দেখা। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন "আমাদের রাঙ্গা বৌকে কৃষ্ণনগরে দেখে ছিলি।

ভোলানাথের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই অনিপিসি বলিল, "কে জানে বাবু রাঙ্গা আর কাল, আপনার বৌ নিয়েই কাল চখে সর্‌ষে ফুল দেখেছি।"

"কি হয়েছিল পিসি?"

"বৌ হারিয়ে ছিল বাবা, বৌ হারিয়ে ছিল।"

তিনি আর কোন কথা না কহিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন, মনে মনে বলিলেন "বৌ হারানর পালা পড়েছে নাকি?"

কৃষ্ণনগর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন কিন্তু কোথায় রাঙ্গা বৌ, যে তাহাকে পাইবে না, শেষ বাটী ফিরিয়া আসিয়া দাদার সঙ্গে পরামার্শ করিয়া রটনা

করিলেন যে বৌ কৃষ্ণনগরে বাজার ভাও হইয়া মারা গিয়াছে।

কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না। কিন্তু বালক সতীশের গলায় কাচা পড়িল। হরিচরণ বাবুর এটা বড় দুঃসময়। পূর্ব্বে যে গোপনে চারি দিনের জন্ম বাটী আসিয়া ছিলেন তাহা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। কোন শত্রু পক্ষ বেনামা পত্রদ্বারা পুলিশের বড় সাহেবকে জানায়, তিনি স্বয়ং আসিয়া থানায় উপস্থিত হন। সেইজন্য হরিচরণ বাবু সাস্‌পেণ্ড হইয়াছিলেন। ফ্রেঞ্চ লিভের দায়ে অনেকের চাকুরী যায়, তবে ডি, এস সাহেবের বড় বাবুর দয়ায় অতি অল্পদিন মাত্র ৩ মাস সাস্‌পেণ্ড থাকিয়া আবার কার্য্য পাইয়াছিলেন। হরিবাবু সাস্‌পেণ্ড হইয়া ভাবিতেন "আমার বিপদ হইবে না কেন, আমার লক্ষ্মী যে ছাড়িয়া গিয়াছে, সে থাকিলে আমার এ বিপদ কখন হইত না। তাহাকে বিবাহ করিয়া পর্য্যন্ত আমার সুখ। কখন কোন বিপদে পড়ি নাই,—পতিব্রতা সতীর সহবাসে আমার সকল পাপের নাশ হইয়াছিল।" তাঁহার মনস্তাপের আর শেষ নাই। হরিবাবু বাটী আসিলেন বটে, কিন্তু শ্রাদ্ধে বেশী খরচ পত্র করিলেন না। যা না হইলে নয় তাহাই হইল। তিনি স্থির বুঝিলেন যে তাহার গৃহিণী আর নাই। আর অবিশ্বাস বা কিসে, ছোট ভাই যে নিজে সৎকার করিয়া আসিয়াছে বলিতেছেন। আহা, আজ হরিবাবু সেই প্রাণ সম পতিপ্রাণা প্রিয়তমা বিহনে যে কত কষ্ট অনুভব করিতেছেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। সতীশ আজ কাল সকলের বড়ই আদরের হইয়াছে, বিশেষতঃ পিতার।

শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার পরই বৃদ্ধা মাতা বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু হরি বাবু কিছুতেই সম্মত হইলেন না। ভাবিলেন "তেমন স্ত্রী কি মিলে।" ছোট ভাই, বড় ভাই, বড় ভাজ, পাড়া প্রতিবেশী পর্য্যন্ত অনেকে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহার সেই এক কথা। হরিবাবু পেন্‌সিল লইয়া আঙ্গুল গুণিয়া কবিতা লেখেন, আর কাগজে ছাপিবার জন্য পাঠান, কিন্তু কেহ ছাপে না। তাঁহার "উদ্ভ্রান্ত প্রেমের" মত কোন একটা পুস্তক লিখিয়া স্বীয় অগাধ ভাল বাসার পরিচয় দিবার ইচ্ছা বড় বলবতী হইয়াছিল। কিন্তু ক্ষমতার অভাবে তাহা হইয়া উঠে নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মাষ্টার বাবু।

ঈশ্বর বাবু স্কুলের মাষ্টার। আজ প্রায় ১০ বৎসর মাষ্টারি করিতেছেন। ছেলে মহলে তাঁহার বেশ প্রতিপত্তি, লোকটা যেমন গম্ভীর তেমনি সদালাপী, বন্ধু বান্ধবের প্রাণ-স্বরূপ। যেখানে যেমন সেখানে তেমনটী করিতে ঈশ্বর বাবু বড়ই দক্ষ। ক্ল্যাসে গম্ভীর মূর্ত্তি, বালকদের ভীতিপ্রদ। আবার যখন পথে দেখা হয় তখন কেমন মধুর ভাবে, কেমন মধুর হাসিয়া তাহাদের সহিত সদালাপ করেন। তাহারা তখন সকল ভুলিয়া ভাবে এমন মাষ্টার আর বুঝি পাইব না। বস্তুতঃ কথাটা অপ্রকৃত নয়।

ঈশ্বর বাবুর একটী বন্ধু তাঁহাকে "ম্যাজিক লান্ঠান্" বলিতেন। বলিবার কারণ ছিল, দর্শক লাঠান্ সাহায্যে এই দেখিল মহা রণস্থলী আবার তখনি দেখিল প্রমোদ কানন। এই দেখিল প্রমথগণ পরিবেষ্টিত শঙ্কর মূর্ত্তি এমনি আবার দেখিল দিল্লীতে বাই নাচ। আমাদের সুরসিক মাষ্টারে তাহা দেদীপ্যমান ছিল, সুতরাং তুলনা অসঙ্গত হয় নাই।

সভায়, মজ্‌লিসে, অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে, বিবাহে, যাত্রায়, বারোয়ারিতে ঈশ্বর বাবু না থাকিলে সবই ফাঁক। বারোয়ারিতে বাই নাচ হইবে, ঈশ্বর বাবু আলোক জ্বালাইলেন, বিছানা পাতাইলেন, লোক জনকে সমাদর করিয়া বসাইলেন, কিন্তু ভেড়ুয়ারা যাই শারেঙ্গে ছড়ি দিল, বাদক তবলা বাঁয়া কোমরে বাঁধিয়া দাঁড়াইল, ঈশ্বর বাবু অমনি্ চাদর কাঁধে করিলেন, কেহ যদি বলিল "আরে একটা গান শুনিয়া যাও।"

ঈশ্বর বাবু মুখ বাঁকাইয়া হাত নাড়িয়া বলিলেন "আ ছি ছি!" অমনি অন্তর্দ্ধান হইলেন, কিন্তু যখন ইয়ারেরদল নির্জ্জন বাগানে উপস্থিত, ঈশ্বর তখন মনোমোহিনীদের বদনসরোজ চসমার মধ্য হইতে দেখিতেছেন, কাহারও গালটা টিপিয়া দিতেছেন, কাহারও দুই বগলে হাত দিয়া নাচিবার জন্য তুলিয়া দিতেছেন, গান গাইবার পূর্ব্বেই বাহাবা দিতেছেন। ব্রাহ্ম সমাজে ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে উপাসনা কালে সকলের আগে চক্ষু বুজিতেছেন, আবার বাটীতে কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিলে ঝিকে শিখান আছে যে বলে বাবু আহ্নিক করিতেছেন। বাবু সে সময় প্রিয়তমার ভুজপাশে আবদ্ধাবস্থায় শায়িত থাকিলেও, ঝি আপনা হইতে দুই একবার একটী পিতলের ঘণ্টা নাড়িয়া দেয়, আহ্নিকের ঘটা জানায়।

ঈশ্বর বাবুর দিব্য শ্রী, কামিনী-মনোমোহন কান্তি বটে। দেখিতে মধ্যাকৃতির উপর তুই ইঞ্চি উচ্চ বলা যায়। দিব্য বর্ণ, সুন্দর চক্ষু, উন্নত নাসিকা, ঠোঁট তুটী বেশ পাতলা, তায় তাম্বুল রাগে টুক্ টুকে। তবে মাথার চুল ভাল নয়, টাক্ পড়া। গ্লাডোষ্টণের মাথায় টাক ছিল, ডিসরেলির ছিল, অনেক বড় লোকের আছে, ওটা চিন্তাশীলতার লক্ষণ, সে হিসাবে ঈশ্বর বাবু সৌভাগ্যবান, কিন্তু বাগানে তাহাকে সশঙ্কিত থাকিতে হইত, মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ সেই সাদা ধপ্ ধপে মাথায় মাছের ঝোল মাথাইয়া দিত। ঈশ্বর বাবু চটিতেন না ববং, বলিতেন "তবে একটু বেশী করে দে, গড়িয়ে যেন মুখে আসে।"

ঈশ্বর বাবুর চক্ষু চশ্মা ছাড়া থাকিত না, থাকিলেই বিপদ। একদিন তিনি হেদোর ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে একজনকে আপনার বন্ধু ভ্রমে ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চাদ্দিকে যাইয়া বিকট শব্দ করিয়া ভয় দেখাইয়া ছিলেন, লোকটী "বাপ্‌রে মাতাল রে" বলিয়া ছুটিয়া পালাইয়া যায়, তখন ঈশ্বর বাবু আপনার ভ্রম বুঝিলেন, অপ্রস্তুতের এক শেষ, মুখে কাপড় দিয়া দৌড় দিলেন।

আর একদিন তাঁহার এক বন্ধুর বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছেন, গ্রীষ্মকাল, দেখিলেন বাটীর সম্মুখে ফাঁকা জায়গায় বন্ধু দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার পার্শ্বে একটী পালিত খাসিও আছে, ঈশ্বর বাবু "কি বাবা নভু আছ কেমন?" বলিয়া খাসির শৃঙ্গে হাত দিয়া ফেলিলেন। নভু তাঁহার বন্ধুর সন্তানের নাম।

আর একদিন তাঁহার আর এক বন্ধুর বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছেন, বন্ধুটী তৎপুর্ব্বে একটী কাল পাঁঠা কিনিয়া ছিলেন। সকলে বসিয়া আছেন, এমন সময় একটা কুকুর সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া তাঁহার বন্ধুটীকে বলিয়াছিলেন "আর কেন ওটাকে একদিন হয়ে যাক্ না।"

শুধু তাই নয়, একদিন শ্বশুর বাড়ী গিয়া বাটীর মধ্যে স্ত্রীকে একটী গোপনীয় কথা বলিতে গিয়া স্ত্রী ভ্রমে এক শালীকে বলিয়া আসিয়াছিলেন, তাই লইয়া মহা ঠাট্টা বিদ্রূপ হয়। এই সকলের জন্য ঈশ্বরের চশ্মা তাহার নাসিকা সিংহাসনে অহর্নিশি বিরাজ করিত। তবু কি বাঁচোয়া আছে। ঈশ্বর পরিবেশন কালে জলের গ্লাসে ক্ষীর ঢালিয়া দেন। পিক্‌দানি ভ্রমে পানের ডাবরে পিচ্ ফেলিয়া বসেন, স্ত্রীর চিবুক দেশ ধরিয়া

আদর করিতে গিয়া কখন কখন খোঁপায় হাত দিয়া বসেন। এ সকল ব্যাপার বিরল নয়।

ঈশ্বর বাবু জাতিতে ব্রাহ্মণ, কুলীনত্বের একটু গন্ধও ছিল। তাঁহার কলিকাতার বাসায় গৃহিণী, দুইটী কন্যা ও চারিটী সন্তান, আর একটী ঝি। ঝিটী কম বয়সী হইলেও স্বভাব চরিত্র বড় ভাল!

ঝিটী যখন প্রথম বাসায় আসে তখন তাহার বয়স বছর ষোল। ঈশ্বর ভাবিলেন এ ঝি লইয়া কি করিব। তাহার মিষ্ট কথায় তাহাকে বাহাল করিলেও মনে বড় সন্দেহ রহিল। একদিন রাত্রে মেয়েরা সব নিমন্ত্রণে গিয়াছে, বাটীতে কেহ নাই, রাত্রি প্রায় দশটার সময় ঈশ্বর আসিয়া বাটীতে শুইলেন। ঝি বলিল "বাবু আমি বাহিরে বসিয়া থাকি, মা আসিলে বাটীতে আসিব।" ঈশ্বর বাবু সে প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন বটে কিন্তু মনে খট্‌কা লাগিল। মনে হইল ঝি হয় ত এই অবসরে কাহারও সঙ্গে ছুটা রসালাপ করিতে গিয়াছে। ডাকিলেন "ঝি!" ঝি "কেন বাবা" বলিয়া কক্ষ মধ্যে আসিয়া উপস্থিত। উপস্থিত বোদ্ধা ঈশ্বর বাবু একটু অপ্রতিভ হইলেন, বলিলেন "দে-শালাইটা কোথায়?"

ঝি দেশালাই দিয়া বিদায় হইল। খানিক পরে আবার ভাবিলেন এই-বার ঝি নিশ্চিন্ত, আমি আর ডাকিব না তাহা স্থির জানিয়া নিশ্চয় কোথাও গিয়াছে। একটু ইতস্ততঃ করিয়া ডাকিলেন "ঝি।" আবার সেই উত্তর, আবার ঝি আসিয়া উপস্থিত। ঈশ্বর ঝির পরীক্ষা শেষ করিলেন। তাহার পর ঝির অনেক অনুযোগ শুনিতে হইয়াছিল, "ঐ ময়রা আমায় ঠাট্টা করে, "ঐ ফড়েটা আমার গায়ে কলা ছুড়িয়া মারে" ইত্যাদি। ঈশ্বর তখন সকলকে বিনয় করিয়া তাঁহার ঝিটীকে আর ওরূপ না করিতে অনুরোধ করেন। তাই বলি ঝিটী বড় ভাল। আজ সেই ঝি বার বৎসর তাঁহার বাসায় আছে।

একটু ধরা পড়িতে হইল, ঈশ্বর বাবুর যে এখন ঢল্ ঢলে যৌবন নয় তাহা প্রকারান্তরে বলিতে হইয়াছে, কিন্তু বলিলে কি হয়, ঈশ্বর এখনও অনেক ছোকরাকে হারাইয়া দেয়, ঈশ্বরের যৌবন যাইয়াও যায় না। দেহের সঙ্গে যেন কিছু বেশী প্রীতি জন্মিয়াছে।

পাঠক হয় ত বলিতে পারেন, ভাল, রতিপতি ত দেখাইলে একবার রতী দেখাইবে নাকি? বস্তুতঃ আমরা পাঠকের মনস্তুষ্টি সাধনে কখন বিরত হইব না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গৃহিণীর পরিচয়।

পাঠিকা বল দেখি ঈশ্বর বাবুর স্ত্রীর নাম কি? কেহ হয়ত বলিবেন ক্ষীরদা, কেহ মানদা, কেহ রজৎবালা, কেহ নগেন্দ্রবালা, কেহ মানকুমারী, কেহ সুকুমারী এইরূপ, কিন্তু আমি বলি কোনটীই মিলিল না। পাঠিকা হাসিবেন না, কিন্তু আমায় বলিতেই হইল যে নামটী "থাকমণি।" আজ কাল বড় একটা কেহ কন্যা কামনা করেন না, কিন্তু থাকমণির পিতা মাতা কাতর প্রাণে দুহিতাকে "থাক" বলিয়া থাক নাম রাখিয়া ছিলেন। গোলাপের নাম যদি গোলাপ না হইয়া অপরাজিতা হইত, তাহা হইলে কি গোলাপ আপন গোলাপী আভা হারাইত—আপন সৌন্দর্য্য হারাইত, না আপন অতুল সৌরভ হারাইত। কবিশ্রেষ্ঠ সেক্সপীয়ার বলিয়াছেন "Rose by any other name shall smell as sweet." নামে "থাক" হইলে কি হয়, থাক রূপে ক্ষীরোদাকে হারাইয়াছে, মানদাকে হারাইয়াছে, হয় ত নগেন্দ্রবালাকেও হারাইয়াছে।

থাকমণি যখন ছয় ছেলের মা, তখন আর তাহার রূপ বর্ণনা করা ভাল দেখায় না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি সুন্দরী। সুধু যে ঈশ্বর বাবুর চক্ষে সুন্দরী তাহা নয়—সাধারণের চক্ষেও তাই। ঈশ্বর বাবুকে কখন বন্ধু বান্ধবের কঠোর সমালোচনার উত্তরে গাহিতে হয় নাই যে "আমার নয়ন নিয়ে কেহ যদি হেরে তারে।"

স্কুলের বেলা হইয়া আসিল, ঈশ্বর বাবু আহারে বসিয়াছেন, গৃহিণী সাম্‌নে পা দুখানি ছড়াইয়া কোলের ছেলেটীকে স্তনপান করাইতে করাইতে স্বামীর সঙ্গে গল্প করিতেছেন। থাকমণির পা ছড়াইয়া বসিবার একটু কারণ আছে, খেলায় জয় হইলেই হাতের পাঁচ, তাই ছয়টী ছেলের পর আবার থাকমণির হাতের পাঁচ পড়িয়াছে। পূর্ণ ছয় মাসে পা ছড়াইয়া বসিতে নাকি কিছু ভাল লাগে।

ঈশ্বর বাবু আহার করিতে করিতে প্রিয়তমার দিকে একটী পূর্ণ চাহনি চাহিয়া বলিলেন "এবার ছেলে না মেয়ে?"

থাক। তা কি করে বল্‌বো।

ঈশ্বর বাবু মৃদু হাসিয়া একটু চক্ষু টিপিয়া বলিলেন "তোমার ত

তোমার, তুমি মনে কর্‌লে আমার কি ছেলে হবে বলে দিতে পার।"

থাক। তা হলে মজা হতো।

ঈশ্বর বাবু বলিলেন "আর কিছু হোগ্‌ না হোগ্‌ এই নাকে মুখে তাড়া-তাড়ি ভাত গুঁজে গরু তাড়ান ঘুচ্‌তো।"

থাক। বোধ হয় মেয়ে হবে।

ঈশ্বর। সত্তি নাকি ?

থাক। তাই ত মনে হচ্চে।

ঈশ্বর। তা হয় ত বলো একেবারে শাল্‌খের ঘাটে আঁচিয়ে ফেরার হই।

থাক। অত যদি—

ঈশ্বর বাবু বলিলেন "বল বলনা, থাম্‌লে কেন, আমি বুঝি আর উত্তর দিতে পার্‌ব না।"

থাকমণি হাসিয়া কহিলেন "নাও নাও ভাত খাও। স্কুলের বেলা হলো।"

ঈশ্বর। স্কুল আর নেই কবে, সেই পাঁচ বৎসর বয়সে ঢুকেছি, আজও ছাড়্‌তে পার্‌লাম না। তা বলে আর ছুটো কথাও কি কবো না, আচ্ছা বলি সে দিন যে পাছা পেড়ে কাপড় জোড়াটা কিনে আন্‌লাম সেটা আর বুঝি পরা হবেনা।

থাক। তুমি কি পাগল হলে, ছ-ছেলের মা হলাম, জামাই হলো, আবার পাছা পেড়ে কাপড় পর্‌বো।

ঈশ্বর। বাঃ, আমি ত আর তোমায় জামাইএর সঙ্গে লেখাপড়া করে দিইনি যে পাছাপেড়ে কাপড় পর্‌তে পাবেনা।

থাক। কথা শোন।

ঈশ্বর। তোমারও যেমন কথা আমারও তেমনি।

থাক। পাছাপেড়ের যদি এত সখ তবে আর একটা বিয়ে করে ফেলনা, কত পাছাপাড় দিতে পার দিও।

ঈশ্বর। আমরা বামুনের ছেলে বিয়ে আর করতে হবে কেন—"গঙ্গে চ যমুনেচৈব" জল শুদ্ধির মন্ত্র আউড়িয়ে তোমাকেই ষোল বছুরী করে নিতে পারি।

থাক। কি বকো,—ওঘরে কিরণ পান সাজ্‌চে, কি মনে কর্‌বে।

কিরণ জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম।

ঈশ্বর। আহা তা বলে আমি দিন রাত মুখ বুজে বসে থাকি।

এমন সময় কন্যাটী পান লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। থাক মণিও বুকের কাপড়টা একটু টানিলেন। ঈশ্বর বাবু তখন কন্যার সঙ্গে দুই একটা কথা কহিয়াই আহার শেষ করিলেন।

তখন তাড়াতাড়ি মাষ্টারী পোষাক পরিয়া বাবু স্কুলে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। পান ভাল চিবান হইল না, তামাক ভাল করিয়া টানা হইল না, কিন্তু ঈশ্বর বাবু স্কুলে চলিলেন। আজ বেলা কিছু বেশী হইয়াছে। হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছেন, এমন সময় একস্থান হইতে চড়াৎ করিয়া কি ছাতার উপর পড়িল। ঈশ্বর বাবু উঁচু পানে আকাশের দিকে চাহিলেন, কিন্তু কিছু দেখিতে পাইলেন না। স্কুলের ফেরত বাসায় আসিয়া ঝিকে বলিলেন "আমার ছাতাটা ধুয়ে দিস্‌তো, কাগে বুঝি হেগেছে।"

ঝি ছাতাটী উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল কোথাও কিছু নাই। বলিল "কই গো কিছু ত নাই।"

ঈশ্বর। আঃ কি বিপদ, আছে বই কি।

এই বলিয়া নিজে ছাতাটী খুলিয়া চশমাটী মুছিয়া ভাল করিয়া পরিয়া দেখিলেন, কিন্তু কই কিছুই ত নাই। তখন মনে মনে বলিলেন তাই ত হলো কি। ঈশ্বর বাবুর Science পড়া ভাল না থাকিলেও ভাবিলেন কাকের বিষ্ঠায় Albumen আছে Starchও আছে, Calcicum আছে, সূর্য্যের কত degree heatএ সে সব উপে যেতে পারে কাল তা ঠিক কর্‌চি।

ঝিকে বলিলেন "সে সব শুকিয়ে গেছে, যাই হোক্ তুই ধুয়ে দিস্।"

ঝি তাহাই করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পোষা কাক।

তাহার পরদিন স্কুল যাইবার পথে, ঠিক সেই স্থানে আবার চড়াৎ করিয়া কি ছাতার উপর পড়িল। ঈশ্বর বাবু অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন "পোষা কাক নাকি?"

দোতালার জানালা হইতে কে উত্তর দিল "এই যে দাঁড়ে বসে।"

"কেহে?" এই কথা বলিয়া ঈশ্বর বাবু উপর দিকে চাহিয়া দেখেন বড় কেহ নয়। একটী অষ্টাদশ বর্ষীয়া সুন্দরী যুবতী উন্মুক্ত বাতায়ন পথে দণ্ডায়মানা। বুকের মাঝখানে জানেলায় একটী রেল অবস্থিত। আর তাহারই দুই পার্শ্ব দিয়া পীবরস্তনির কুচযুগল ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। পরণের কালাপেড়ে কাপড়ের পাড় দক্ষিণ কুচের উপর দিয়া বাম স্তনটীতে বেষ্টন করিয়াছে। মস্তকে অবগুণ্ঠন না থাকায় ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম চতুর্দ্দিকে এলাইয়া পড়িয়াছে। যুবতী সেই চাঁদপানা মুখখানি ঈষৎ স্ফুরিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে একটী পান লইয়া ঈশ্বর বাবুকে দেখাইলেন। কিন্তু ঈশ্বর বাবু স্বীয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিব বলে দেখিলেন যুবতী মুখে একখানি লাল রুমাল গুঁজিয়া তাঁহাকে কিল দেখাইতেছে। তিনি শশব্যস্ত হইলেন। পথটী নির্জ্জন হইলেও এদিক ওদিক দেখিলেন—কেহ কোথাও নাই। তথাপি আর চাহিতে পারিলেন না! ইচ্ছা দেখেন, আরও দুটো কথা কন, কিন্তু পারিলেন না। চলিযা গেলেন। আমরা শুনিয়াছি সে দিন স্কুলে আদৌ পড়ান নাই—মাথা ধরিয়াছে বলিয়া বসিয়া ছিলেন, আর ভাবিয়া ছিলেন "ব্যাপার কি?"

স্কুলের ছুটীর পর আবার সেই পথ দিয়া বাটী চলিলেন। কই সে জানেলা কই? ঐ যে—আর যাহার জন্য জানেলার অনুসন্ধান তিনি ঐ যে দাঁড়াইয়া। বুকটা কেমন দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল, মুখটা কেমন শুকাইয়া আসিল। কোন ডাক্তার সে সময় হাত দেখিলে বোধ হয় বলিতেন একটু জ্বর হইয়াছে।

ঈশ্বর বাবু বাটীর সম্মুখীন হইবা মাত্র একটী ঝি সেই বাটী হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল "বাবু একবার এদিকে আসুন।"

ঈশ্বর। কেন বল দেখি?

ঝি। মা আপনাকে ডাকৃচেন।

ঈশ্বর। তিনি কে?

ঝি। আপনার বেয়ান হন।

ঈশ্বর! বেয়ান?

ঝি। হ্যাঁ বেয়ান।

ঈশ্বর বাবু ছাতা মুড়িলেন। ঝিএর সঙ্গে উপরে গেলেন। তখন যে

গবাক্ষ দ্বারে যুবতী দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইলেন।

কক্ষটী বেশ প্রশস্ত। দেয়ালে অনেকগুলি সুন্দর আলেখ্য। একটী ব্র্যাকেটে সেথটমাসের কোয়াটার আওয়াজ বাজা ক্লক টুক্ টাক্ করিতেছে, তাহার অপর তিন দিকে আর তিনটী ব্র্যাকেটে লক্ষ্ণৌ ও কৃষ্ণনগরের সুন্দর সুন্দর মৃন্ময় পুত্তলিকা শোভমান। দেয়ালের এক পার্শ্বে একটী বৃহদাকারের সুন্দর মুকুব, তাহারই অপর পার্শ্বে মেহগ্নির ওয়াডরোব। ওয়াডরোবটীর উপর অনেকগুলি পোর্সিলানের পুতুল, নানাবিধ বিলাতি খেলনা শোভা পাইতেছে। গৃহের একপার্শ্বে একটী সুন্দর পিতলের খাট, তাহাতে তারেব গদি, তদুপরে দুগ্ধফেননিভ সুন্দর শয্যা সুবিস্তৃত। ঘরের এক পার্শ্বে খান কতক কুশন টায়ার চেয়ার ও দ্বারের সম্মুখে একখানি কন-ভার্সি শোভা বিরাজমান। ঘরটী যেমন সুন্দর ভাবে সাজান তেমনি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন।

তখন যুবতী সমাদরে ঈশ্বর বাবুকে শোফায় বসাইয়া আড় নয়নে একটী কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন "বলি ভাল আছ ত বেয়াই?"

বেয়াই তখন কিছু অন্যমনা হইয়াছিলেন, কিন্তু তবু বলিলেন "ব্যাপা-রটা কি বলুন দেখি।"

যুবতী। "বলুন" দেখি বল্‌লে ত কথা কবো না।

ঈশ্বর। আচ্ছা না হয় "বল।"

এমন সময় ঝি গুড়্ গুড়ি করিয়া ফৌজদারি বালাখানার সুগন্ধি তামাকু সাজিয়া আনিয়া রূপাব মুখ-নলটী বাবুর উদ্দেশে তুলিয়া ধরিল। বাবু নলটী ধরিলেন বটে, কিন্তু তখনও টানিলেন না। যুবতী আবার বলিলেন "খাওনা, ও তোমার বেয়াইএর খাস্ গুড়্গুড়ি।"

ঈশ্বর বাবু ত টান দিলেন। সেই সর্ব্ব-সন্তাপহারিণী, সেই-সর্ব্ব দুঃখ বিনাশিনী সেই সর্ব্ব-মঙ্গল-বিধায়িনী তামাকু দেবীর অর্চ্চনায় নিরত হই-লেন। তখন শটকা যেন বলিতেছে যে, আমি তোমার গালভরা ধোঁয়া দিলাম, প্রাণ পোরা শান্তি দিলাম, মাথা পোরা বুদ্ধি দিলাম, তোমার কত ভাবনা নষ্ট করিলাম। আমার তবে সেই ললিত-লবঙ্গ-লতা-সম কুণ্ডলীকৃত দেহের শ্রীমুখ পঙ্কজ-চুম্বন করিতে এত বিলম্ব করিলে কেন? ঈশ্বর বাবু যেন ত্রস্তভাবে বলিলেন "এই যে, এই যে তোমার চাঁদমুখে মুখ দিয়াই ত আছি।" আমরা বলি ঈশ্বর বাবু আর কেন তুমি এখন প্রাণ পুরিয়া তামাকু খাও।

আর নয়ন ভরিয়া নূতন বেয়ানকে দেখ,—কিন্তু দেখো যেন হৃদয় হারাইও না, যাহাকে ভালবাস তাহাকে ভুলিও না।

তখন ঈশ্বর বাবু যুবতীকে আবার বলিলেন "ব্যাপার কি বল না।"

যুবতী। দেখ দেখি বেয়াই, আমায় আর কখন দেখেছিলে কিনা?

এই বলিয়া যুবতী মুখটী অল্প সরাইয়া আনিলেন। ঈশ্বর বাবু বিপদে পড়িলেন, বলিলেন "না।"

যুবতী। ঠুলি খুলে দেখ দেখি।

ঈশ্বর। তা হলে আর কিছুই দেখ্‌তে পাবনা।

যুবতী। আচ্ছা খানিক ভাব না।

ঈশ্বর। কই ভেবে ত কিছু পাইনা।

যুবতী। তবে তুমি বদ্ রসিক।

ঈশ্বর বাবু দেখিলেন যুবতীর সীমন্তে সিন্দুর, বলিলেন "বেয়াই কোথায়?"

যুবতী। আগে আমার কাছে পাশ হও, তবে বেয়াই দেখাব; এখন বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি।

ঈশ্বর। বল ত খুঁজে দেখি।

যুবতী হাসিয়া বলিলেন "তবে আর বদ্ রসিক কিসে?"

ঈশ্বর বাবু বলিলেন "তা যা বল—আমার কিন্তু ভারি বেয়ান মিলেছে।"

যুবতী। মনের মতন বটে ত।

ঈশ্বর। তা আর বলতে।

যুবতী। তবে পরিচয়টা দি।

ঈশ্বর। হ্যাঁ,—তা হলেই চূড়ান্ত হয়।

যুবতী। আমাদের বাড়ী কামার পুকুর।

ঈশ্বর। সেখানে যে আমার বেয়াই বাড়ি।

যুবতী চক্ষু দুটী ঘুরাইয়া, মুখখানি নাড়িয়া বলিলেন "আমিও যে তোমার বেয়ান।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পাপের পরিণাম।

ঈশ্বর বাবু ঠিক কিছু বুঝিলেন না, যুবতীও কিছু ভাঙ্গিয়া বলিলেন না। সে দিন সোমবার, শনিবার সন্ধ্যার সময় আসিয়া বেয়াইএর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া গেলে যুবতীর হাসি খুসী বন্ধ হইল। ক্ষণেক কি চিন্তা করিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস বুঝি সুন্দর কুৎসিত বাছেনা, ধনি নির্ধন মানেনা। তখন যুবতী খাটের উপর শয়ন করিয়া আবার কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় সেই কক্ষ মধ্যে একটী যুবক প্রবেশ করিলেন। যুবতী তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। যেন অভিমান ভরে বসিয়া রহিলেন।

পাঠক এই সময় একবার যুবক যুবতীর পরিচয় দেওয়া উচিত হইতেছে, যুবতীটী আপনার পূর্ব্ব পরিচিতা রাঙ্গা-বৌ এবং যুবকটী বিনোদবিহারী। রাঙ্গা বৌএর এখন নাম হইয়াছে "হরিমতী" সুতরাং এখন হইতে তাহাকে হরিমতিই বলিব।

এখনও ছয় মাস পূর্ণ হয় নাই, ইহারই মধ্যে বিনোদ পালাই পালাই করিতেছে। পূর্ব্বে সপ্তাহে এক আধ দিন বাটী যাইত, কিন্তু এখন সপ্তাহান্তেও একদিন আসা হয় না। আজ ১২ দিন পরে বিনোদ আসিল। সেই প্রথম দিনের দত্ত দশটী হাজার টাকার আর এক পয়সাও নাই। নানাছলে সে টাকা গুলি কতক খরচ করা হইয়াছে, কতক লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এখন সে হরিমতীর চলে কিসে বিনোদ তাহাও ভাবেনা। কাল টাকা লইয়া আসিব বলিয়া আজ ১২ দিন পরে আসিল।

হরিমতীর রূপ আর বিনোদের নয়ন মুগ্ধ করেনা, যে স্ত্রী একদিন ভাল লাগিত না, যে স্ত্রীকে ফেলিয়া একদিন হরিমতীর চরণ পূজায় নিরত ছিল, এখন সেই স্ত্রীই হৃদয়রাজ্যে ধীরে ধীরে অধিকার বিস্তার করিয়া বসিয়াছেন। বন্যা যেমন ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠে, নদী যেমন অল্পে অল্পে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া শেষে কুল পরিপ্লাবিনী হয়, আজি স্ত্রীর প্রেম তেমনি করিয়া বিনোদের হৃদয় অধিকার করিয়াছে। বিনোদ এখন হরিমতীকে ছাড়িতে পারিলে

বাঁচে, দিন কতক পূর্ব্বে ভাবিত "কেমন করিয়া ছাড়ি, কি বলিবে," এখন মনে হইতেছে "ও কে? ওকে ছাড়ার আর বিচিত্র কি?" পূর্ব্বে মনে করিত "ছাড়িলেও মাসে মাসে কিছু দিতে হইবে, না দিলে ধর্ম্ম থাকে না এখন মনে হইতেছে "যে আমায়-আমার স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হইতে দেয় নাই, তাহার কি মুখ দেখিতে আছে। যে আপনার স্বামী পুত্র ত্যাগ করিতে পারে সে না করিতে পারে কি? তাহার সহিতও আলাপ রাখিতে আছে, তাহাকেও সাহায্য করিতে আছে?"

বিনোদ বলিল "দেখ আমার মান ভাঙ্গিবার সময় নাই—আমার কথা শোন।"

কথা গুলি হরিমতীর প্রাণে বড় লাগিল কিন্তু কি করিবে, বলিল "কি বল্‌ছ?"

বিনোদ। অনেকদিন থেকে বলি বলি মনে করি, কিন্তু বলা হয় নাই। আজ শোন।

হরি। বল।

বিনোদ। আমার স্ত্রী বাড়ি থেকে বেরুলে বড় হেঙ্গাম করে—তাই আমি আস্‌তে পারিনা।

হরি। এতদিন ত এ কথা বলিতে শুনিনি।

বিনোদ। এখন শোন।

হরি। শুনে আর কি হবে?

বিনোদ। উপায় স্থির কর।

হরি। সে তোমার হাতে।

বিনোদ। আমার আর উপায় নাই, উপায় থাক্‌লে কর্‌তাম।

হরি। আমি ত জানি শেষ এই হবে—সেই জন্যেই ত আস্‌তে চাইনি।

বিনোদ। তবে এলে কেন?

হরি। তোমার কথায় বিশ্বাস করে।

বিনোদ। আমার তখন মাথার ঠিক ছিলনা।

হরি। এখন হয়েছে ত?

বিনোদ। হয়েছে, তাই ত বল্‌চি আমার আর আসা হবে না।

হরিমতী বিস্মিত ভাবে বলিলেন "বল কি বিনোদ?"

বিনোদ। ঠিকই বল্‌ছি।

হরিমতী স্তম্ভিত ভাবে বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চক্ষে জল আসিল—বিনোদ তাহা পাছে দেখিতে পায় বলিয়া মেজের দিকে চাহিয়া বলিল "তবে আমি কি করবো?"

বিনোদ। যা ভাল বোঝ।

হরি। আমার আর বোঝ্‌বার ত কিছুই নেই।

বিনোদ। আমার ভাই উপায় নেই—থাক্‌লে বলতাম না। আর তুমি কি আমার স্ত্রীকে ত্যাগ কর্‌তে বল?

হরিমতী তীব্র দৃষ্টে তাহার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন "বলি, বল্‌বার অধিকারও আছে, তুমি আমাব স্বামী পুত্র ছাড়ায়েছ জাননা।"

বিনোদ সে কথায় উপহাস্ সহকারে বলিল "তুমি কচি খুকি নও, লম্পটের কথায় বিশ্বাস কর্‌লে কেন?"

হরিমতী আবার অর্দ্ধ দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। বলিলেন, "সে সব কথা থাক, এখন কি কর্‌বে, ভেঙ্গে চুরে বল দেখি।"

বিনোদ। আমি আর আস্‌বোনা।

হরি। একবারে না।

বিনোদ। না।

হরি। মাসান্তে?

বিনোদ। তাও না।

হরি। তবে কত দিন পরে আস্‌বার সুবিধা হবে?

বিনোদ। সুবিধা অসুবিধা কি, একবারে নয়।

হরিমতী অবাক্ হইয়া বলিলেন "বল কি বিনোদ?"

বিনোদ গম্ভীর ভাবে বলিল "তাই ত বল্‌ছি।"

হরি। আমার যে সর্ব্বনাশ করা হবে।

বিনোদ। উপায় থাক্‌লে কর্‌তাম না।

হরিমতী আর থাকিতে পারিলেন না। কাঁদিয়া ফেলিলেন। বিনোদ তখন বলিল "কেঁদনা, কেঁদে ফল নেই—আমার যে, কথা সেই কাজ। আমার আশা একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে।"

হরি। এই কি আমার ভালবাসার পরিণাম?

বিনোদ। তোমার ভালবাসা ছিল কি?

হরি। বল, কিন্তু ঈশ্বর আছেন।

বিনোদ। তিনি থাকুন, কিন্তু আমি আবার বল্‌ছি তোমার ভালবাসা ছিলনা।

হরি। কেন?

বিনোদ। মনে কর দেখি, সেই—কামার পুকুরে যে দিন তোমায় আস্‌তে বলি তখন কি বলেছিলে? মনে হয় কি? আমি ৮৲টাকার চাক্‌রে সখের প্রাণ নিয়ে আমার সঙ্গে কষ্ট কর্‌বে কেন।

হরি। তা বলেছিলাম, কিন্তু সব ছেড়ে এসেছি ত?

বিনোদ। সে অর্থ লোভে—১০ হাজার টাকার মায়ায়। ভালবাসার জন্য নয়।—টাকায় তোমায় কিনে ছিলাম' কেনা জিনিষ যখন ইচ্ছা নষ্ট করা যায়। তুমি আমায় কেন নাই, আমিই তোমায় কিনে ছিলাম।

হরিমতী অধোবদন হইয়া রহিলেন। ক্ষণেক কোন কথা কহিতে পারিলেন না। তাহার পর বলিলেন "সে যা হবার তাত হয়েছে। সে টাকা আর নাই—আর সে কথা কেন?"

বিনোদ। টাকা ত তোমায় দিয়েছিলাম।

হরি। আবার নিয়েছ।

বিনোদ। তুমি না দিলেই পার্‌তে।

হরি। তখন এতটা ভাবিনি।

বিনোদ। যে না ভাবে তারই এই দশা।

হরি। এখন আমায় কি কর্‌তে বল?

বিনোদ। তোমায় কিছুই বলি না—বল্‌বার অধিকারও নেই—নিজের কথাই বল্‌তে এসেছি।

হরি। আমি কাশী যাব।

বিনোদ। সচ্ছন্দে।

হরি। কত মাসহারা দেবে?

বিনোদ। মাসহারা দেবার সামর্থ আমার নেই।

হরি। তবে আমি খাব কি?

বিনোদ। বয়েস আছে, উপায় করে, খাবে।

হরিমতীর চক্ষু জলিয়া উঠিল—বলিলেন "তোমা ছাড়া আর কাকেও স্পর্শ করি নাই, কর্‌বার প্রবৃত্তিও হয়নি। তুমি অস্পৃশ্য কিন্তু স্পর্শের

ফল ভুগ্‌ছি। জানিনা কি কুক্ষণে তোমায় দেখি, তোমার কুহকে মজি। তার পূর্ব্বে সংসার আমার ছিল, আমি সংসারের ছিলাম। তুমি আমার জীবনে নূতন করে ভালবাসার ছায়াবাজি দেখালে। উপন্যাসের নায়ক নায়িকার প্রেমের অলীক ছায়া দেখালে, আমায় মজালে। আমার স্বামীর নানা দোষের কথা বলে তাঁহার প্রতি আমার অভক্তি জন্মালে। আমি যে মহাপাপ করেছি, তার শাস্তি পাবনা।

বিনোদ। তবে আর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে অনুতাপ কেন?

হরি। বুঝ্‌তে পারিনা বলে। এখানকার দেনার কি হবে।

বিনোদ। তুমি জান।

হরি। আমি জানি? তুমি জান না।

বিনোদ। কিছু না।

হরি। আমার যে সব গহনা নিয়েছ তার কি কর্‌বে?

বিনোদ। দিয়েছিলাম নিয়েছি—তার আবার কথা কি?

হরি। আমার পূর্ব্বেকারও যে অনেক গহনা নিয়েছ।

বিনোদ। না দিলে নিতাম না।

হরি। আচ্ছা যাও, আমার কপালে যা আছে তাই হবে।

বিনোদ। বুদ্ধির কথা বটে—ঘরে যে জিনিস পত্র আছে সে সব আমি নিয়ে যাব।

হরি। কেন?

বিনোদ। ও সব আমার।

হরি। আমি কোথায় থাক্‌বো?

বিনোদ। সে কথা তোমার চিন্তার বিষয়, আমার নয়।

হরি। এখনও তুমি আমার হাতে তা জান?

বিনোদ। কিসে?

হরি। বিবাহিতা স্ত্রীর ধর্ম্মনাশে জেল আছে জান?

বিনোদ। জানি, তার কি হবে?

হরি। আমি তোমায় জেল দিতে পারি?

বিনোদ। সে ক্ষমতা তোমার নাই।

হরি। তবে কার?

বিনোদ। তোমার স্বামীর।

হরি। তাঁকে দিয়ে করাব।

বিনোদ। সে জানে তুমি মরে গেছ,—এ কথা জান্‌লে সে আগে তোমায় কাট্‌বে—তার পর অন্য কথা।

হরি। সে হাতে মলেও আমার স্বর্গ হবে।

বিনোদ বিদ্রূপ করিয়া বলিল "ইস্‌, বড় যে পতি ভক্তি।"

হরি। সে কথায় তোমার দরকার কি,—এখন কি কর্‌বে তাই কর।

বিনোদ। জিনিস পত্র সব নিয়ে যাব।

হরি। এখুনি। কিন্তু জেনে রেখো তোমাব চির শত্রু বেঁচে রহিল। তোমার রক্তে তর্পণ ভিন্ন হৃদয়ে শান্তি নেই।

বিনোদ তাহার উত্তর না দিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিলেন মাত্র। তাহার ইঙ্গিতে সমভিব্যাহারী বেহারা কুলি ডাকিয়া খাট্‌ ছবি আল্‌মারি প্রভৃতি যে সমস্ত মূল্যবান দ্রব্য ছিল লইয়া গেল। তখন হরিমতী গম্ভীর ভাবে বলিল "তুমিও যাও।"

বিনোদ তাহাব কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। একবার হরিমতীর দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। তখন হবিমতী ঝিকে বলিল "আমিও ২।৩ দিন মধ্যে যাব, যে পর্য্যন্ত না যাই আমার কাছে থাক। ঘরে যা কিছু রইল সব তোমার।"

ঝি। ঘরে আর আছে কি মা?

হরি। বাক্স, পেট্‌রা, মাদুর, বিছানা আর কি?

ঝি। দেনা পত্র যা আছে?

হরি। তার জন্য গায়ের গহনা আছে।

হরিমতী এতদিন আপনাকে বিনোদের পরিণীতা স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিত। ঝি কিছু দিন তাহা বিশ্বাস করিয়াছিল, কিন্তু আর করে নাই। আজি বলিল "তোমার গহনা বেচা কেন?"

হরি। কি করব?

ঝি। আমি বাবু এনে দেবো।

হরিমতীর প্রাণে বড় ব্যথা লাগিল, স্বামী পুত্রকে মনে পড়িল, বলিল "আমি সে আশায় ঘরের বার হইনি।"

ঝি। আমরাই কি হয়েছিলাম মা, শেষ দাসীবৃত্তিও কর্‌ছি।

হরিমতী শিহরিল, বলিল "আমি তা কর্‌বো না, কপালে যা থাকে হবে।"

কিন্তু তখন বিনোদের ঘৃণিত ব্যবহার মনে পড়িল, শরীর কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষু আরক্তিম হইল, বলিলেন "কি সয়তান—এর সাজা তোমায় নিতেই হবে।"

ঝি মনে মনে হাসিয়া বলিল "ও সব কথা আর কেন, কেউ কখন এ সবে ঠিক থাকেনা, উনি বলে নয়।"

হরি। আমি ব্রাহ্মণ কন্যা—আমার সোনার সংসার।

ঝি। একবার চৌকাট পার হলে আর হাড়ী বামন নেই মা।

হরিমতী একবার কট্‌মট্‌ করিয়া ঝিএর দিকে তাকাইল, ঝি সরিয়া গেল। তখন তিনি সেই ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়া প্রাণ পুরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামীর সেই অসীম ভালবাসা—সেই সুখের সংসার—সকলের উপর আর এক কথা—সতীশের সেই প্রাণভরা হাসি, তাহার সেই মধুমাখা "মা" বাণি। হায় আজ যে বুদ্ধি দোষে সে সব অলীক স্বপ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সব গেল।

অনেক আশা করিয়া হরিমতী ঈশ্বর বাবুকে বেয়াই বলিয়া ছিল। তাঁহার বড় ভগ্নীর শ্বশুরালয় কামার পুকুর। কোন কর্ম্মোপলক্ষে সেইখানে হরিমতি ঈশ্বর বাবুকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয় পোরা আনন্দ—বদন ভরা কৌতুক একদিন বড় ভাল লাগিয়াছিল। কলিকাতায় তাঁহাকে দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন একা থাকি বাহিরের লোক কেহ আসেনা, ঈশ্বরের সহিত একটা সম্বন্ধের ভাণ করিয়া সেই প্রাণভরা রসালাপের সুখ-স্রোতে ভাসিব। মনে মনে আরও কোন আশা ছিল কি না, তাহা কি করিয়া বলিব?

ঈশ্বরকে কি একদিনও আমার করিয়া তুলিতে পারিব না। এ চিন্তা সে পাপিষ্ঠার হৃদয়ে জাগিয়া ছিল কি না জানিনা। পাপিষ্ঠার সকল কার্য্যেই আমরা পাপের ছায়া দেখিতে পাই, তাই ও কথা বলিলাম নতুবা বলিতাম না। ফলে—হরিমতী ঈশ্বর বাবুকে ভালবাসিয়া ছিল, যে ভাবেই হউক তাঁহার কথাবার্ত্তা যেন কেমন মধুর বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাই হরিমতী ঈশ্বরকে ডাকাইয়া ছিলেন। বিনোদ আর প্রত্যহ আসেনা, দিন আর কাটেনা,—এ সময় ঈশ্বরের মত একটা লোকের সঙ্গে দুদণ্ড

কথাবার্ত্তা কহিতে পারিলে সে কি সুখের কথা নয়? কিন্তু আশা পুরিল না,—অকস্মাৎ ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে, কত আশার আশা-তরু নির্ম্মূল হইল। গড়িবার পূর্ব্বেই ঈশ্বর যে ভাঙ্গিয়া দিবেন, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

ঈশ্বর বাবুর সহিত সেই প্রথম দেখা, আজ তাহার দশটী দিন মাত্র অতীত হইয়াছে। যে দিন দিনের পর আসে দিনের পর যায়—যে দিন দেখিতে দেখিতে ফুরায়—সেই দিনের দশটী মাত্র দিন বহিয়া গিয়াছে কিন্তু হরিমতীর অবস্থা দেখ!

হরিমতী হাতের অলঙ্কার খুলিয়াছে, সাদা কাপড় পরিয়াছে। বিধবা সাজে সাজিয়াছে। তাহার সে হাসি খুসী আর নাই।

ঝি আজ আবার ঈশ্বর বাবুকে ডাকিয়া আনিল। পথে বলিয়াছে বাবু হঠাৎ মারা গিয়াছেন। ঈশ্বরের দুঃখ—আহা তেমন বেয়ানও বিধবা হইল!

আজি ঈশ্বর বাবুকে দেখিয়া হরিমতীর নয়ন উথলিল, ক্রন্দন স্রোত প্রবল বেগে বহিল। বিনোদের জন্য নয়, আপনার অবস্থা স্মরণ করিয়া। কিন্তু ঈশ্বর বাবু অন্যরূপ বুঝিলেন—তাই বুঝানও হইল। বস্তুতঃ তিনিও বিমর্ষ হইলেন। তখন হরিমতী বলিলেন "আমার ত সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

ঈশ্বর। তাই ত শুনিলাম। আজ ক দিন?

হরি। কাল গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ করে এলাম, আর দুই একটী ব্রাহ্মণ খাইয়ে শুদ্ধ হ'লাম।

ঈশ্বর। তা বেশ করেছেন।

হরি। না করে উপায় নেই। ঘরের জিনিস পত্র বেচে তাই সমাধা হল। চল্‌বার সংস্থান কিছু মাত্র নাই।

ঈশ্বর। বড়ই দুঃখের বিষয়।

হরি। আপনাকে একটী উপকার কর্‌তে হবে।

ঈশ্বর। বলুন।

হরি। আমারে খান কতক গহনা বেচে এনে দিতে হবে। বাড়ি ভাড়া ইত্যাদির দেনা মিটাবো।

ঈশ্বর। দেবো।

হরি। তবে নিয়ে যান।

এই বলিয়া হরিমতী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একছড়া সোনার

হার ও গোট আনিয়া দিলেন। ঈশ্বর বাবু গহনা দুটী লইয়া বিদায় হইলেন। হরিমতীর এই আকস্মিক বিপদে ঈশ্বর বাবু বড়ই মর্ম্ম পীড়িত। দূর হইলেও একটা সম্পর্ক ত হইয়াছিল, তাহার উপর তেমন বেঞান কি হইয়া গিয়াছে! যেন প্রচণ্ড অগ্নিশিখা কে জল দিয়া নিবাইয়াছে। ঈশ্বর একদিন হরিমতীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ছিলেন, কিন্তু আজ তাহার কথাবার্ত্তা ও ভাব ভঙ্গি দেখিয়া বুঝিলেন হরিমতী দেবী ভাবাপন্ন রমণী,—হরিমতী আদর্শ হিন্দুমহিলা।

গহনা গুলি সাত শত টাকায় বিক্রয় হইল। দেনা পরিশোধ করিয়াও হাতে প্রায় তিন শত টাকা রহিল। পরদিন প্রাতে ঈশ্বর বাবু আবার আসিলেন বলিলেন "বাটী যাইবেন কি?"

হরি। বাটী আর কি আছে, চিরকাল বিদেশে।

ঈশ্বর। আত্মীয় স্বজন?

হরি। কেহ নাই।

ঈশ্বর। আমার বেয়াইরা?

হরি। দূর সম্পর্ক,—হয়ত স্মরণও নাই—বিশেষতঃ এ দুঃসময়ে লোকের কাছে নূতন করিয়া পরিচয় দিতে নাই।

ঈশ্বর। কি করিবেন?

হরি। আমার একটা চাকরী করিয়া দিতে পারেন আমার সামর্থ আছে রাঁধিতে পারি।

ঈশ্বর। তত কষ্ট করিতে পারিবেন।

হরি। কেন পারিব না। পেট ত চালান চাই।

ঈশ্বর হরিমতীর ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের মনে মনে প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন "চেষ্টা করিলে পারিব বই কি।"

ঈশ্বর বাবু কথা রাখিলেন, রামজীবনপুরে তাঁহার একটী বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা জাতিতে গন্ধবণিক। সেই স্থানে হরিমতীর চাকরী করিয়া দিলেন। তাঁহারা খোরাক পোষাক ৩৲ টাকা বেতন দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তিনি বেতন লইতে অস্বীকার করিলেন। হরিমতী রামজীবনপুরে দিননাথ হাল্‌দারের অন্তঃপুরে পাচিকা রূপে স্থান পাইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অন্নপূর্ণা পূজা।

আজ অনি পিসীর বাটিতে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল। শানাই বাজিল "ও মা দিগম্বরী নাচ গো।" পাড়ার মণ্ডল ও পঞ্চায়েৎ মহাশয় নন্দি ভৃঙ্গিসহ আসিয়া সর্‌গরম করিলেন। ছোট ছেলেরা নাচিতে আরম্ভ করিল, অনি পিসী গাছ কোমর বাঁধিয়া এ ঘর ও ঘর করিতেছে, গৌরীও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে, আজ বাটিতে অন্নপূর্ণা পূজা।

পূজার ধূমধাম আয়োজন হইতেছে। এক বস্তা জাঁতায় ভাঙ্গা ময়দা আসিয়াছে, তাহা সাতবার ছেঁকিলেও বালি কিচ্ কিচ্ করিতে থাকে। দুর্গন্ধ যুক্ত ঘৃত আসিয়াছে, বিনা ময়ানে সেই ময়দার মোটা মোটা লুচি ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ঠাকুর ব্রাহ্মণ উভয়েরই চলিবে। এদেশে সন্দেশ রসগোল্লার চলন নাই, তাই বুঝি অভাবে দেবতাও লোলুপ হইয়া অখাদ্য মিঠাইকে সুখাদ্য করিয়া তুলিয়াছেন!

উপকরণের মধ্যে বিচিযুক্ত কাঁঠালি কলা, পাকাশশা ও ছোলা ভিজান উপস্থিত। আজি তসর কাপড় পরিয়া গৌরী শশব্যস্তে নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে অগ্রসর, কিন্তু পিসি বলিল "যাস্‌নে যাস্‌নে,—বৌ যাস্‌নে।"

গৌরী সবিস্ময়ে বলিল "কেন ঠাকুরঝি ?"

অনি। কেন, সে কথায় কাজ কি।

গৌরী। আমার বড় সাধ ঠাকুরদের কর্‌না কর্‌তে।

অনি। না—তা হবেনা।

গৌরী মুখটী চুনপানা করিয়া আবার বলিল "ঠাকুরঝি—কি বল ?"

অনি। না—তা হবেনা।

গৌরী। কেন ঠাকুরঝি ?

অনি। কেন জানিস্‌নে, মুখ ফুটে বলাই বুঝি ভাল।

গৌরী। আমি ত কিছু জানিনে।

অনি। আমি তোকে আর হাঁড়ি ছুঁতে দিইনে, আর ঠাকুর্‌দের জিনিস্ ছুঁবি।

গৌরী। তাত আমি জানিনে তুমি বল আগুণ তাতে গেলে অসুখ কর্‌বে ছেলে হবেনা—বাজা হবি, তাইত রাঁধিনে।

অনি। তাই বই কি!

গৌরী। তবে কি?

অনি। আমার মাথা আর মুণ্ড,—কৃষ্ণনগরের সে ছোঁড়ারা কি তোর জাত রেখেছে, ঘরের কুচ্ছ গাইতে নেই তাই,—নইলে বল্‌তে কি।

গৌরী কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল "মা অন্নপূর্ণা জানেন যে আমি কোন দোষের দুষী নই।"

অনি। তুই যাই বলনা, আমার মন থেকে ও ধোকাও যাবেনা, আর তোর হাতেও খাবোনা।

গৌরী আর কোন কথা কহিল না, সমস্ত দিন মন মরা হইয়া রহিল। বৌএর আর আমোদ আহ্লাদ নাই—পাড়ার লোক বৌ এমন করে আছে কেন জিজ্ঞাসা কর্‌লে অনি অমনি বলে—"বৌএর শরীরটা ভাল নয়।"

পূজা ত হইয়া গেল, প্রতিমা জলে পড়িলেন, কোলাহলপূর্ণ গৃহ-প্রাঙ্গণ আবার নীরব হইল, তথন গৌরী রাত্রে স্বামীকে সকল কথা বলিয়া কাঁদিয়া ধরাতল ভাসাইল। ভোলানাথ স্তম্ভিত হইয়া বলিল "বল কি?"

গৌরী। আমি কি তোমার কাছে মিছে বল্‌ছি।

ভোলা। সেই পর্য্যন্ত তোমায় হাঁড়ি ছুঁতে দেয়নি?

গৌরী। না।

ভোলানাথ কি ভাবিতে লাগিল, নিশ্বাস যেন দ্বিগুণ জোরে বহিতে লাগিল, বদনের লালিত্য ঘুচিল, চক্ষের জ্যোতিঃ বাড়িয়া উঠিল, গৌরী বলিল "অমন কর কেন?"

ভোলানাথ কথা কহিল না।

গৌরী আবার বলিল "কি ভাব্‌চো।"

ভোলা। আমার মাথা আর মুণ্ডু।

গৌরী উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিল "তুমিও কি আমার উপর চট্‌লে।"

ভোলানাথ একটী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "না।"

গৌরী। তবে ভাব্‌চো কি?

ভোলা। আর এ সংসারে থাকা কিছু নয়।

গৌরী ভয় পাইয়া বলিল "সে আবার কি?"

ভোলা। এত সহ্য হয়না।

গৌরী। ও কথা বল্‌তে নেই—ঠাকুরঝি সব মানুষ করেছে। তবে ওর ব্যাভারের কথা তোমায় বল্‌লাম। তুমি কিছু বলোনা—বলে আর কি কর্‌বে, আমার আরও জ্বালা বাড়্‌বে বই ত নয়।

ভোলা। গৌরী, তুমি ঘরে থাক, আর আমি কিছুদিনের জন্য সংসারত্যাগী হই, দেখি যদি কিছু সংস্থান করিতে পারি, তা হলে আমার হাত পা-চল্‌বে। দিদির পয়সায় আর নয়।

গৌরী। ও কথা ভাব্‌তে আছে, সবই ত তোমারি। ঠাকুরঝির কথা-গুলাই কেমন কেমন।

ভোলানাথ আর কোন কথা না কহিয়া বিমর্ষভাবে চিন্তামগ্ন হইল। ভাবিল—"গৌরী ত মিথ্যা বলিবার লোক নয়, তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হইলে সে নিশ্চয় বলিত। আর যদি তাই না হইল তবে দিদি এত করে কেন? নিশ্চয় কিছু রহস্য আছে। যদি সত্যই হয়, গৌরীর দোষ কি? গৌরী ত তেমন নয়, কেহ অত্যাচার করিলে সে দোষ ত গৌরীর নয়।" আবার তখনি মনে হইল,—"না গৌরী সত্য হইলেও তুমি না বলিয়া ভাল করিয়াছ, তুমি নিজের প্রাণে তুষানল চাপিয়া রাখ কিন্তু আমাকে তাহার তাপ দেখাইওনা। গৌরী আমার পতিতা! বাপ্‌রে, সে কথা আমি সহ্য করিতে পারিব না।" ভোলানাথের চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল, গৌরী ভাবিল "বলিয়া কি পাপ করিলাম।" কুণ্ঠিতভাবে বলিল "তুমি কাঁদ্‌লে?"

ভোলানাথ। চক্ষের জল মুছিয়া বলিল "না।"

গৌরী স্বামীর বুকে আপনার মস্তকটী রাখিয়া, দক্ষিণ বাহু তাহার স্কন্ধদেশে স্থাপিত করিয়া সজলনেত্রে বলিল "আমার মাথা খাও বলো।"

ভোলা। গৌরী, কথা কি সত্যি?

গৌরী। সে কি গো।

গৌরী কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু ভোলানাথের মনের সন্দেহ ঘুচিল না। ভোলানাথ এতদিন একথা জানিত না, গৌরী কেন এ তুচ্ছ কথা শুনাইল?

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কথাটা কি ভাল হল?

গৌরী প্রকৃতই কাজটা ভাল করে নাই, সকল কথা প্রকাশ করিতে নাই, সত্যবাদীর সকল সময় জয় নাই। গৌরীর সরল প্রাণ—সরল কথাই বলিয়াছে, তাই বলিয়া সরল কথাই কি সকল সময় বলিতে হয়। মনের ভাব বুকে চাপিয়া যে হাসিমুখে কালকূট লুকাইয়া রাখিতে পারে, সংসারে সেই যশস্বী, আমরা সাংসারিক স্বার্থপরতায় দীক্ষিত হইয়া গৌরীর প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

গৌরী এতদিনে বুঝিয়াছে যে কথাটা বলা ভাল হয় নাই। ভোলানাথ কাহারও সঙ্গে আর ভাল করিয়া কথা কহেনা। অনির উপর যেন কত চটা। গৌরী ভাবে "ঠাকুরঝির উপর রাগ ত ভাল নয়—ঠাকুরঝি মুখে যাই বলুগ, বড় ভালবাসে, তার মনে কষ্ট দিলে হয় ত ভগবানের কাছে দুষী হতে হবে। যদি ভাল নাই বাসিত, তবু কি কিছু বলিতে আছে, দিদি যে গুরুজন, তার মনে কষ্ট দিতে আছে কি? নিশ্বাস ফেলিলে যে অমঙ্গল হয়।" কিন্তু উপায় কি,—ভোলানাথকে তুচ্ছ একটা কথা বলিয়া কি অন্যায় হইয়াছে। গৌরীর চরিত্রে যে তাহার সামান্য সন্দেহ জন্মিয়াছে তাহার জন্য গৌরীর তত দুঃখ নাই, গৌরী মনে মনে বলে "আমি ভাল কি মন্দ তা কৃষ্ণরায়ই জানেন, তার জন্যে ভাবিনা, ভাবি কেবল ঠাকুরঝির জন্যে। তার এই বয়েস, এখন যদি দুঃখ করে, কোন কথা বলে, তাহলে কি দুঃখ রাখ্‌বার স্থান আছে।" তার উপর চিন্তা ভোলানাথ বিবাগী হবেনা ত। আবার ভাবে "না না এ তুচ্ছ কথায় কি কেউ বিবাগী হয়।" কিন্তু মন তবু বুঝেনা।

গৌরী আজ কাল সদাই শঙ্কিতা, ঘুমের ঘোরে কতবার উঠিয়া দেখে ভোলানাথ শুইয়া আছে কি না, কিন্তু এত সতর্কতারও কোন ফল দর্শিল না। একদিন শেষ রাত্রে দেখিল ভোলানাথ ত শয্যায় নাই, গৌরীর বুক দমিয়া গেল, গা, হাত পা কাঁপিয়া উঠিল; মাথা ঘুরিতে লাগিল। উঠিতে পারে ত দাঁড়াইতে পারেনা, দাঁড়াইতে পারে ত চলিতে পারেনা, এই অবস্থায় অতিকষ্টে অনি পিসীর ঘরে যাইয়া ডাকিল "ঠাকুরঝি।"

অনি। কে রে?

গৌরী। আমি—

অনি। বৌ,—কেনগা?

গৌরী। একে যে দেখ্‌তে পাচ্চিনা।

অনি পিসী ঘরের বাহির হইয়া বলিল "সে আবার কি?"

দেখিল সদর দোয়ার খোলা, বলিল "মাঠে যায়নি ত?"

গৌরী চক্ষের জল মুছিয়া বলিল "সে সব নয়।"

অনি গৌরীর চক্ষে জল দেখিয়া হাড়ে হাড়ে চটিল, বলিল "ভোলা কি কচি ছেলে যে তার জন্যে কান্না হচ্চে। আমার ঘরে বাস করে আবার আমারি অমঙ্গল কর্‌ছিস্।"

গৌরী ভাবিল তাহার কি পোড়াকপাল, যে দিকে যায় সেইদিকেই দোষ। তথাপি বলিল "আমি সে জন্যে কঁদিনি।"

অনি। তবে ত সব জানিস্—তার আবার কান্না কি?—সোমত্ত বয়সে ছেলে পিলে অমন উঠে যায়, তা বলে কি কেঁদে হাট বসাতে হয়।

গৌরী তখন ভোলানাথের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিল, তাহাদের কথোপকথন প্রকাশ করিল। অনি তখন হাত নাড়িয়া চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল "তবে নাকি তুই নাগাস্‌নে। লাগা লাগা, ভাল করে লাগা, আমায় ঘর থেকে বার করে দিয়ে সুখে রাজ্যি কর।"

অনি ভয়ানক গোলমাল আরম্ভ করিল, পাড়ার লোক জাগিয়া উঠিল, ক্রমে আসিয়া জুটিল। অনি গৌরীর নানারূপ নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। ভোলানাথ যে সত্য সত্যই নিরুদ্দেশ হইবে একথা অনি তখন বিশ্বাস করে নাই।

অনি গ্রামস্থ একজনকে বলিল "তুমি খোঁজত, ভোলাকে নিয়ে এস, আর এ সংসারে থাক্‌বো, এখনি বার হবো।"

সকলেই ভোলাকে খুঁজিল কিন্তু কেহই দেখিতে পাইল না। পর দিবস আহারের সময় হইল, অনি রাঁধিয়াছে, ভোলা আসিয়া খাইবে কিন্তু ভোলা আসিল না। তখন অনি আর থাকিতে পারিল না, বিনাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। গৌরীও গোপনে চক্ষের জল মুছিল, কিন্তু তাহা অনির চক্ষুকে এড়াইতে পারিল না। অনি আপনি কাঁদুক কিন্তু গৌরীকে চক্ষের জল মুছিতে দেখিয়া রাগিয়া উঠিল, বলিল "আবার কান্না, চোখের জল ফেলে ফেলে আমার সোনার ভাইকে খোয়ালী, আমি কি সর্ব্বনাশীকে ঘরে এনেছিলাম রে।"

সে দিনও গেল, অনির যত রাগ গৌরীর উপর। গৌরী গোপন কথা ভোলাকে বলিল কেন?

অনির গঞ্জনায় গৌরী শশব্যস্ত হইয়া উঠিল, একে ত স্বামীর জন্য বিন্দু-মাত্রও সুখ নাই, তাহার উপর এ সকল বাক্যবাণ আর কত সহ্য হয়?

গৌরী সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একটী কলসী কাঁকে করিয়া বিমর্ষচিত্তে জল আনিতে চলিল। অনি মনে মনে ভাবিল "বৌএর মনের ঠিক নাই একলা যাইবে, সঙ্গে যাই" এই ভাবিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। গ্রামের একপ্রান্তে একটী পুষ্করিণী আছে, সেই জলই পানের জন্য ব্যবহৃত হয়। পুষ্করিণীটীর দক্ষিণদিকে নিবিড় বন, কিন্তু বহুদূর ব্যাপী নয়। গৌরীর মনে হইল ভোলা-নাথ ইহাঁর মধ্যে লুকাইয়া নাই ত? আস্তে আস্তে বনের দিকে গেল, উঁকি মারিয়া এদিক ওদিক দেখিতেছে, এমন সময় বৃক্ষের অন্তরাল হইতে তিনটী লোক বাহির হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

অনির তখন মাথা ঘুরিল, মনে হইল তবে ত ঠিক, সেই ছোঁড়ারা এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছে। বৌ তাহাদের কাছে যাইতেছিল, আমায় দেখিয়া তাহারা পলাইল। তখন মনে হইল হয় ত তাহাদের সাহায্যে ভোলানাথকে খুন করিয়া গুম্ করিয়াছে। তখন অনি বলিল "বৌ, এবার কি হয়?"

গৌরী ফিরিয়া দেখিল ঠাকুরঝি, বলিল "কি ঠাকুরঝি?"

অনি। তবে নাকি ছোঁড়ারা তোকে ধরেনি?

গৌরী। সে আবার কি?

অনি। সে আবার কি, নেকি—কিছু জানিসনে. বনের মধ্যে যাচ্ছিলি যে, কেন, কে তিনটে মিন্‌সে আমাকে দেখে পালাল?

গৌরী। আমি তার কিছু জানিনে।

অনি। তুই কোন্ কথা জানিস্, এখন বাজে কথা রাখ, আমার ভাই এনে দে, নইলে আজ তোর একদিন কি আমারই একদিন।

গৌরী। আমি কি লুকিয়ে রেখেছি ঠাকুরঝি?

অনি। ঐ ছোঁড়াদের দিয়ে খুন করেছিস্, তাকে কি আর রেখেছিস্।

অনি তখন মহা গোলমাল লাগাইল, পাড়ার লোককে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিল। সকলেই লোক তিনটিকে তাহাই ভাবিতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর চরিত্রে ঘোর সন্দেহ করিতে লাগিল।

ঊনাবিংশ পরিচ্ছেদ।

গৌরীর সর্ব্বনাশ।

নিরপরাধে কেহ কষ্ট পাইলে লোক ঈশ্বরে বিশ্বাস হীন হইয়া পড়ে, নাস্তিক হইয়া যায়। কিন্তু হিন্দু পরলোক মানে, পূর্ব্ব জন্ম মানে, তাই এ জন্মের সকল কষ্ট পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের দণ্ড ভাবিয়া আশ্বস্ত হয়, ঈশ্বরে আস্থা হারায় না; রাজার অন্যায় দণ্ডেও ধৈর্য্য চ্যুত হয় না। কিন্তু যে দেশে এভাব নাই, দৈবে বিশ্বাস নাই, জন্মের পর মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর জন্ম অবশ্যম্ভাবী বলিয়া জ্ঞান নাই, তাহারা জ্ঞান শূন্য হইয়া যায়। অশান্তির তাড়নায় দগ্ধ হয়।

সকল কার্য্য, বিশেষতঃ জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি, ভবিতব্যতা বলিয়া মানি। কোষ্ঠী দেখিয়া অদৃষ্ট গণনা করাই,—আমরা ঘোর অদৃষ্টবাদী, তাই আমাদের এত শান্তি,—এত সুখ! অদৃষ্টবাদী না হইলে আমরা আরও অসুখী হইতাম। প্রাচ্য দেশীয় স্বনামখ্যাতা "আনি বেশান্ত" এক কালে অদৃষ্টবাদিনী ছিলেন না, তাই তখন তিনি শান্তি হারাইয়া জগতের ভার কমাইবার জন্য কিসে সন্তানোৎপাদন বন্ধ হয়, গৃহীকে বহু পুত্রের পিতা হইয়া কষ্ট পাইতে না হয়, তাহারই চেষ্টায় প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সভ্য জগতে তাহারই নানা রূপ নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া ধন্যা হইয়াছিলেন, কিন্তু আজি আবার তাঁহারই মূলমন্ত্র "যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

চারিজন বাঁকুড়া দেশীয় লোক স্বদেশে যাইতেছিল। কিন্তু সহসা তাঁহাদের মধ্যে এক জনার অন্ত্রে ভয়ানক যন্ত্রণা উপস্থিত হওয়ায় তাহারা সেই নির্জ্জন বন মধ্যে বৃক্ষ ছায়ায় আশ্রয় লয়; কিন্তু অসীম যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া লোকটী দুই এক ঘণ্টা মধ্যেই মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া সেই যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পায়। লোকগুলির সঙ্গে এমন পয়সা ছিলনা যে মৃত সৎকার করে, সুতরাং সেই বন মধ্যে মৃত দেহ ফেলিয়া পলায়ন করাই স্থির করিল। তাহারা তৎকার্য্য সম্পাদনে উদ্যত এমন সময় গৌরীকে দেখিতে পাইল, গৌরীকে দেখিয়া তাহারা একটু লুকাইল। বনমধ্যে মৃত দেহ ফেলিয়া যাইতেছে জানিলে গ্রামের লোক মৃত সৎকার না করাইয়া ছাড়িবে না, তাহার উপর হয়ত থানায় জানাইতে হইবে, সে নানা হাঙ্গাম, এই ভয়েই তাহারা লুকাইয়া ছিল, কিন্তু গৌরীকে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া এবং তাহার পশ্চাৎ

পশ্চাৎ আনকে আসতে দেখিয়া, তাহারা আর উর্দ্ধশ্বাসে না পলাইয়া কি করে? তাহারা পলাইল বটে, কিন্তু গৌরীর কলঙ্ক রটিল কেন? গৌরী কি নষ্ট চন্দ্রের চাঁদ দেখিয়া ছিল?

এই ঘটনার এক দিন পরে বন মধ্যে রাশি রাশি শকুনি দেখা দিল, কুকুর শৃগাল কলরব জুড়িয়া দিল, পাড়ার মেয়েরা জল আনিতে গিয়া নাকে কাপড় দিয়া বলিল "কি পচেছে।"

ক্রমে একান ওকান হইল, অনি পিসীর কানে উঠিল, অনি পিসী নাকে কাপড় দিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া বনের দিকে গেল, যাহা দেখিল তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। দেখিল মৃত দেহে আর চর্ম্ম নাই, তবে অস্থিতে রক্তাক্ত মাংস লাগিয়া রহিয়াছে; কাহার দেহ তাহা চিনিবার উপায় নাই, কিন্তু মাথার চুল গুলি আছে। এত সেই চুল! ভোলানাথের মাথার সেই ভ্রমর কৃষ্ণ কোঁকড়া চুল, তবে ত ভোলানাথকে পাপীষ্ঠা গৌরী তাহার উপপতীদের সাহায্যে হত্যা করিয়াছে! আর কোথা আছে। অনি পিসী সেই মৃত দেহের পাশে আছাড় খাইয়া পড়িয়া চিৎকার জুড়িয়া দিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে রাষ্ট্র হইল ভোলানাথের মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে। দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পুলিশের দারোগা আসিলেন, সঙ্গে দলে দলে কনেষ্টবল চৌকিদার আসিল, তখন সকলেই বলিল "এ গৌরীর কাজ বটে, অনি ত ঠিকই বলিয়াছিল।"

একজন চৌকীদার বলিল "অনি পিসী কেন, আমিও পুকুর পাড় থেকে গৌরীকে বনের দিকে যেতে দেখেছিলাম। তিনটে লোক পিসীকে দেখে পালাল, আমি কি তাড়া কর্‌তে ছেড়ে ছিলাম, তা ধর্‌তে যে পার্‌লাম না।"

কর্ম্ম-নিষ্ঠ দারোগা বাবু চক্ষু আরক্তিম করিয়া বলিলেন "আমায় কেন খপর দিন্‌নি হারামজাদ।"

চৌকীদার করপুটে কহিল "ধর্ম্মাবতার আমি কি তখন এত জানি।"

দারোগা বাবুও মফঃস্বলে ধর্ম্মাবতার পদবাচ্য হইয়া থাকেন, ইহা বোধ হয় অনেকের জানা নাই।

দারোগা বাবু তখনই উপস্থিত চৌকীদার ও অনি পিসীর এজাহার লইলেন। গ্রামের লোকের নিকট গৌরীর চরিত্র যে দোল দেখিতে গিয়া নষ্ট হইয়াছিল তাহা শুনিলেন, লাস যতদূর সম্ভব সনাক্ত করাইয়া মায়না করিলেন, তখন গৌরীকে ডাকিয়া বলিলেন "তুই কি বল্‌তে চাস্?"

গৌরী আর বলিবে কি, চুপ করিয়া রহিল। তখন দারোগা বাবু বলিলেন "চুপ করে থাক্‌লে ফাঁসি এড়াবে না, বজ্জাত, হারামজাদী।"

গৌরীর চক্ষে জল আসিল, গৌরী ভগবানকে কাতর ভাবে ডাকিল, কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারিল না। তখন গ্রামের মান্য গণ্য একটী লোক বলিলেন "উত্তর দিতে আর আছে কি যে দিবে?"

দারোগা বাবু গৌরীর হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া লইয়া চলিলেন। তখন অনি পিসী চিৎকার করিয়া বলিল "যে দিন তোর্ ফাঁসি হবে, ফাঁসি কাটে ঝুল্‌বি সেই দিন আমার প্রাণের জ্বালা যাবে।"

গৌরী কোন কথাই কহিল না। পাড়ার মেয়েরা গৌরীর চরিত্র সম্বন্ধে অনেক ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিল। কেহ বলিল "এ কেমন মেয়ে রে বাবা, মিট্ মিটে ডান কিন্তু ছেলে খাবার রাক্কস।" কেহ বলিল "ভাবিনীর পুরুষের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করা অবেশ থাকুক কিন্তু কোন দোষ নাই।" কেহ বলিল "ঐ যে লম্বা কলা বৌয়ের মত ঘোম্‌টা ঐতেই যত বজ্জাতি।" এই রূপ যাহার যে রূপ ইচ্ছা গ্রাম্য মেয়েদের পার্লামেণ্ট হইতে তাহারই স্থির সিদ্ধান্ত হইল। তখন সকলে এক বাক্য হইয়া অনি পিসীর কত প্রশংসা করিতে লাগিল, অনি পিসী কড়ে রাঁড়ি হইয়াও কেমন সুনামে দিন কাটাইল, ইহাই সকলের প্রশংসার কথা হইয়া উঠিল। এদিকে অনি পিসী দিবানিশি বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। কান্নার চোটে লোকের কাণে ঝালাপালা ধরিতে লাগিল।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

ডেপুটী এজলাস।

আজ জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের আদালত লোকে লোকারণ্য। তালতলা, কুলতলা, সেগুণতলা লোকে ভরিয়া গিয়াছে। কেন সেখানে কি আর কখন খুনি মোকর্দ্দমার বিচার হয় নাই? না তাহা নয়, গোরী অতি সুন্দরী আর যুবতী বলিয়া তাহাকে দেখিতে এত লোকের সমাগম। বাজারের দোকানদার আসিয়াছে, মেছুনিরা মাছের চুপ্‌ড়ি হাতে করিয়াই আসিয়াছে, স্কুলের বয়াটে ছেলেরা আসিয়াছে, আর আসিয়াছে নিষ্কর্ম্মা লোক। স্কুলের

মাষ্টারেরা সময় মত একবার আসিবার আশা করিয়াছেন, আর মুন্সেফ বাবুরা সকাল করিয়া বেড়াইতে যাইবার ছলে ডেপুটী বাবুকে ডাকিতে যাইবেন বলিয়াও আশা করিয়াছেন। সব্ ডেপুটী বাবু মনোমোহন বেশ ভূষা করিয়া কাজ শিখিবার ছলে এজলাসে আশ্রয় লইয়াছেন।

গৌরী হাজতের ক্লেশ বড় পায় নাই,—সৌন্দর্য্যের সর্ব্বত্র জয় বটে, নতুবা ডাক্তার বাবু অত দয়া করিয়া ঘন ঘন জেলখানা পর্য্যবেক্ষণে যাইয়া গৌরীর তথ্য লইবেন কেন? মোক্তার বাবুদের সমবেদনাও কম নয়, বিনা পয়সায় কার্য্য করিতেছেন, কেবল মাত্র উকিল বাবুটী সামান্য কিছু লইয়াছেন, কিন্তু কি আপদ, পাপীষ্ঠা গৌরী যে একটু রসের হাসি হাসিয়া ঘোম্‌টা খুলিয়া কাহারও সঙ্গে কথা কয় না। ইহাই তাঁহাদের বড় দুঃখ!

বেলা ৩টার সময় মাথায় টুপী ডেপুটী বাবু ছড়িটী ঘুরাইতে ঘুরাইতে কাছারিতে আসিলেন। অমনি পিল্ পিল্ করিয়া উকিল মোক্তারের দল গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যেন সুধাকরকে ঘেরিয়া তারাদল শোভা পাইল। বিচারালয়ে আজ বড় ভিড়, কনষ্টেবলরা ভদ্র ইতর বাছেনা, চেনা না হইলেই তাহাকে রুলের গুঁতা দেয়। হাকিম বাবু উচ্চাসনে বসিয়াও কিন্তু সে গুলি দেখিতে পান না। তখন ডেপুটী বাবু অন্যান্য কাজ সারিয়া গৌরীর মোকর্দ্দমা আরম্ভ করিলেন। গৌরী অবগুণ্ঠন দিয়া ডকে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ সকল চক্ষুই গৌরীর দিকে, গৌরীর মুখকমল অবলোকন করিতে বিচারপতি হইতে সামান্য চাপরাশীটী পর্য্যন্ত লালাইত। তখন মোক্তারের দল দাঁড়াইল, মেনের পেনাল কোড, ফিল্ডের এভিডেন্স একট্, প্রিন্সেপের ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড ও কতকগুলি কাগজ ও ফিতা লাগান ইণ্ডিয়ান ল-রিপোর্টার প্রভৃতি লইয়া স্থানীয় নামজাদা উকিল রজনী বাবু উপস্থিত হইলেন। শুনিয়াছি তাঁহার চাউনিটা বড় ভাল নয়, উকিল বাবু দাড়ি চোম্‌রাইয়া, মাথার টাক্‌টিতে একবার হাত বুলাইয়া, শিখাটিকে অল্প ঢাকিয়া লইয়া গৌরীকে বলিলেন "হাকিমের দিকে ফিরে দাঁড়াও, মুখে অত ঘোম্‌টা কেন?"

কিন্তু ফল কিছু হইল না, উকিল বাবুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। গৌরীর মুখখানি ভাল করিয়া দেখা হইল না। মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল। গৌরী "আমি নির্দ্দোষী" বলিল বটে, কিন্তু অনি ও চৌকিদারের সাক্ষ্য এবং আরও

কতিপয় লোকের সাক্ষ্য বড় গুরুতর হইল। এ সব লোককে কে সাক্ষ্য মানিল, কে খুঁজিয়া বাহির করিল, তাহা আমরা কেমন করিয়া বলিব?

রজনী বাবুর সেই গম্ভীর গলার জলদ গম্ভীর আওয়াজ, সেই কথার ছটা, ভাবের গাঁথুনি কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। জেরাতেও উকিল বাবু কাহাকেও পাড়িতে পারিলেন না। অনি পিসীকে জেরা করিলেন "তোমার নাম কি?"

অনি। অনি।

উকিল। অনি,—না অন্নপূর্ণা?

অনি। নাম অনি, পূজা করি অন্নপূর্ণা—আর—

উকিল বাবু ধমকাইয়া বলিলেন "যা জিজ্ঞাসা করি তারই উত্তর দাও।"

অনি চুপ করিবার লোক নয়, বলিল "আমি কাকেও কোন কথা যেচে বলিনে।"

উকিল। বেশ, (গৌরীকে দেখাইয়া) ঐ মেয়েটীকে চেন?

অনি বড় চটিল, বলিল "তামাসার আর লোক পাওনি,—বটে।"

উকিল। জবাব দাও।

অনি। তুমিই পাগল, আমি ত নই।

ডেপুটী বাবু বলিলেন "ওঁর কথার উত্তব দিতে হবে।"

অনি দায়ে পড়িয়া বলিল "চিনি।"

আর একবার জেরার সময় উকিল বাবু প্রশ্ন করিলেন "তুমি লাস দেখেছিলে?"

অনি। "মা না বিউলো বিউলো মাসী"
ঝাল খেয়ে মল পাড়াপড়্সী।

তুমি যে তাই কর্লে।

উকিল বাবু সরোষে উত্তর করিলেন "তোমাকে এখানে ছড়া কাট্তে আনা হয়নি, দেখেছ কিনা বল।"

অনি। আমি দেখিনি ত ঠাকুর, তবে কি তুমি দেখেছ?

উকিল বাবু যে ব্রাহ্মণ অনি তাহার সন্ধান রাখিয়াছে। এই সময় কোর্ট বলিলেন "এ আদালত, তুমি আদালতকে অমান্য কর্‌ছো তোমার জেল হবে।"

অনি সকাতরে বলিল "বাবা, সেই পর্য্যন্ত গলায় কাপড় দিয়ে সন্ধিক্ষণের পাঁঠার মত দাঁড়িয়ে আছি। ঠাকুর দেবতার কাছেও কখনও এত করিনি।

উকিল। তুমি অত বক্‌চো কেন ?

অনি। তুমি বকাচ্চ কেন ?

কোর্ট বাবু পূর্ব্বেই ডেপুটী বাবুকে বলিয়াছিলেন যে অনি কিছু বেশী বকে, তাহাকে বেশী চটাইলে সে সব গোল করিবে, ঠিক থাকিতে পারিবে না, সুতরাং তিনি ধমক ধামক কবিলেন না।

উকিল। কি করে জান্‌লে যে সেই লাস তোমার ভাই ভোলানাথের ?

অনি। আমার ভাই আমি চিনি না।

উকিল। কি এমন চিহ্ন ছিল যা দেখে চিন্‌লে ?

অনি। চুল ছিল, নখ ছিল ?

উকিল। চুল দেখে মানুষ চেনা যায় ?

অনি। খুব যায়,—বাবু তুমি যদি মুড়ি দিয়ে কেবল মাথাটী বার করে বসো, তা হলে তোমার ঐ টেকো মাথা আর পাতালা চুল দেখে কি তোমায় চেনা যায় না ?

ফলে উকিল বাবু জেরায় কিছু করিতে পারিলেন না। গৌরীব অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া উঠিল। উকিল বাবু হতাশ হইলেন।

ডেপুটী বাবু তখন চার্জ্জ ফ্রেম করিতে আরম্ভ করিলেন। বড় মোকদ্দমার চার্জ্জ ফ্রেম করিতে শীতকালেও অনেক ডেপুটী বাবুর ঘাম দেখা দেয়, ইনিও তাহাতে বঞ্চিত হইলেন না। তখন ডেপুটী বাবু গৌরীকে বলিলেন "তুমি কাহাকেও সাক্ষী মানিবে ?"

গৌরী মৃদুস্বরে বলিল "না।" মনে মনে বলিল "আমার সাক্ষী সেই কৃষ্ণরায়। যাঁহাকে দেখিতে যাওয়া পর্য্যন্ত আমার এই দুর্দ্দশা, সেই কৃষ্ণরায়ই আমার সাক্ষী। যদি ফাঁসী হয়, হোগ—আমি কৃষ্ণরায়, কৃষ্ণরায় করে প্রাণত্যাগ কর্‌বো—দেখ্‌বো তিনি আমার কি বিচার করেন।"

মোকদ্দমা শেসনে গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন অবস্থা।

রামজীবন পুরকে এদেশে সহর বলে, বেশ ভাল রাস্তা আছে, মিউনিসি-পালিটী আছে, পাকা ইমারত অনেক আছে। অনেক লোক জনের বাস।

সপ্তাহে দুই দিন হাট হয়, তাহাতে বেচা কেনা বেশ হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত বাজার প্রত্যহ বসে। এই সকল কারণে নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা রামজীবন-পুরকে সহর বলে। বস্তুতঃ রামজীবনপুর সহর নয়, বেশ বড় গ্রাম।

দিননাথ হালদার রামজীবনপুরের মধ্যে একজন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি। দিন-নাথের দেশে বিস্তৃত জমিদারী,—কলিকাতা, মুঙ্গের ও ছাপরায় খুব বড় বড় আড়ত, তদ্ব্যতীত মহাজনি কারবারও আছে।

হালদারের বাড়িটী গ্রামের মধ্যস্থলে, সদর বাটীর সম্মুখে রাস্তা, রাস্তাটী পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা। সদর বাটীর উত্তরে অন্দর মহল, আবার তাহারই উত্তরে ঠাকুর বাটী। সদর বাটীর উত্তর দক্ষিণ ঠাকুর বাড়ী দিয়া একটী রাস্তা গিয়াছে, সকল বাটী গুলিই চক মিলান, অন্দরের দক্ষিণে মুখোপাধ্যায় দের বাটী। তাঁহারা হালদারদের পুরোহিত। পুরোহিতদের বাটীটী একতালা, ঠাকুর বাটীও তাই।

অন্দর মহলের উত্তর দিকের দ্বিতলের একটী ঘরে দিন বাবু বাস করিতেন, কিন্তু ঠাকুর বাটীতে ব্রহ্মদৈত্যের আবির্ভাব হওয়া পর্য্যন্ত আর তিনি সে ঘরে শয়ন করেন না। সেও আজ প্রায় ১৫ বৎসরের কথা। দিননাথের তত আপত্তি না থাকিলেও তাঁহার গৃহিণী ছেলেদের লইয়া সে ঘরে শয়ন করিতে নারাজ, সুতরাং সেই প্রশস্ত কক্ষটী তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছে। এখন সেই কক্ষটী পাচিকা হরিমতীর অধিকার ভুক্ত। সে ঘর কি হরিমতীর যোগ্য, তত বড় ঘর লইয়া সে কি করিবে, কিন্তু আর কেহ সে ঘরে শয়ন করিতে চায়না এবং হরিমতীর ভূতের ভয় আদৌ নাই বলিয়া তাহাকেই সে ঘরটী দেওয়া হইয়াছে। উত্তর দিকে আরও তিন চারিটী কক্ষ আছে, কিন্তু সেগুলি ঠাকুর বাটীর একটু পাশে বলিয়া লোকজন তাহাতে থাকে, কিন্তু প্রাণান্তেও কেহ জানেলা খুলেন না।

ব্রহ্মদৈত্যকে অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। পায়ে খড়ম, গায়ে নামাবলী, শুভ্র উপবীতের গোছা গলদেশে লম্ববান। রাত্রে তিনি ঠাকুর বাড়ীর ছাদে খট্ খট্ করিয়া ভ্রমণ করেন। সে সময় যদি কেহ জাগিয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার তখনি হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। ব্রহ্মদৈত্য ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করেন, ফুল দিয়া দেবার্চ্চনা করেন, খোল কর্ত্তাল বাজান। পাড়ার লোক গভীর রাত্রে সে পথ দিয়া কেহ চলেনা। পুরোহিত ঠাকুর তিন চারিজন লোক, দুই তিনটী লাঠীন সঙ্গে লইয়া তবে শীতল দিতে যান। শীতল দিয়া

অন্দরের দ্বার বন্ধ করিয়া আসেন, পূর্ব্বে নাগা ফকিররা ঠাকুর বাটীতে থাকিতে পাইতেন, কিন্তু কয়েকজন ফকির ভয় পাওয়ায় ও একজনার মূর্চ্ছা হওয়ায়, সেখানে কেহ থাকিতে ইচ্ছা করিলেও গৃহস্বামীরা তাহাতে সম্মত হন না।

দিননাথ বাবুর বড় পুত্রটী কলিকাতার বি,এ ক্ল্যাসে পড়েন। প্রেত যোনিতে তাঁহার বিশ্বাস নাই,—একবার ভূত দেখিবার জন্য ঠাকুর বাড়ীতে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতাঠাকুরাণী সেই কথা শুনিয়া মাথা কুটিতে আরম্ভ করায় তিনি আর সে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই। শুনিয়াছি রাত্রের বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার মনে হইতেছিল এই বার কেহ ডাকিতে আসিলে হয়, চলিয়া যাই, ফলেও তাহাই হইয়াছিল।

হালদার গৃহে হরিমতীর বড় খাতির, হরিমতী কাহারও বামুন দিদি, কাহারও বামুন মা, কাহারও বা বামুন পিসী। হরিমতীকে সকলে ভালবাসে, সকলে ভক্তি শ্রদ্ধা করে, এমন ধীর বিনয়-নম্রভাব ত দেখা যায় না। হরিমতী বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার আদর্শ হইয়া উঠিয়াছেন। বাড়ীর বড় বাবু হইতে সামান্য ঝি-চাকর পর্য্যন্ত সকলেই হরিমতীকে ভালবাসে।

হরিমতী আজ ১২ বৎসর এই বাটীতে আছেন, কিন্তু তথাপি সর্ব্বদাই অবগুণ্ঠনবতী, সে মুখ বড় কেহ দেখিতে পায় না। মেয়েদের কাছে বসিয়া থাকিলেও হরিমতীর অল্প অবগুণ্ঠন থাকে। কথা অতি ধীর, চলন অতি শান্ত, বদন অবনত, এদিকে আবার রন্ধনে দ্রৌপদীকে হারাইয়া দিতে পারেন।

হরিমতীর পাড়া বেড়ান নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে পুরোহিত ঠাকুরদের বাড়ীতে যান, পুরোহিত মহাশয়ের জামাতাটীর বয়স এই পঞ্চদশ বৎসর। হরিমতী তাহাকে বাবা বলেন, জামাই আসিলে হরিমতী বাপ্কে দেখিতে যান, স্বহস্তে তাহার জন্য নানা প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া আহারাদি করান,—বড় যত্ন করেন। একবার শ্বশুর বাড়ী আসিয়া জামাই বাবু পীড়িত হন, কিন্তু হরিমতী তাহার এত সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন যে আপনার মা মাসীও তত করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। জামাই বাবু জ্বরের সময় যন্ত্রণায় "মা মা" বলিয়া ডাকিলে হরিমতী তৎক্ষণাৎ "কেন বাবা" বলিয়া উত্তর দিতেন, সেই পর্য্যন্ত জামাই বাবু তাহাকে "মা" বলিয়াই ডাকেন। জামাইয়ের মুখের "মা" কথায় হরিমতী যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পান।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মদৈত্য।

দিননাথের পুরোহিত মহাশয়ের নাম রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বয়স আন্দাজ ৫০ বৎসর, দেখিতে দিব্য গৌর বর্ণ, নাতি স্থূল নাতি কৃশ দেহ, কিন্তু অনেকগুলি দাঁত পড়িয়া গিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুপুরুষ। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে গৃহিণী, একটী পুত্র ও একটী কন্যা। গৃহিণীর নাম কুসুম, হরিমতী কুসুমকে দিদি বলেন, বস্তুতঃ যত্নও তেমনি করেন। গৃহিণীর সুবাদে হরিমতী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্যালিকা হইলেন, কিন্তু হইলে কি হয় তিনি তাহার মুখটী পর্য্যন্ত দেখিতে পান না, কথার শব্দটী পর্য্যন্ত শুনিতে পান না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাটীতে বড় একটা থাকেন না, এখানে ওখানে মজলিস গরম করিয়া বেড়ান। অনেক রাত্রি না হইলে বাটীতে আসেননা। বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে; শুনিয়াছি গরম তাঁহার আদৌ সহ্য হয় না। যে দিন বড় গরম হয় সেদিন সারা রাত ঘুরিয়াই কাটান। কোন পুষ্করণীর বাঁধা ঘাটে হয় ত সারানিশি তামাক খান ও বসিয়া থাকেন। দিবসে নিদ্রা যান। তিনি গৃহে থাকিলে হরিমতী বড় আসেন না, হরিমতী বড় লজ্জাশীলা।

হরিচরণ বাবু এক মাসের ছুটি লইয়াছেন। আজ দুই দিন হইল বৈবাহিক বাটীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বৈবাহিক। যতীশের সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যার বিবাহ হইয়াছে। হাল্‌দার বাবুদের ঠাকুর বাড়ীর ভূতের কথা হরিচরণ বাবু শুনিয়া ছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস করিতেন না। পুলিশের লোক ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন?

একদিন হরিচরণ বাবু বৈবাহিককে বলিলেন "আজ আমি ব্রহ্মদৈত্য ধর্‌বো?"

রমেশ। কুটুম্বিতা থাক্‌লে ধরা দিতে পারে, গোত্র কি এক?

হরি। বিদ্রূপ নয়।

রমেশ। বিদ্রূপ আবার নয় কিসে?

হরি। আমি রাত্রে লুকিয়ে দেখ্‌বো ব্যাপার কি।

রমেশ। অনেকে দেখেচে। শেষ বাঁচান দায়।

হরি। যা থাকে কপালে, আমি দেখ্‌বো।

রমেশ। পেপেছেন নাকি।

হরিবাবুর গায়ে বলও ছিল হৃদয়ে সাহসও ছিল, কিন্তু বৈবাহিক মহাশয়ের ভীরুতা দেখিয়া তিনি সে কথা চাপা দিলেন। বলিতে কি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথায় একটু ভয়ও হইল। ভাবিলেন একা থাকা হইবে না, কাহাকেও সঙ্গে লইতে হইবে, কিন্তু সঙ্গে যায় কে? অপরাহ্নে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত বিনোদ আসিয়া উপস্থিত। অনেক দিনের পর দেখা, কত আপ্যায়িত—কত কথা হইল, শেষে ভূত ধরার কথাটাও হইল। বিনোদ বাবু হরি বাবুর সঙ্গে থাকিতে সম্মত হইলেন। তবে আর ভয় কি? আজ ১৫ বৎসরের সজীব ভূত ধরা পড়িবে ইহা কি কম আনন্দ!

হরিবাবুর প্রধান উৎসাহ দাতা দিনবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি আরও দুই একটী বন্ধু বান্ধব লইয়া দরজার বাহিরে থাকিতে স্থির করিলেন, ডাকিবা মাত্র দরজা খুলিয়া ভিতরে যাইবেন। সমস্তই ঠিক হইল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাটী যাইবার নাম করিয়া বৈবাহিকের নিকট বিদায় লইয়া গোপনে রহিলেন এবং শীতলের পূর্ব্বে দুই জনে দুই গাছি মোটা লাঠি ও প্রত্যেকে একটী করিয়া ছোরা লইয়া অতি গোপনে ঠাকুর বাড়ির রান্না ঘরে লুকাইয়া রহিলেন।

জ্যোৎস্না রাত্রি, চতুর্দ্দিক বেশ ধপ্ ধপ্ করিতেছে, আরতী হইল, শীতল দেওয়াও হইল, শেষ দরজা বন্ধ হইল। হরিচরণ বাবু ও বিনোদ ঠাকুর বাড়িতে বন্দী হইলেন। রাত্রি ১০টা বাজিল,—এগারটা বাজিল, একটী ইন্দুরও যে নড়েনা। তখন হরি বাবু মৃদু হাসিয়া অতি ধীরে বিনোদকে বলিলেন "ভূত আজ বুঝি ভয় পেয়েছে।" এমন সময় একটী কিসের শব্দ হইল, তাঁহারা উভয়েই চমকিলেন। ছাদের উপর কে যেন খড়ম পায়ে দিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া বোধ হইল, আর কে? সেই ব্রহ্মদৈত্য তখন দেয়ালের গায়ে যে খোল ছিল তাহা বাজাইলেন, করতাল বাজাইলেন, ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া ঘণ্টা নাড়িলেন, তাহার পর তিনি খট্ মট্ করিয়া ঠাকুর বাটীর যে সিঁড়ির ঘর ছিল সেই দিকে গেলেন, হরি বাবুর সাহসী হৃদয় চমকিল, বিনোদ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইল। বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল কিন্তু হরি বাবু পশ্চাৎ পদ হইলেন না। লাঠিটী হাতে করিয়া সিঁড়ি দিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিলেন, বিনোদ অগত্যা তাঁহার অনুসরণ করিল। মনে হইল গৃহমধ্যে যেন দুইজনে কি কথাবার্ত্তা হইতেছে। ভাবিলেন "জোড়া ব্রহ্মদৈত্য না কি?" কাণ

পাতিয়া রহিলেন, কিন্তু কথাবার্ত্তা বেশ বুঝিতে পারিলেন না, তবে বোধ হইল কথোপকথনকারীদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক।

হরিচরণ বাবু ও বিনোদের পদশব্দ পাইয়া ব্রহ্মদৈত্য ও ব্রহ্মদৈত্যাণী ছাদে গেলেন, তখন যেন উভয়ের বুকের ভিতর হইতে ভয়ঙ্কর হৃদ্‌কম্পের শব্দ অনুভূত হইতেছে। তাঁহাদিগকে দেখিয়া ব্রহ্মদৈত্য নামাবলীখানি দুইহাতে উঁচু করিয়া ধরিয়া বিকটভাবে লম্ফ দিতে লাগিলেন। রমণীটীও অর্দ্ধ বিবসনাবস্থায় অঞ্চলের কাপড়খানি দুই হাতে উঁচু করিয়া ধরিয়া এক ভয়ঙ্কর ভাবে নর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। খল খল অট্টহাস্যের ভীষণ ধ্বনি উত্থিত হইল। বিনোদ সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া পড়িয়া গেল। হরি বাবু দেখিলেন এত ভূতের আকার নয়, কোন বিকট ভাব ত ইহাতে নাই,—তবে শুনিয়াছি উহারা নানারূপী— যাহাই হউক সাহসে ভর করিয়া তিনি সেই ব্রহ্মদৈত্যাণীকে জাপটাইয়া ধরিবেন, ব্রহ্মদৈত্য তখনও নর্ত্তায়মান।

হরিবাবু বলিলেন "আর কোথা যাও।" তখন সেই প্রদীপ্ত চন্দ্রালোকে তিনি দেখিলেন স্ত্রীলোকটী সুন্দরী,—যুবতী বলিলেও হয়, কিন্তু এ গৌরাঙ্গিনী কে? তখন তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলেন। হরি বাবু কর কি?—তুমি যাহাকে কত নিশীথিনীতে একবার দেখিবার জন্য লালাইত হইতে, এযে সেই মূর্ত্তি!—যে মূর্ত্তির জন্য তুমি পাগল—এযে সেই মূর্ত্তি!—যে মূর্ত্তির স্মৃতি মাত্র হৃদয়ে আঁকিয়া তুমি এখনও বিবাহ কর নাই, এযে সেই মূর্ত্তি! তবেত প্রেতযোনী মানিতে হয়,—তাহারা সকল প্রকার আকৃতিই ত ধরিতে পারে। আ ছি ছি, হরিচরণ কর কি? হরিচরণ বাপরে করিয়া চিৎকার করিয়া ব্রহ্মদৈত্যাণীকে ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া নামিয়া আসিলেন। দরজা যে বন্ধ, প্রাণ যে যায়—ভূত যে প্রত্যক্ষ!

তখন ব্রহ্মদৈত্যাণীর চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল, তাহার প্রাণে আর প্রাণ নাই, আজ যে তাহার জীবন সর্ব্বস্বের বক্ষে আবার স্থান পাইয়াছিল, আহা এ সুখ কি ভুলিবার? এক দণ্ড এক মুহূর্ত্তও যে বহু তপস্যার ফল;—কিন্তু একে?— এ যে সেই নররূপী রাক্ষস, সেই সয়তান—যে তাহার জীবন অসার করিয়াছে, জীবনের সমস্ত সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, এ যে সেই পাপীষ্ঠ। এই কি সাধনার সিদ্ধি? ক্ষণমধ্যে প্রতিহিংসার ভীম দাবানল হৃদয় মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল, উন্মত্তা বাঘিণীর ন্যায় তাহাকে আক্রমণ করিলেন, কণ্ঠনালী ও নাসিকা চাপিয়া ধরিলেন। ব্রহ্মদৈত্য বলিলেন "কর কি? নর হত্যা যে ভীষণ পাপ।"

কে তাঁহার কথা শুনে। আবার বল প্রয়োগ, আবার তাই, বিনোদের মুখ লাল হইল, ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, মুখ দিয়া লালা বহির্গত হইল, জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল, বিনোদ অকালে প্রাণ হারাইল। কিন্তু জানিতে পারিল না, যে তাহার হন্তা কে ?

রমণী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্রহ্মদৈত্যের বদনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন "পাপ! পাপ নয়—পুণ্য,—যে সতীর সর্ব্বনাশ করে—যে অবলার কুল মজায়, —তাহার বুকের শোণিত প্রকৃতই ভূত প্রেতের খাদ্য—আমি আজ প্রাণের জ্বালা ভুলিলাম—সময়ে সমস্ত বলিব এখন চলুন পালাই।"

ব্রহ্মদৈত্যের সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু উপায় ত নাই, ধরা পড়িলে যে তাঁহারও সর্ব্বনাশ!

ব্রহ্মদৈত্য তখন দ্রুতপদে হরিমতীর জানালার নিচে যে একটী দড়ি ঝুলিতেছিল সেই খানে গেলেন। তাহাতে একটী কাঠ বাঁধা ছিল, হরিমতী তাহাতে বসিবা মাত্র ব্রহ্মদৈত্য তাহা টানিতে লাগিলেন, ক্রমে হরিমতী জানালার কাছে পৌঁছিলেন, একটী রেল খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া রেলটী স্বস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া জানালা বন্ধ করিলেন। ব্রহ্মদৈত্য প্রাচীরের একপার্শ্বে একটী তিন্তিড়ি বৃক্ষ ছিল, তাহাতে আরোহণ করিয়া তাহার একটী শাখা বহিয়া প্রাচীরে নামিলেন, প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া পালাইলেন। ব্রহ্মদৈত্য হরিচরণ-বাবুর বৈবাহিক রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

এখন কথা হইতেছে এখানে হরিমতী কেন ? পাপীষ্ঠার কি পাপ বাসনার এখনও পরিতৃপ্তি হয় নাই? এখনও কি মনের আশা মিটে নাই? সয়তানেরও প্রশংসা যোগ্য কিছু থাকিলে তাহা স্বীকার করাই মনুষ্যত্ব, তখন হরিমতীর কথা গোপন করিব কেন ?

হরিমতীর যদি পাপ বাসনা থাকিত তাহা হইলে সে এখানে আসিবে কেন? পরের বাড়ি রাঁধিয়া জীবন কাটাইবে কেন? বিনোদ যখন তাহাকে ত্যাগ করে তখন তাহার যৌবন ছিল, রূপ ছিল, তাহার উপর তিনি শিক্ষিতা, গলাটী সুমিষ্ট, কথা বার্ত্তার চটক ছিল, পাপ জীবনের ব্যবসা চালাইতে আর কি চাই? কত লোক তাহাকে খুঁজিয়া লইত। আবার হয়ত অর্থ স্বাচ্ছল্য ঘটিত। কাহার না কাহার ভালবাসাও পাইতে পারিত, কিন্তু তাহার সে প্রবৃত্তি হয় নাই, শুভক্ষণে বিনোদ তাহার বক্ষে দারুণ বজ্রপাত করিয়াছিল। তাহার অসহ্য যাতনায় তাঁহার চৈতন্যের উদয় হইয়াছিল।

স্বামী পুত্রের জন্য প্রাণ কাঁদিয়াছিল। এ জ্ঞান যদি পূর্ব্বে হইত, তাহা হইলে হরিমতী পতিব্রতা পতিগত-প্রাণা সতী মহিলার আদর্শ স্থানিয়া হইতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ জ্ঞান হয় অনেক বিলম্বে।

হরিমতী হালদারদের বাড়ী যখন আসিলেন, তখন মনের কিছুমাত্র সুখ নাই—কেবল চিন্তা নিজের মহাপাপের, পরমারাধ্য স্বামীর,—আর সেই প্রাণাধিক পুত্রের। যে চিন্তায় কোন ফল নাই, যে চিন্তায় যাতনা বই কোন সুখ নাই, সেই চিন্তাই ভাল লাগে। এ চিন্তায় কি আর বাঁচিতে ইচ্ছা হয়? বস্তুতঃ তাঁহার আর বাঁচিবার ইচ্ছাও ছিল না। আত্মহত্যা যে মহাপাপ তাহা না হইলে তাহাতেও হরিমতী পশ্চাৎপদ হইতেন না। কেবল মনে হয় মরণই মঙ্গল, তাহা হইলে বুঝি দারুণ স্মৃতির তাড়না হইতে নিষ্কৃতি হইত,—হৃদয়ের দারুণ যাতনা প্রশমিত হয়, কিন্তু সে মরণও ত হয়না।

ঠাকুর বাড়ীতে ভূত আছে, তাই ভূত দেখিতে উৎসুকা। গোপনে জানেলা খুলিয়া সেই দিকে চাহিয়া থাকেন। একদিন দেখিলেন কে যেন ছাদ দিয়া আসিলেন, ঠাকুর ঘরে খোল করতাল বাজাইয়া সিঁড়ির ঘরে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজাদি করিলেন, সামান্য যাহা দেখা গেল তাহাতেই মনে হইল এ সকল তান্ত্রিক ক্রিয়া। তবে কি ইহা প্রকৃতই ব্রহ্মদৈত্য না কেহ গোপনে এই সকল কার্য্য করিবেন বলিয়া এই সমস্ত সতর্কতা?

এক দিন ব্রহ্মদৈত্য পূজাদি সমাপন করিয়া চলিয়া যাইবেন এমন সময় দেখেন যে একটী স্ত্রীলোক ছাদে দণ্ডায়মানা, আজি উপদেবতার মনেও ভয়ের সঞ্চার হইল, সবিস্ময়ে বলিলেন "কে?"

"হরিমতী।"

"এত রাত্রে এখানে কেন?"

"আপনার নিকট।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত গুলি দাঁত ছিল, সকল গুলিই একমুখ হাসির সহিত বাহির হইয়া পড়িল। বলিলেন "বাছা আমি সে লোকের লোক নই।"

হরিমতী মাথাটী অবনত করিয়া বলিলেন "আমারও সে অভিপ্রায় নয়।"

"তবে কেন আসিয়াছ?"

"আপনার সাহায্য প্রার্থিনী হইয়া, শুনিয়াছি তন্ত্রমতে শীঘ্র উদ্ধার হয়। আমার কামনা উদ্ধার।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিস্মিত হইলেন, বলিলেন "আসিবে কি করিয়া?"

"সে ভাবনা আমার—আপনি স্বীকার আছেন ত?"

"কিন্তু লোকে আমাদিগকে একত্রে দেখিলে দুর্নাম করিবে, সে কলঙ্ক ত ঘুচিবে না।"

"আপনি ভাবিবেন না, আমি আসিব না।"

"কেন?"

"আপনার দৈবে এখনও বিশ্বাস নাই।—আপনি বিশ্বাসহীন হইয়া আমায় ত উদ্ধার করিতে পারিবেন না।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেখিলেন রমণী সামান্যা নয়,—বলিলেন "তুমি আসিও, কপালে যাহা হয় হইবে।"

সেই পর্য্যন্ত হরিমতী নিত্যই আসেন। হরিমতীর এত পরিবর্ত্তনে কেহ বিস্মিত হইবেন না হরিমতীর প্রাণ আশৈশব ভালবাসার কাঙ্গালিনী ছিল, কিন্তু দীক্ষা ভিন্ন ইষ্ট সাধনা হয় না। হরিচরণ বাবু তাঁহাকে উপযুক্ত দীক্ষা দিয়া ভাল বাসাইতে পারেন নাই,—তাই অভাগিনী কুপথগামিনী হইয়াছিল,—কিন্তু এখন বুঝিয়াছে যে কি ভয়ঙ্কর পাপ করিয়াছে এবং তাহার বিনিময়ে হৃদয় মধ্যে কি ভীষণ নরক যাতনা অহরহ ভোগ করিতেছে।

হরি বাবুর আর্ত্তনাদ ও চিৎকারে দিন বাবুর পুত্র ও অপরাপর পাঁচ ছয় জন লোক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাঁহার সংজ্ঞা নাই। অনেক কষ্টে চৈতন্য সম্পাদিত হইল। গ্রামের লোক হরি বাবুকে অনেক তিরস্কার করিল, এবং অনেকে সেই অপদেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিল।

এতক্ষণ সকলে বিনোদকে ভুলিয়া ছিলেন, কিন্তু দিন বাবুর পুত্র বলিলেন "বিনোদ কই?"

হরি। তাই ত দেখ দেখ।

সকলে ছুটাছুটি তাহাকে খুঁজিতে লাগিল, কই কোথাও ত নাই। হরি বাবু ডাকিলেন "বিনোদ?"

কোন উত্তর নাই। তখন ছাদের উপর যাওয়াই স্থির করিলেন। সকলে নানা প্রকার স্তুতি ভক্তিভবে প্রণাম করিয়া ছাদে উঠিলেন, দেখিলেন বিনোদ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার চক্ষু রক্ত বর্ণ, মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইয়াছে। মুখে চখে জল দেওয়া হইল, সকলে বাতাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফল দর্শিল না। বিনোদ আর নাই।

সকলের মুখ শুকাইল, একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এত গোল-

মান হইতে লাগিল যে গ্রামের লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সকলেই শুনিলেন যে "ভূতে বিনোদ বাবুর ঘাড় ভাঙ্গিয়াছে।"

কাছেই পুলিশ ষ্টেশন, দেখিতে দেখিতে সব্ ইন্সপেক্টর বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কোনই কিনারা হইল না, ভূতের আবার কি সন্ধান হইবে? পুলিশের বড় ভাবনা হইল, ভূত ত মানিতেই হইতেছে, কিন্তু ডায়রিতে কি লিখিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ভূতের কথা বিশ্বাস করিলেও ত লিখিবার উপায় নাই—তখন অগত্যা ঘটনা গোপন করাই স্থির হইল। শেষ তাহাই হইল গ্রামস্থ ভদ্র লোকেদিগের আনুকূল্যে তাঁহার সকল দিক বাজায় রহিল। সকলেই বলিলেন এত আর খুন নয়, ভয়ে প্রাণ বাহির হইয়াছে মাত্র।

সকলে চলিয়া গেলে দিন বাবুর পুত্র বলিলেন "ব্যাপার কি?"

হরি বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন "প্রত্যক্ষ ভূত—যে মানুষ আজ ১০। ১২ বৎসর মারা গেছে, তার চেহারা ধরে সামনে দাঁড়াল, আর কি চাও।"

দিন বাবুর পুত্র ভাবিলেন "বস্তুতঃ উপদ্রবও ত তত দিনের বটে। তখন তাঁহার ইংরাজি শিক্ষার জারি জুরি গেল, লম্ফ ঝম্ফ গেল, মনে মনে স্থির করিলেন কাল হরিচরণ বাবুর কাছে সে মৃত লোকটীর নাম জানিয়া গয়ায় পিণ্ডদান করাইবেন। জিজ্ঞাসা করাও হইয়াছিল, কিন্তু হরিচরণ বাবু সে কথা প্রাণ থাকিতে বলিতে পারিবেন কেন। আমার প্রাণাধিকা প্রেতযোনী প্রাপ্ত হইয়াছে এ কি বলিবার কথা? গয়া যাইতে হয় আমি স্বয়ং যাইব,—পরে সে চাঁদমুখে পিণ্ড দিবে?—ছি! তবে উত্তর দিতে হয় বলিয়া বলিলেন "নামটা ঠিক মনে হয় না, জানিয়া লিখিয়া পাঠাইব।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

শেসন কোর্ট।

হুগলীর শেসন আদালতে গৌরীকে দেখিবার জন্য বহু লোকের জনতা হইয়াছে। গৌরী সুন্দরী—গৌরী স্বামীঘাতিনী—তাই কি গৌরীকে দেখিতে লোকের এত ভিড়। কিন্তু গৌরীকে দেখিয়া কে বলিবে যে গৌরী ব্যভিচারিণী, গৌরী স্বামীঘাতিনী, সেই জন্য আরও সকলেই গৌরীকে দেখিতে উৎসুক,

প্রায় সকল দর্শকেই গৌরীর পক্ষপাতী, কিন্তু হইলে কি হয় প্রমাণ প্রয়োগ যে অকাট্য।

গৌরীর শেসনে উকিল দিবার পয়সা না থাকিলেও খ্যাতনামা উকিল ললিত বাবু বিনা পয়সায় তাহার ওকালতী করিলেন, শুনিয়াছি উকিল বাবুটী দয়াবান।

বিচার দুই দিন ধরিয়া চলিল, কিন্তু শেষ দিন অনেক তর্ক বিতর্কের পর জুরিরা গৌরীকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। তখন জজ সাহেব রায় লিখিয়া পড়িয়া শুনাইলেন এবং গৌরীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "জুরি বাবুদের বিচারে তোমার দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে, অতএব তোমার ফাঁসীর হুকুম দিলাম।"

গৌরী এক দিনও আদালত গৃহে ভাল করিয়া কথা কয় নাই। আজ নির্ভীকভাবে বলিলেন, "বিচার উত্তম হয়েছে। আমি যেমন আমার তেমনি সাজাই হয়েছে।"

এই কথায় জজ সাহেব ও জুরি বাবুরা ভারি সন্তুষ্ট হইলেন, ভাবিলেন তাঁহারা ন্যায় বিচারই করিয়াছেন। দর্শকমণ্ডলীও যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। মনের ভার লাঘব হইল। কেহ বলিলেন গৌরীর চরিত্র অতি ভয়ানক। কেহ গৌরীকে "মাখাল ফল" কেহ "সয়তানি" বলিলেন। কেহ বা গৌরীকে ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াইলে ভাল হইত বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কেহ আবার তাহার উপর থাবা থাবা লবণ দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কনেষ্টবলরা গৌরীকে জেলে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় একটী মলিন বেশী লোক আসিয়া জজ সাহেবের সম্মুখে করপুটে দণ্ডায়মান হইল। গৌরী বদন অবনত করিয়া ছিল বলিয়া তাহাকে দেখিতে পাইল না। চাপরাশিরা তাহাকে দাঁড়াইতে দিবে না কিন্তু সেও ছাড়িবে না, মহা গণ্ডগোল লাগিয়া গেল, তখন জজ সাহেব তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "তুমি কি চাও?"

"বিচার।"

"তোমার কি কোন মোকদ্দমা আছে?"

"না।"

একটী উকিল বাবু মৃদু হাসিয়া চেয়ার হইতে অল্প উঠিয়া জজ সাহেবকে বলিলেন "পাগল।"

এমন জ্যোতির্ব্বিদ জাতি আর নাই। হাসিমুখে যাহা ইচ্ছা বলিতে

ইহাঁদের তুল্য আর দ্বিতীয় নাই। জজ সাহেবও উকিল বাবুর কথায় অনুমোদন করিলেন। চাপ্‌রাসীরা আবার ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিল, কিন্তু সে যায়না, তখন জজ সাহেব রাগিয়া বলিলেন "চলা যাও।"

"আমার কথাটা শুনুন।"

"কি কথা ?"

"গৌরীর কি ফাঁসীর হুকুম হইল ?"

"হাঁ—তোম্ চলা যাও।"

"হুজুর, তার অপরাধ ?"

"খুন্ কিয়া।"

"কাকে ?"

"ভোলা ময়রাকো।

"সে ভোলা ত আমি।"

সকলে যেন চমকিয়া উঠিলেন। রাত্রি হইলে অনেকে হয়ত রাম নাম জপিতেন, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ তাহা আর করিতে হইল না। জজ সাহেবের ভ্রূযুগল ধনুকাকৃতি ধারণ করিল, তিনি বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া উকিল বাবুদের বলিলেন "what does he mean ?"

গৌরীর দৃষ্টি এতক্ষণে সে দিকে পড়িল, গৌরী চিৎকার করিয়া সেই কাঠ-গড়া মধ্যেই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। আদালতে একটা মহা হুলস্থূল বাধিয়া গেল। চতুর্দ্দিকের লোক উর্দ্ধশ্বাসে ভোলানাথকে দেখিতে ছুটিল, জজ সাহেব অগত্যা আদালতের দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বলিলেন।

তখন অনিকে খোঁজ পড়িল, জজ সাহেব তাহাকে ডাকাইলেন, অনি আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া জোড় হাত করিয়া দাঁড়াইল।

জজ সাহেব ভোলানাথকে দেখাইয়া বলিলেন "এই লোককে চেন ?"

অনি তখন জজ সাহেব ভুলিল, আদালত ভুলিল, ছুটিয়া গিয়া ভোলা-নাথের গলা জড়াইয়া ধরিয়া "ওরে ভোলা তুই কোথা ছিলি রে" বলিয়া চিৎকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল। আর কার সাধ্য সে গলা ছাড়ায়। অনেক কষ্টে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করার পর জজ সাহেব আবার বলিলেন "ঠিক তোমার ভাই ত ?"

অনি সরোদনে বলিল "খুব ঠিক সাহেব, খুব ঠিক, তুমি চিরজীবি হও, তোমার সোনার দোত কলম হোগ, তুমি দারোগা হও।"

জজ। তবে না জানিয়া শুনিয়া কেন এমন মোকদ্দমা করিয়াছিলে?

অনি। আমি কি এত জানি।

জজ। মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্যে আমি তোমার ফাঁসী দেবো।

অনি। তা এখনি, আমি ত বউকে মেরে ছিলাম, আমার ফাঁসী দেওয়াই ঠিক। দাও আমায় ফাঁসী।

জজ সাহেব তাহার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন "আজ আসামী টাকা জামিনে থাক্, কাল যাহা হয় করিব।"

গৌরীকে জামিনে খালাস করা হইল, জুরিরা বিষাদিত চিত্তে বাড়ী ফিরিলেন, শুনিয়াছি পথে কলেজের ছেলেরা তাঁহাদের গায়ে ভাল করিয়া লাল ধূলা মাখাইয়া সেই অসময়ে নাকি হোলি খেলিয়াছিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

গৌরীর মুক্তি।

গৌরীর ফাঁসী হইল না, ঘরে ফিরিল, এবার ভোলানাথ সঙ্গে আসিল। ভোলানাথের সন্দেহ ঘুচিয়াছে, ভোলানাথ বুঝিয়াছে গৌরী পতিগত প্রাণা, ভোলানাথের দুশ্চিন্তার কুয়াসা ঘুচিয়াছে।

বিচ্ছেদের পর মিলন বড় সুখের, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত; তাই আজ গৌরীর সুখের সীমা নাই। গৌরী যে স্বামীর আশা ত্যাগ করিয়াছিল সেই পরম পবিত্র স্বামী-রত্ন পাইয়াছে, আর পাইয়াছে পতির ভালবাসা। সতীর আর কি চাই?

জজ সাহেব প্রথমেই পুলিশকে লইয়া পড়িলেন। পুলিশ এ সকল সাক্ষ্য পায় কোথায়? কিন্তু সরকারী উকিল বাবু বিপদ দেখিয়া নানা ছলে নানা কৌশলে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। পুলিশের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু না হইলেও তাহাদের চরিত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিলেন। সুযোগ্য ডিঃ সুঃ বাহাদুর তাহারই বলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমোদনে দারোগা বাবুকে সাস্‌পেণ্ড করিলেন, চৌকীদার ও একজন কনেষ্টবল ডিস্‌মিস্‌ হইল। শেষে নাকি সকলেই আবার চাকরী পাইয়াছিল। ইহাতেই কি দারোগা বাবুর চৈতন্য হইল? মনে ত হয় না।

অনিকে জজ সাহেব অনেক টানাটানি করিয়াছিলেন, কিন্তু অনি অন্ধ

বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া কাজ করিয়াছিল বলিয়া তাহার আর রাজদ্বারে সাজা হইল না। সাজা হইল না বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহার অন্তরে যে ভীষণ অনুতাপ অগ্নি জ্বালিয়া দিলেন অনি তাহার জ্বালায় অস্থির হইল, হৃদয়ের সুখ শান্তি হারাইল, আর হারাইল সাধারণের সহানুভূতি। অনির জীবন চিরদিনের জন্য অসার হইল। অনি সকল হারাইল, ভোলানাথের স্নেহ, ভালবাসা, বিনয় যত্ন পর্য্যন্ত হারাইল, কিন্তু গৌরীর ভক্তি হারাইল না। গৌরী অনিকে মান্য করিত, ভালবাসিত, অনির হৃদয় ভাল বলিয়া জানিত, অনি যে ভোলানাথকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত তাহা জানিত। আর কি চাই? গৌরী কি তাহাকে ভুলিতে পারে?

ভোলানাথকে গ্রামের লোক কিছু টাকা ধার দিল, ভোলা তাহাই লইয়া দোকান চালাইতে লাগিল। ভোলানাথের প্রতি সহানুভূতি প্রযুক্তই হউক বা গৌরীর নিরুপম হৃদয়ভাব সন্দর্শনেই হউক, গ্রামের লোক ভোলার দোকান ভিন্ন কোথাও আর খাবার কিনিতে চায় না। ভোলার দিন দিন বেশ দু-পয়সা হইতে লাগিল। যে ভোলা অনির পয়সাতেও বিশেষ কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে নাই, আজি সে কপর্দ্দক শূন্য হইয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেছে!

অনি স্বতন্ত্র বাটীতে আছে, ভোলানাথের সহিত আর একত্র বাস করিতে পায় না। তাহার অর্থাদি যাহা কিছু ছিল মোকদ্দমায় নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং এই বৃদ্ধ বয়সে অনির কষ্ট হইল। অনির কষ্ট দেখিয়া এক দিন গৌরী ভোলানাথকে বলিয়াছিল "ঠাকুর ঝি না হয় এখানেই থাকুনা।"

ভোলা। কেন?

গৌরী। তার বড় কষ্ট। লোকে তাকে বড় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, আমি আর দেখ্‌তে পারি না।

ভোলানাথ ভ্রূকুটী করিয়া বলিল "তোমার মত বেহায়া আর কটা আছে?"

গৌরী। তবে কিছু কিছু মাসহারা দাও,—ধান ভেঙ্গে পরের তত্ত্ব তাবাস ব'য়ে চালাবার কি আর বয়স আছে।

ভোলা। আমার অবস্থা ত ভালই নয়, হলেও দিতাম কি না জানিনা।

গৌরী। কেন?

ভোলা। কেন?—তোমার কি সর্ব্বনাশ করেছিল ভাব দেখি।

গৌরী। তাতে ঠাকুরঝির দোষ নাই—ওঁর মনে ঠিক ধারণা ছিল যে আমি পতিতা—আমি ভ্রষ্টা, আমি তোমায় হত্যা করেছি।

ভোলা। ধারণাটা হলো কিসে?

গৌরী। চঞ্চল স্বভাবের জন্য,—বিবেচনা ত করে না, কর্‌তে পারেও না। শেষে দেশের লোক নাচালে।

ভোলা। সে তাদের কথা শোনে কেন?

গৌরী। এ তোমার অন্যায় কথা। দোষ প্রকৃত হলে আমার ফাঁসির চেষ্টা করা কি অন্যায় হচ্ছিল।

ভোলা। আমি ও কথা শুনিনে, যারা না বুঝে এত সর্ব্বনাশে উদ্যত হয়, তারা যত ভাল লোকই হোগ, আমি তাদের ভালবাসিনে।

গৌরী। ঠাকুরঝি তোমায় মার মত, মানুষ করেছে—

ভোলা সে কথায় বাধা দিয়া বলিল "দেখ গৌরী তুমি ফের্ যদি দিদির কথা বল তাহলে আমি আবার দেশত্যাগী হবো।"

গৌরী সেই পর্য্যন্ত ভোলানাথকে অনির জন্য কোন কথা বলিত না, কিন্তু গোপনে চাল, ডাল, নুন, তেল প্রভৃতি যাহা কিছু সমস্তই দিয়া আসিত। গৌরীর দয়ায়, গৌরীর স্নেহে অনির অনেক কষ্ট ঘুচিয়া ছিল। কিন্তু অনির মনের কষ্ট ঘুচে নাই—অনি মুখে ভাত দিয়া ভাবিত "আমি যে গৌরীর ফাঁসির জন্য লাফিয়ে ছিলাম, এ সেই গৌরীর ভাত, গৌরী আজ না থাক্‌লে আমায় ভিক্ষে কর্‌তে হত।"

অমনি অনির দুই চক্ষু দিয়া দর্ দর্ ধারে অশ্রুপাত হইত। অনি ভাবিত "ভগবান আমার পাপের কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে?"

অনি তুমি আরও কাঁদ, কাতর ভাবে কাঁদ, প্রায়শ্চিত্ত নাই এমন পাপ আছে কি?

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আজ পুত্রের বিবাহ। ঘরে ধূম পড়িয়া গিয়াছে, বাহিরে রোসন্‌চৌকী খাস্ রাগিণী ছাড়িয়া থেম্‌টার জংলা সুর ভাঁজিতেছে।—আসর্ ভরপুর সর্‌গরম হইয়া উঠিয়াছে। কেহ মুখে বাহবা দিতেছেন, আর যাঁর মুখ ফুটিবার উপায় নাই তিনি মনে মনে তাল দিতেছেন।

গৃহমধ্য হলুদ-মাখা কামিনীকুলে সমাচ্ছন্ন, গৃহিনী কুসুমকুমারী সমাদরে

তাঁহাদের অভ্যর্থনায় নিযুক্তা, কখন কাহারও সহিত দুটো হাসির কথা কহিতেছেন, কখন কাহাকেও কোন জিনিস বাহির করিয়া দিতেছেন, কখন কাহারও অনুযোগ শুনিতেছেন, কখন বা সেই রং মাখান কাপড়ে গাছ কোমর বাঁধিয়া মেয়েদের আহারের ব্যবস্থা করিতেছেন। গৃহিণী গৃহরাজ্যের অধীশ্বরী। মান সম্ভ্রমে সকলের শ্রেষ্ঠ, কেবল কর্ত্তার নীচে,—রঙ্গের ন-হলা। গৃহিণী না হইলে তিনি ন-ফোঁটা মাত্র, দেবর-পত্নী আট্টার উপর, কণে বৌ সাত্তার কিছু উপর। কিন্তু যখন তিনি রঙের হন, তখন বড় বাবু রঙের সাহেব তাঁহার নিচে, তাহার গৃহিণী বিবির ত কথাই নাই।—পৌত্র টেক্কা বাবুর বড় খাতির, কিন্তু গৃহিণীর তুলনায় কে? আজ কুসুমকুমারী অল্প বয়সে সেই রঙের চোদ্দ। কিন্তু গৃহিণী হওয়ার জ্বালা বড়। রমণীকুল যতদিন রঙের বিবি হইয়া গায়ে ফুঁ দিয়া, সাহেবের পাশে দাঁড়াইয়া, টেক্কা কোলে করিয়া বসিয়া থাকেন, ততদিনই সুখের ইস্তক-বিস্তি হইয়া যায়; সে বিস্তি বড় বিস্তি। তাহার উপর গোলাম ত ঘরে; গৃহিণী নহলা বর্ত্তমান, আর কি চাই? বিপক্ষের মুখ মলিন। সংসারের এমন সাজন্ত খেলা আর আছে কি?

বদ্ রঙের গোলাম ত দাস দাসী, সাহেব মেম জামাই মেয়ে, অপর টেক্কা দৌহিত্র। ফোঁটায় একাদশ হইলেও রঙের সাত্তাও তাহাকে পরাজয় করে, কিন্তু অন্য সময় তাহার প্রভুত্ব নাকি খুব বেশী। এসময়ে বিশেষত্ব সম্বন্ধে একজন বলিয়াছিলেন যে সেটী কেবল পিণ্ডদানের সময়,—অর্থাৎ যখন খেলার পর ফোঁটা গণনা হয়। সে সময় রং বদ্‌রং সকল টেক্কাই একাদশ ফোঁটা।

আজ বৌ ভাত, বাটীতে বৈবাহিক হরি বাবু, জামতা সতীশ, মাষ্টার বাবু ঈশ্বর চন্দ্র প্রভৃতি সকলে সমাগত। বৌ-ভাত হইয়া গিয়াছে, জামাই বাবু বাটীর মধ্যে একটু বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় তথায় টলিতে টলিতে হরিমতী আসিয়া উপস্থিত। হরিমতী বিবাহে বড় একটা আসিতে পারেন নাই,—আজ তাঁহার সাত দিন জ্বর। হরিমতী "বাবা সতীশ—বাবা সতীশ" বলিয়া বাড়ী ঢুকিলেন।

জামাই বাবু শশব্যস্তে "কেন মা" বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন সেই ঘরের মেজেয় হরিমতী আসিয়া শুইয়া পড়িল, দেখিয়াই বোধ হইল অবস্থা ভাল নয়, সতীশ হরিমতীর মাথাটী আপনার জানুতে রাখিয়া বলিল "অমন কর্‌চ কেন মা?"

হরিমতী যেন স্বর্গের পবিত্র ছবি প্রত্যক্ষ করিল, নন্দনের পারিজাত সৌরভ আঘ্রাণ করিল। হরিমতী আজ কার কোলে? গঙ্গা আর খুঁজিতে হইবে কেন? তিনি যেন সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে কুলু কুলু করিয়া প্রবাহিতা। এ সুখ কি তাহার ভাগ্যে ঘটিবার আশা ছিল? হরিমতী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নিশ্বাসে নাকি অভিসম্পাত আছে? কিন্তু আজি তাহার বিপর্য্যয় ঘটিল,—সেই নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ পুরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তখন সতীশের দিকে চাহিয়া বলিলেন "একটু জল।"

সতীশ জল দিলে, হরিমতী আবার বলিলেন "বাবা সতীশ, বুকটা বড় কেমন কচ্চে একটু হাত বুলিয়ে দাও ত" সতীশ তাহাই করিলেন।

একি সুখ,—ঘরে জনপ্রাণী নাই, আজ সতীশ হরিমতীর বুকে হাত বুলাইতেছে। হৃদয়ে যেন কি অমৃতধারা সিঞ্চিত হইতেছে, তাহা অপরে কি বুঝিবে? হরিমতী এত সুখ কখন কল্পনাও করেন নাই। তখন তিনি একবার স্নেহাধার সতীশের দিকে চাহিয়া বলিলেন "বাবা সতীশ আমি আর বাঁচিব না, কিন্তু তোমায় একটী কথা বলিব।"

সতীশ। বলুন।

হরি। বাহিরে কেহ নাই ত?

সতীশ ঘরের বহির্দ্দিক দেখিয়া বলিলেন "না।"

হরিমতী রুদ্ধকণ্ঠে বাষ্পাকুলনেত্রে বলিলেন "বাবা তোমার মাকে মনে পড়ে?"

"না মা, আমি তাঁকে দেখিনি।" এই কথা বলিতে বলিতে সতীশের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। হরিমতীর চক্ষে সে অশ্রুজল যেন তপ্ত অঙ্গারের মত দগ্ধ করিতে লাগিল। মনে কত কথা জাগিয়া উঠিল। হরিমতীর ইচ্ছা সে একবার প্রাণ ভরিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদে, কিন্তু পারে কই? নিজের লোক লজ্জা আবার কি? তবু পারেনা,—কলঙ্কের জন্য। কলঙ্কের আর বাকি আছে কি? তথাপি পারিল না।

হরিমতী তখন সতীশের চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল "বাপ্—আমার নয়নতারা—আমিই তোমার অভাগিনী মা।"

সতীশের গায়ে কাঁটা দিল, মাথা ঘুরিল, বলিলেন "তিনি ত স্বর্গে।"

হরিমতী ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন "অনন্ত নরকে। বাবা আমায় মার্জ্জনা কর—আমি পতিতা—আমি নিষ্ঠুরা—আমি পাপিষ্ঠা—তাই তোমা হেন নিধি ছাড়িয়া কুলে কালি দিয়াছিলাম। বাবা বল, আমায় মার্জ্জনা করিলে।"

সতীশ মার দোষ ভুলিলেন, পদধুলি লইয়া বলিলেন "পতিতা হও আর যাহাই হও—তুমি আমার স্বর্গ—তুমি আমার প্রত্যক্ষ উপাস্য দেবী, তোমার পাপের কথা আমি কি জানি মা।"

সতীশ মার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হরিমতী স্নেহভরে পুলক প্রাণে সেই বদন প্রতি তাকাইয়া বলিলেন "সতীশ, বাবা স্থির হও, কেহ দেখিলে কি বল্‌বে।"

সতীশ জ্ঞানহারা, ইচ্ছা মায়ের গলা ধরিয়া আবার কাঁদে, কিন্তু পারে কই?—এমন সময় তথায় কুসুম প্রভৃতি সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা দেখিলেন হরিমতীর চক্ষু কেমন করিতেছে, জামায়ের কোলে একটা পাচিকা প্রাণত্যাগ করিবে, এ আবার কি কথা? একটী বালিস্ দিয়া বলিল "এই বালিসে শোয়াও।"

হরি। না আমি বেশ আছি।

তখন কে একজন বলিল "তুমি ত বেশ আছ, কিন্তু লোকে থাক্‌তে দেবে কেন? পরের ছেলের কোলে তোমায় মর্‌তে দেবে কেন?"

তখন হরিমতী অশ্রুপূর্ণ লোচনে আবার সতীশের মুখের দিকে তাকাইলেন, সেই চাহনিতে যেন কত বিনয়, কত যত্ন, কত স্নেহ, কত ভালবাসা মাখান। সতীশ বলিল "না মা তুমি থাক, আমি বালিসে শোয়াব না।"

হরিমতীর যেন নাভিস্থল মথিত করিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস বহিল। তখন কত লোক কত কথা কহিতে লাগিল, কেহ বলিল "এ আবার কি আব্দার" কেহ বলিল "এই সুমঙ্গলের দিনে ঘর ফেলে পরের বাড়ী মর্‌তে আসা কেন?" ইত্যাদি। তখন সকলে সতীশকে তিরস্কার আরম্ভ করিল। কেহ বলিল "ওর শ্বশুরকে ডাক" কেহ বলিল "না ওর বাপ্‌কে ডাক" এইরূপ। সংবাদ বাহিরে গেল।

সকলে আসিতেছেন বুঝিতে পারিয়া হরিমতী বলিলেন "বাবা, আমার মাথার কাপড়টা একটু টেনে দাও ত?" সতীশ তাহাই করিলেন, তখন হরিমতী আবার ধীরে—অতি ধীরে বলিলেন "বাবা সতীশ।"

"কেন মা?"

"একটী কথা বল্‌বো।"

"বলুন্।"

"রাগ্‌বে?"

"রাখ্‌বো বই কি।"

"আমার জীবন শেষ হয়েছে।"

"তা দেখ্‌ছি।"

"আশীর্ব্বাদ করি তুমি রাজা হও—কিন্তু——

"বলুন্‌।"

"আমাব মুখাগ্নি কর্‌বে?"

"নিশ্চয় কর্‌বো।"

এই সময়ে হরিচরণ, ঈশ্বর বাবু, রমেশ বাবু প্রভৃতি সকলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, হবি বাবু হরিমতীকে দেখিয়া চমকিলেন, এ কি?—দেখিতে দেখিতে হরিমতীর অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া উঠিল, হরিমতী একবার সজলনেত্রে হরিচরণেব দিকে তাকাইলেন। ইচ্ছা হইল একবার তাঁহার পা দু'খানিতে মুখ লুকাইয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদেন,—কিন্তু হায়, সে সাধনা কই? সে সামর্থ্য কই? তখন আবার সতীশকে দেখিতে লাগিলেন, দেখা আর যেন ফুবায় না। বস্তুতঃ এ দেখা কি আর ফুরায়? কিন্তু হবিমতীকে অধিক ক্ষণ এ সুখভোগ করিতে হইল না, ধীরে ধীরে তাহার জীবন প্রদীপ নিবিল। প্রদীপ নিবিলে তাহা আবাব জ্বালা যায়, কিন্তু প্রাণের প্রদীপ একবার নিবিলে আর তাহা জ্বলেনা।

সত্যই কি জ্বলেনা, মৃত্যুব পর আর কি জন্ম হয়না? যদি হয়, তবে হরিমতী হয় ত আবার হরিচরণ বাবুর হইবেন। কিন্তু এবার কি আর পদস্খলন হইবে? জগতে কত সংসার এমনি করিয়া নষ্ট হইয়াছে, কত হাসিভরা মুখে কালিমা পড়িয়াছে! হরিমতী সাবধান, জন্মান্তরে যাহাতে স্বামীকে সুখী করিতে পার তাহার চেষ্টা কর,—তাহা হইলেই হয় ত তোমার অনুশোচনার ফল ফলিবে, নারীজন্ম সার্থক হইবে।

অনি তত্ত্ব লইয়া আসিয়াছিল, ব্যাপার দেখিতে ছুটিয়া আসিল। হরি বাবু তাহাকে চক্ষু টিপিলেন, কিন্তু অনি কি তাহা শুনে? সে ছুটিয়া গিয়া হরিমতীর মুখখানি দেখিয়া হাটের মাঝে ঢাক বাজাইয়া দিল,—বলিল "ওমা একি গো, এ যে "রাঙ্গা-বৌ।"

সমাপ্ত।

নৈশ বিহার।

(প্রথম ভাগ।)

নদীতটে।

একদা গভীর রজনীতে গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত আবাস পরিহার পূর্ব্বক স্রোতস্বিনী তটে শারীরিক শান্তি বিধানার্থ গমন করিলাম। কাদম্বিনীশূন্য নীলনভস্তলে সহাস্যবদনে শশাঙ্ক বিহার করিতে ছিলেন। কৌমুদীরাশি যেন নদ, নদী, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ইত্যাদি অসংখ্য জগৎমণ্ডলকে গাঢ় আলিঙ্গনে রত। গগন-বিহারী অগণ্য তারকারাজী অসংখ্য চক্ষু বাহির করিয়া যেন সেই প্রীতিপ্রদ ও সম্মোহন দৃশ্য অবলোকন করিতেছিল। সলিল নিশ্চল, আকাশ নিশ্চল, জগৎ নিশ্চল—সর্ব্বত্র শান্ত ও মধুরভাব বিরাজমান। এই জনতাশূন্য কোলাহলহীন জগৎ মধ্যে প্রকৃতির নিস্তব্ধতার গম্ভীর শব্দ ব্যতীত কিছুই শুনা যাইতেছিল না।

আমি নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ধীরে ধীরে বন, উপবন, প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া এক কলনাদিনী স্রোতস্বিনীতটে উপনীত হইলাম। হৃদয় পরিতৃপ্ত হইয়া গেল, মনে এক অননুভূত আনন্দের উদ্রেক হইল। আহা! এই গভীর চন্দ্রমা-শালিনী রজনীতে যিনি নদীতটে উপনীত হইয়া তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি সন্দর্শন করেন নাই, তিনি পৃথিবীর সুন্দর প্রকৃতি দেখিতে শিখেন নাই। ঐ দেখ তরঙ্গিণী হাস্যময়ী,—হাসিতেছে, নাচিতেছে, ছুটিতেছে। এক একটী বীচিমালার পশ্চাতে অসংখ্য বীচিমালা দৌড়িতেছে, আবার বিলীন হইয়া যাই-তেছে। প্রত্যেক বীচিমালার অন্তরে কৌমুদী প্রবিষ্ট হইয়া যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিতেছে। বিচী বাজি জ্যোৎস্নারাশি মাখিয়া মহা রঙ্গে দৌড়িতেছে। কি সুন্দর তর তর ভাব,—কি সুন্দর গতি! কি অশ্রুতপূর্ব্ব সুকল ললিত শব্দ! আহা! সে নিনাদে কাহার অন্তর না পরিতৃপ্ত হয়? যে শুনিয়াছে সেই জানে তাহা কি শ্রুতি-বিমোহন মোহমন্ত্রপূতঃ! এই যে কৌমুদীসহ হাসিতে হাসিতে

অসংখ্য তারকারাজি ও শশধর বক্ষে ধারণ করিয়া ছুটিতেছ, তুমি কে মা? তুমি হাসিতেছ, না কাঁদিতেছ? তুমি নাচিতেছ না কাঁপিতেছ? তোমার মধ্যে কত ভীষণ দর্শন হাঙ্গর কুম্ভীরের বাস, কিন্তু তুমি তাহাদিগকে কোন অলক্ষিত গুপ্ত প্রদেশে লুকাইয়া রাখিয়া একমনে সাগর উদ্দেশে অবিরাম গতি ছুটিতেছ। হায়! মনুষ্য হৃদয়ও তাই,—তাহাতেও কত পাপ কুপ্রবৃত্তি অহরহ বিরাজমান, কিন্তু যিনি সে সমস্ত কোন অলক্ষিত গুপ্ত প্রদেশে লুকাইয়া রাখিয়া তোমার ন্যায় নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে সেই অনন্ত উদ্দেশে ছুটিতে পারেন, তিনিই ধন্য!

এমন সময় সুদূরে একটী অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলাম এবং তাহা কি জ্ঞাত হইবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তদ্দিকে অগ্রসর হইলাম। ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম শ্মশান! হৃদয় বিকল হইয়া উঠিল। বক্ষ দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। দেখিলাম একটী চিতা জ্বলিতেছে, আর একটীতে একটী ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীর মৃতদেহ পাষাণ পরাণে, সেই কাষ্ঠাসনে, শয়ন করাইতেছে। সেই সুকুমার কমলিনী-লাঞ্ছিত দেহ কেমন করিয়া জ্বলন্ত অনলে আহুতি প্রদান করিবে? ধিক্ বিধাতঃ! ধিক্ তোমার গুণপনা, ধিক্ তোমার দয়া মায়া। তুমি কি না করিতে পার? তোমার অসাধ্য ক্রিয়া এ জগৎ সংসারে কি আছে? ধীরে ধীরে সেই চিতাতেও অগ্নি লাগিল, কেশরাশি জ্বলিয়া উঠিল, সেই সুন্দর মূর্ত্তি বিকৃতাকৃতি ধারণ করিল। চিতাপার্শ্বে রোরুদ্যমান কে একটী যুবা বসিয়াছিল, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল "প্রিয়তমে! হৃদয়নিধি! আমায় কাঙ্গাল করিয়া কোথায় যাও, আমায় কোথায় ভাসাইয়া যাও!" প্রতিধ্বনি কেবল সেই ধ্বনির ব্যঙ্গ করিল মাত্র, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। আমি একটী বৃক্ষান্তরাল হইতে এই সমস্ত হৃদ্ বিদারক দৃশ্য সন্দর্শন করিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, বিধাতঃ! এ নির্ম্মম সংসার সৃজন করিতে তোমাকে কে সাধিয়াছিল? যে আমাকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক বলিয়া জ্ঞান করে, সে একবার অনন্তকালের জন্য চক্ষু মুদিলে আর আমার প্রতি চাহিয়া দেখিবে না। যে তুমি উহু করিলে সকাতরে কারণ জিজ্ঞাসু হইত, সে এখন তুমি প্রাণত্যাগ করিলেও চক্ষু মেলিবে না! হায় রে! সংসারের সকলেই কি পর! কেহই কি আপন নহে? সকলেরই সহিত কি জীবনাবধি সম্বন্ধ? এই বিকট নাম ধারী শ্মশানে একবার জগতের চিন্তাশূন্য হইয়া নিদ্রিত হইতে পারিলে আর কাহারও সহিত কি সম্পর্ক থাকেনা? রে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্নকারী

শ্মশান! তোমার কাছে কি সকলেরই সমান আদর? কি ধনী, কি নির্ধন, কি জ্ঞানী, কি মূর্খ, কি মানব, কি মানবী, কি সুন্দর, কি কুৎসিত, তুমি সকলকেই সমান সম্ভাষণ কর। তোমার ক্রোড়ে একবার শয়ন করিলেই সকলে সমান। রাজা প্রজা সম্বন্ধ তিরোহিত হয়। কুৎসিত, সুন্দর, সমান রূপ প্রাপ্ত হয়। রে শ্মশান, তোমায় কে এমন ভয়ঙ্কর নাম নির্দ্দেশ করিয়াছে? তোমায় কে এমন কঠিন হৃদয় ধারণ করিতে বলিয়াছে? তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে মনুষ্য সকল ভুলিয়া যায়। হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার ভুলিয়া যায়, স্নেহ মমতা ভালবাসা ভুলিয়া যায়। পরের সর্ব্বস্ব তুমি নিজস্ব করিয়া লও, তাই বলি, তুমি বড় নিষ্ঠুর—বড় স্বার্থপর! যে শ্মশানে শয়ন করিলে মাতার সক্রন্দন চীৎকার ধ্বনিতে, সকরুণ স্নেহ সম্ভাষণে, আর কেহ বিচলিত হয় না; সেই শ্মশান অপেক্ষা নিষ্ঠুর পদার্থ এ জগৎ সংসারে কি আছে?

আর পা উঠেনা। হৃদয় দুর্ দুর্ করিতেছে, কে যেন হৃদয়ে কি বিষাদরাশি ঢালিয়া দিয়াছে! আমি ধীরে ধীরে চলিলাম। সুদূরে সহসা একটী মানবীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া শরীর কাঁপিয়া উঠিল। পদ উঠিল না, যেন জড়াইয়া যাইতে লাগিল। মনে হইল শ্মশান বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ভূত, প্রেত, ডাকিনী প্রভৃতি প্রেতযোনি বাস করে। তাহা ভাবিয়া হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। দেখিলাম সেই মানবী নিশ্চলবৎ রহিয়াছে, চলিতেছে না, হেলিতেছে না, দুলিতেছে না। আরও হৃদয়ে আতঙ্ক হইতে লাগিল। কিন্তু সাহসে ভর করিয়া ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইলাম। দেখিলাম একটী কদলীবৃক্ষ মাত্র। চন্দ্রকিরণে ধবল-বসন-পরিহিতা প্রেতিনী বলিয়া বিভ্রম জন্মাইয়া দিতেছিল। তখন আমার ভীতিবিহ্বল হৃদয় মধ্যে বিস্ময়সংশ্লিষ্ট একটী অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মনে মনে ভাবিলাম, যে এই প্রেতনীভ্রম বিধায়ক কদলিবৃক্ষের সহিত মনুষ্যজীবনে আশার সম্বন্ধ দেখ। আহা, মনুষ্যের আশা এই প্রকারই বটে, কুহকিনী আশা না থাকিলে মনুষ্য বাঁচিত না। মুমূর্ষু প্রায় রোগীর শিয়রে বসিয়াও আশা আশাপ্রদান করে, তাপদগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করে। সুখে দুঃখে সহায় সম্পদে আশার তুল্য আর কে আছে? আশা না থাকিলে মনুষ্য হতাশ প্রাণে আর্ত্তনাদ করিত। জীবনের সুখ শান্তি হারাইত; জগৎ সংসার চলিত না।

আমি তখন প্রকৃতির নৈশভাব প্রত্যক্ষ করিয়া সেই নদীসৈকতে উপবিষ্ট

ও নৈশসমীরণে বিগতক্লম হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, যে এই রজনীকালে কোন্ দুঃখপ্রদ বা সুখপ্রদ কার্য্য না সম্পাদিত হইতে পারে? আহা! রজনী তোমার সমাগমে কাহার অধর হাস্যময়, কেহ বা কাঁদিয়া আকুল। তোমার প্রসাদে কত প্রেমিকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতেছে, কত প্রেমিকা আনন্দ সাগরে ভাসিতেছে। আবার কত বিষাদিনী বিরহিণী, অনাথা বিধবা রমণী অশ্রুজলে বসুধার বক্ষঃস্থল বিধৌত করিতেছে। যে হাসে তাহার নিকট প্রকৃতি হাস্যময়ী, রজনী সুখপ্রদায়িনী; কিন্তু যে কাঁদে তাহার নিকট বিষাদময়ী, পূর্ণিমার রজনীতেও অন্ধকারময়ী, যাতনা প্রদায়িনী। বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত দেখ, দেখিবে কেহই সম্যক প্রকারে চিরকাল তোমাকে সুখে সম্ভাষণ করে নাই। তুমি আনন্দময়ী, কি বিষাদময়ী তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? কেমন করিয়া বলিব তুমি হাস্যময়ী কি ক্রন্দনময়ী, তুমি অপরের হাস্য ভালবাস কি ক্রন্দন ভালবাস। তুমি যদ্যপি জনমণ্ডলীর সুখকামনা করিতে, তাহা হইলে আসন্নরোগী তোমার সমাগমে কেন অধিক-তর পীড়িত হয়? তোমার আগমনে কেন রোগের বৃদ্ধি হয়? পাপীদিগের মনোবাঞ্ছা কেন অধিকতর সিদ্ধ হয়? স্বীকার করি তোমারই প্রসাদে রোমিও জুলিয়েটের প্রণয়লালসায় বা সন্দর্শন-জনিত সুখকামনায় অত্যুচ্চ প্রাচীর-শ্রেণী লঙ্ঘন করিয়া প্রাণের আশঙ্কা ত্যাগ করিয়া, হৃদয় চরিতার্থ করিয়াছিলেন! তুমি তাহাদের কথঞ্চিৎ মনোবাঞ্ছা পূর্ণিত করিয়াছিলে। আবার তুমিই সেই, যাহার সমাগমে পতিব্রতা স্বর্ণপ্রতিমা ডেস্‌ডিমোনা স্বামীর পশুবৎ আচরণে প্রাণত্যাগ করিলেন। দ্রৌপদী-রূপ-মুগ্ধ কামান্ধ কীচক বিরাটের নাট্যশালায় ভীমসেন হস্তে স্বীয় দুরভিসন্ধির সমুচিত ফলভোগ করিল। আবার মদমত্ত দৃক্‌পাতশূন্য পশু সিরাজও মিরণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিল।

রজনী তোমার নিয়মই এই, তোমার প্রসাদে কেহ হাসিবে কেহ কাঁদিবে, কিন্তু তোমার প্রসাদে কে চিরসুখী? তুমি সকলই করিতে পার, যে জগৎ দিবসে নর-কোলাহলে পরিপূর্ণ, কিন্তু তোমার সমাগমে তাহা জনশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তুমি জগতের হিতৈষিণী না ধ্বংসপ্রয়াসিনী তাহা কে বলিবে? তুমি অন্ধকারময়ী কি জ্যোৎস্নাময়ী তাহা কে জানে? তোমার উদ্দেশ্য মহৎ কি নীচ, তাহা কে বলিতে পারে?

এই যে তোমার প্রসাদে পৃথিবী হাস্যময়ী, গগনে অসংখ্য নক্ষত্রমণ্ডলী শোভা পাইতেছে, প্রকৃতি সতী মনোহর বেশ ধারণ করিয়া জন-মনোরঞ্জন

করিতেছেন, তোমার আগমনে কত মন পুলকে পূর্ণ, কত প্রমোদিনীর মুখ হাসিভরা, কত লোক হর্ষোৎফুল্ল, কত লোক হৃদয়ের দারুণ জ্বালা ভুলিয়া নিদ্রার শান্তিময় সুখদ ক্রোড়ে শায়িত। আবার কত লোক তোমার জ্বালায় হৃতসর্ব্বস্ব হইতেছে ; তোমার আগমনে অশ্রুনীর ত্যাগ করিতেছে, কত বিধবার সুতপ্ত নয়নবারি তোমার বিচিত্র বর্ণবিভার সঙ্গে মিশিয়া থাকে তাহা কে দেখিতে পায় ? কত অভাগিনী জননীর হৃদয়ের দারুণ শোক বহ্নি তোমার দেহ দগ্ধ করে তাহা কে জানে ? তাই বলি—কেমন করিয়া বলিব তুমি মনুষ্যের হিতৈষিণী কি না ?

আমি ক্ষুদ্র প্রাণী তোমার উদ্দেশ্য কি কবিয়া বুঝিব দেব ! যিনি বুঝেন তিনি সিদ্ধ পুরুষ—তিনি দেবতা ! তাই তিনি তোমার সেই বিপুল নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রশান্তভাবের কি এক অসীম চিন্তায় তন্ময় হইয়া যান। তোমার জ্যোৎস্নাময়ী রজতছটা অপেক্ষা সেই অমাবস্যার অন্ধকার তাঁহার প্রীতিপ্রদ। তখন জগৎ ভীত হয়—পাখি আর আনন্দ সহকারে ডাকিয়া উঠেনা, ইতর প্রাণী তোমার রূপবিভায় ভুলিয়া আহ্লাদ করিয়া ছুটাছুটী করেনা।—সেই মহান্‌ভাব মহান্ হৃদয়ে আশ্রয় করে—তখন তাহা এক অতি মহানের চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকে। সে ভাব আমার হৃদয়ে আসিবে কেন ? —আমি তখন ভূত, প্রেত, প্রেতিনী, ডাকিনীর ভয়ে ভীত হই। হৃদয়ে তমসাচ্ছন্ন অমাবস্যার প্রগাঢ় অন্ধকার বিরাজ করিতে থাকে, কিন্তু কই সে অন্ধকার ত ঘুচেনা ?

উদ্যানে।

একদা নিশাপতি স্বকীয় মৃদু মধুর শান্তিজনক কিরণজাল বিকীরণ করিতেছিলেন, গগনপটে অসংখ্য তারকারাজি সহাস্য আননে শশধরের চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছিল, আমি সেই মনোহর দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া বিমোহিত চিত্তে গৃহ পার্শ্বস্থ কুসুমোদ্যানে গমন করিলাম। উদ্যানের এক পার্শ্ব আলিঙ্গন করিয়া একটী সাগরাভিসারিণী নদী প্রবাহিতা। আমি তাহার তীরোপরি একটি প্রস্তরময় আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রকৃতির সেই মধুর ভাব অবলোকন করিতে লাগিলাম এবং সেইভাবে বিমোহিত হইয়া তৎপ্রণেতা

অনাদিকারণ ঈশ্বরকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। দেখিলাম,—তরঙ্গিণী বক্ষে নক্ষত্রমালা পরিশোভিত শশধর সহাস্য আননে প্রতিবিম্বিত ও মন্দ সমীরণ সন্তাড়িত হইয়া নদীবক্ষে ধীরে ধীরে নর্ত্তিত। সেই পুণ্যময়ী স্রোতস্বিনী অসংখ্য তারকারাজি বক্ষে ধারণ করিয়া সুকল স্বরে সাগরাভিমুখে গমন করিতেছে। তাহার বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই; অবিরল চল চল চলিতেছে। সহসা আমার মনে আর একটী নূতন ভাবের উদয় হইল। ভাবিলাম এই নদীজীবনের সহিত মনুষ্য জীবনের তুলনীয় কি কিছুই নাই? কিঞ্চিৎ ভাবিতে ভাবিতে প্রতীতি জন্মিল, আছে—আকাঙ্ক্ষা! সকলের নিবৃত্তি আছে, পরিতৃপ্তি বা বিতৃষ্ণা আছে কিন্তু আকাঙ্ক্ষার কিছুই নাই, তাহার চিরকালই সমান, তাহার জীবনের যৌবনে চিরবসন্ত বিরাজমান। ঐ যে নদীর জল বিনা নিবারণে, বিনা অবরোধে অনন্তকাল সাগর উদ্দেশ্যে যাইতেছে, সে যতকাল পৃথিবীতে থাকিবে, ততকাল কাহার সাধ্য যে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করে? এই জগৎ সংসারের মনুষ্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষারও ঐ ভাব। অনন্তকাল ইপ্সিত ধনের জন্য ছুটিতেছে, তাহারও নিবৃত্তি নাই, পরিতৃপ্তি নাই, বা বিতৃষ্ণা নাই। মনুষ্য যতকাল থাকিবে ততকাল কাহার সাধ্য যে তাহার আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিনিষেধ করে? কাহার সাধ্য যে তাহার মনোবেগ স্তম্ভিত করে। যেমন নদীতে স্রোতের পর স্রোত ক্রমশঃ প্রধাবিত হয়, হৃদয়গত আকাঙ্ক্ষা সমূহও তদ্রূপ; এক আকাঙ্ক্ষা প্রতিনিবৃত্ত হইতে না হইতে আবার নূতন আকাঙ্ক্ষা দ্বারা হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। যেমন স্রোত কথনও ফুরায় না, তেমনি আকাঙ্ক্ষাও ফুরায় না। কে কবে দেখিয়াছ যে অমুক লোক আকাঙ্ক্ষাশূন্য, এবং কে কবে দেখিয়াছে যে নদী স্রোতশূন্য? নদীও স্থিরা নহে—আকাঙ্ক্ষাও তাই। মনও চিরকাল স্বীয় ইপ্সিত পদার্থের অনুসরণ করিবে, নদীও তদ্রূপ করিতে কখন বিরত হইবে না। অতএব নদী এবং মানব-হৃদয়, নদীর জল ও মানবাকাঙ্ক্ষা তুলনীয়া।

আবার ভাবিলাম তাহাই বা কিরূপে সম্ভব। নদীজল বেগবান ও অনন্তকাল প্রবাহিত হইলেও সাগর পর্য্যন্তগামী কিন্তু মানবাকাঙ্ক্ষা অনির্দ্দেশ্য! কোথাও স্থিরভাবাপন্ন হইবে না। আর নদী পুণ্যময়ী, মানবহৃদয় পাপময়, অপবিত্র বস্তুও নদীর জলে প্রক্ষালিত হইয়া পবিত্র হয়, কিন্তু মানবহৃদয়ে তাহা হয় না। মানবহৃদয় দুর্গন্ধময়, সেখানে যদিও কেহ সহসা প্রবেশ করিতে পারে না, তথাপি বলিতে কি সেস্থানে গলিত পদার্থের কঙ্কালদ্বারা পরিপূরিত,

সেখানে পবিত্র বলিবার কিছুই নাই। হায়! আমি কি ভাবিতেছি? আমি এই অকিঞ্চিৎকর মানবহৃদয়ের সহিত নদীর তুলনা করিতেছি। হায় রে! এই অপদার্থ মানবজীবন হইতে সময়ে সময়ে কি পশুজীবনও শ্লাঘনীয় বলিয়া বোধ হয় না? ওহো ধিক্! কি বিড়ম্বনা! জীবন তুমি ঘৃণিত? ছি ছি! সকল জীবের শ্রেষ্ঠ মনুষ্য, তাহার জীবন অপবিত্র! যদি তাহাই হয়, তবে মনুষ্য পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিসে?

যেখানে দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, ঈর্ষা, ঘৃণা প্রভৃতি অসংখ্য জঘন্য বৃত্তিসমূহ সদত দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহা যদি পবিত্রতার আদর্শ বা আবাসভূমি হইল, তবে অপবিত্র কি? কিন্তু কি ভাবিতে ছিলাম নদীর জল ও মানব-হৃদয়, দূর হউক আর পারিনা! আমি তখন সেই চন্দ্র তারকা বক্ষে প্রতিফলিত-কারিণী, মৃদুকলনাদিনী, বীচিমালা সুশোভিনী তরঙ্গিণীকে পরিহারপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিলাম।

উদ্যানমধ্যে একটী সুন্দর তড়াগ ছিল, তাহার সুচারু কারুকার্য্যসম্বলিত ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানোপরি উপবেশন করিলাম। দেখিলাম এখানেও সেই সর্ব্বত্রবিহারী শশধর বিরাজ করিতেছেন। কৌমুদীমাখা বিকশিতা কুমুদিনী-গণ হাস্য করিতেছে। এরূপ যৌবনে পতিপ্রেমে আহ্লাদিনী কোন্ সুহাসিনী আন্তরিক আহ্লাদ লুকাইতে পারে? সে অন্তরস্পর্শী আনন্দ প্রকাশ হইবেই হইবে। কিন্তু কুমুদিনীর এত হাসি আমার ভাল লাগিল না। যে কালচক্রের চঞ্চল পরিবর্ত্তনে সতত বিঘূর্ণিত হইতেছে, তাগর এত হাসি কেন? তোমার পার্শ্বে কে দেখিয়াছ?—কমলিনী—সূর্য্যোদয়ে তাহার মুখভরা হাসি দেখিয়া-ছিলে, আবার এখন দেখ! তাই বলি—যখন হাসিবে তখন বুঝিয়া হাসিও। যখন হাসিলেই কাঁদিতে হইবে বলিয়া স্থির, তখন হাসি কেন? যদিও হাসি, এত উচ্চ হাসি হাসিব কেন? ধন, যৌবন, মান, সম্ভ্রম, যশ কিছুই নিত্য নহে; এ অনিত্য সংসারে নিত্য বলিবার বস্তু কিছুই নাই। তবে কি জন্য এত হাসিব?

আর কমলিনী তুমিও কাঁদিও না, পরের হাসি দেখিয়া তোমার হৃদয়ে বিরাগ বা দুঃখকে স্থান দিওনা। কেহ চিরকাল হাসিবে না, কেহ চিরন্তন কাঁদিবে না। এই পিশাচপুরী-সংসার ক্ষণস্থায়ী, এই ক্ষণস্থায়ী সংসারে ক্ষণ-স্থায়ী জলবুদ্বুদবৎ প্রাণ লইয়া এত কাঁদিও না। একটু ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলেই বুঝিবে যে সংসারে হাসি কান্না সমান!

যে সংসার বুঝিয়াছে, সে প্রকৃতির গুহ্য বৃত্তান্ত তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়াছে, সে আর হাসিবে না। অপর কথা কি, যিনি একটী গোলাপকে প্রিয়তমার কবরীতে সাজাইয়া দিয়া, আবার পর দিন তাহা ফেলিয়া দিয়া নূতন ফুলের অনুসন্ধান করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন এ সংসার কিসের, তিনিও বুঝি ইহজন্মে আর কখন হাসিবেন না!

গোলাপ বাগে।

একদা শারদ পৌর্ণিমা নিশিতে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। তখন রাত্রি তুই দণ্ড অতীত হইয়াছে। নীলাকাশে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া, কুমুদিনীনায়ক মৃদু মধুর আলোক বিকীরণ করিতে করিতে, হাসিতে হাসিতে—প্রকৃতি সতীকে মনমোহন বেশে সুসজ্জিত করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিতেছিল। আমি একটী বিস্তৃত ক্ষেত্রমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সেই শোভা অভূতপূর্ব্ব বলিয়া বিবেচনা করিতেছিলাম। চন্দ্রকিরণের বিপরীত দিকে বৃক্ষগণের ও গৃহসমূহের যে ছায়া পতিত হইয়াছিল, তাহা আমার মনের আরও আনন্দ বিধান করিতে লাগিল। কেন—তাহা জানি না। বাঙ্গালীর তাপদগ্ধ হৃদয়ে শিতরশ্মির শীতল ছায়া আনন্দপ্রদ বা চন্দ্রকর-কিরীটিনী ছায়া বলিয়া বড় সুন্দর বোধ হইতেছিল, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহাই হউক আমি সেই ছায়াসকলের অপূর্ব্ব মধুরিমা বিলোকন করিতে করিতে ক্রমশঃ চলিলাম, যাইতে যাইতে বর্দ্ধমান-মহারাজের "গোলাপ বাগে" উপস্থিত হইলাম।

পাঠক! সেই পূর্ণিমা-রাত্রে আমি গোলাপবাগকে যে কি সুন্দর দেখিলাম তাহা আর তোমায় কি বলিব। সে সৌন্দর্য্য আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা পরিব্যক্ত করা আমার সাধ্যাতীত। আহা! কি ফুলের হাট রে! আমার চতুর্দ্দিকে যেন কত ফুল খল খল করিয়া হাসিয়া হাসিয়া নাচিতেছিল তাহা আর তোমায় কি বলিব! আমার বোধ হইল যে ফুলেরা বুঝি আমায় বিদ্রূপ করিতেছে। আমি কম্পিত হৃদয়ে মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলাম "ফুল তোমরা হাসিতেছ কেন?" ফুল যেন বলিল "তোমরা নাকি বড় হাসি ভালবাস, দুঃখের সময়েও হাসির লহরী তুল, তাই হাসিতেছি।"

নৈশ-বিহার।

বাস্তবিক বলিতে কি কথাটি আমার বড় প্রাণে বাজিল; আমরা দুঃখের সময়ে হাসি? হাসির প্রকৃত অর্থ জানি না? ভাবিলাম তাহাই বটে! এই ঊন-বিংশ শতাব্দী—এ সময় দুঃখের কি সুখের তাহা জানি না, কিন্তু ইহা হাসিরই সময় বটে। এই শতাব্দীতে বঙ্গবাসীকে দেখিয়া বিদেশীরা হাসে, আর আমরাও (কেন তাহা জানি না) আপনা আপনিও হাসি। যে দিন পাশ্চাত্য ভাষা বঙ্গীয় বালকের উপদেশার্থ রাজ পুরুষ কর্ত্তৃক প্রথম মনোনীত হয়, সে দিন বঙ্গবাসীমাত্রেই একবার উচ্চ হাস্য করিয়াছিল। তাহার পর যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য জ্ঞান, পাশ্চাত্য রীতিনীতি কথঞ্চিৎ বঙ্গভূমে পদার্পণ করিল, তখন বঙ্গভূমে আবার উচ্চহাসির লহরী উঠিল। পরন্তু যে সময় প্রথম সমাজ-সংস্কারক বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন, তখনও বঙ্গভূমে হাসির সীমা রহিল না। তাহার পর বর্ত্তমান বঙ্গীয় যুবকেরা শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত হইয়া জন্মভূমির বর্ত্তমানাবস্থায় হাস্য করিতেছে, আমারাও তাঁহাদের দেখিয়া হাসি-তেছি। আবার আমাদের হাসি দেখিয়া ফুল হাসে! আমি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তথা হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলাম। যে দিকে ফুল আছে সে দিকে আর যাইলাম না। পরিখার দিকে যাইলাম, দেখিলাম "নিবাতনিষ্কম্প" পরিখানীর যেন কাল রঙ্গে বিষাদের চিহ্ন জ্ঞাপন করিতেছে, আমি অবাক্ হইলাম। মনে করিলাম জলের কাছেই বসিব, কারণ যাহার হৃদয়ে বিষাদ, তাহার উৎসবে আনন্দ নাই। জলের সহিত সখ্যতা করিতে স্বগত জিজ্ঞাসা করিলাম, "জল! তুমি এত বিষাদিত কেন?" জল যেন আমার কানে কানে বলিল "আমায় যে এত যত্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহার হৃদয় সান্ত্বনা করিতে পারি না এই জন্যই আমি এত বিষণ্ণ, আর কে জানে কেমন মনুষ্যের প্রাণ, যে অনলে মনুষ্য দগ্ধ হয়, সে অনল আমি শান্ত করি, কিন্তু ঈশ্বর জানেন যে মানবহৃদয়ে কি আগুন আছে যে তাহা নির্ব্বাপিত করিতে পারি না।" জলের কথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল, সে জল গণ্ড বহিয়া সলিলে নিপতিত হইল। সলিল যেন চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমাদের চক্ষে কি আগুন আছে, নতুবা ইহা এত উত্তপ্ত কেন?" আমি কি উত্তর দিব স্থির করিতে না পারিয়া মৃদুস্বরে বলিলাম "ভাই জল, তুমি অপেক্ষা কর আমি আসিতেছি।" জলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শপথ করিলাম যে তাহার নিকট আর যাইব না।

সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া কতকদূর যাইয়া একটী একতল গৃহ দেখিতে

পাইলাম। তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখি যে তাহা নানা জাতীয় জীবদ্বারা পরিপূর্ণ। কোথাও ব্যাঘ্র, কোথাও ভল্লুক, কোথাও বা জম্বুক, কিন্তু সকলেই বিমর্ষ, আজি যথা তথা এই বিমর্ষভাব অবলোকন করিয়া অধিকতর বিষণ্ণ হইলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া একটি সিংহকে দেখিতে লাগিলাম, সিংহটি একটি প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল; ভাবে বোধ হইল আমাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে "মনুষ্য! তুমি না সকল জীবের শ্রেষ্ঠ জীব? তোমরা যদি পরাধীনতা শিক্ষা দিবে তবে আর উপায় কি?" আবার যেন পদমধ্যে মস্তক লুক্কায়িত করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল "ভাল ভাই! জিজ্ঞাসা করি এই ভূমণ্ডলের কোন সম্ভ্রান্ত জীবের স্বাধীনতা হরণ করা কি তোমার জাতির উচিত? দেখ আমিও এক সময়ে তোমাদিগকে এইরূপ তুচ্ছজ্ঞান করিতাম। আমিও এক সময়ে হিমগিরির উচ্চশৃঙ্গে সমাসীন হইয়া এই লাঙ্গুল বিস্ফোটন পূর্ব্বক কতই আত্মগরিমা দেখাইয়াছি। ভাই বল দেখি, তখন তুমি আমাকে দেখিলে কি করিতে? তখন কি এই রূপে আমার নিকটে আসিয়া, এইরূপ বঙ্কগ্রীব হইয়া, দাঁড়াইতে পারিতে? তাহা দূরে থাকুক, তখন তুমি আমার আবাসস্থানের নামমাত্র শ্রবণে, সে পথে যাইতেও সাহসী হইতে না। সে কথা যাউক, তুমি কি বিবেচনা কর যে তুমি পরাক্রমে আমাকে এ অবস্থাপন্ন করিয়াছ? যদি তাহাই ভাবিয়া থাক, তবে ভাই, একবার আমাকে ছাড়িয়া দিয়া দেখ। আরও ভাই ভাবিয়া দেখ, তোমারই কি চিরদিন এইরূপ যাইবে? এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে তুমি কি চিরদিন এই অবস্থায় থাকিতে পাইবে? দেখ তোমার সে রাম কোথায়? সে পাণ্ডব কোথায়? সে সামগ ঋষিকুল কোথায়? অধিক কি এই যে তুমি আজি আমাকে দেখিবার নিমিত্ত এইস্থানে আসিয়া মনের সন্তুষ্টি বিধান করিতেছ, আজি কি তুমিও আমার ন্যায় তোমার সংসার পিঞ্জরে আবদ্ধ নহ! কিন্তু তোমার সে জ্ঞান নাই, তুমি মায়ার মুগ্ধ হইয়া জীবনের মহা উদ্দেশ্য ভুলিয়া আছ—আমার এ পরাধীনতা তাহার কাছে ছার!" আমার হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল, তীব্রবেগে ধমনীতে রক্তস্রোত প্রধাবিত হইল, লজ্জায় মস্তক অবনত হইয়া আসিল, পা আর উঠেনা। পশু তাহাকে আবার লজ্জা কি? কে জানে আমার বড় লজ্জা হইল, আমি অনেক কষ্টে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। বড় ধিক্কার হইল, মনে করিলাম আর এ স্থানে থাকিয়া কাজ নাই চলিয়া যাই। কতকদূর যাইয়া একটী সুন্দর দৃশ্য

দেখিতে পাইলাম। লতাবৃতি পরিবৃত সুন্দর বর্ত্ম সমূহ; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম,—দেখিলাম কত শত পথ রহিয়াছে, আবার কতকদুর যাইয়া দেখিলাম সে পথ বন্ধ। প্রত্যাবৃত্ত হইলাম, পথ নাই, আবার অন্যদিকে যাইলাম, এইরূপে অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তাহার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলাম। পাঠক! এটী কি তাহা জান? "গোলোক ধাঁধা।" এমন সুন্দর বস্তু আমি ইহজন্মে দেখি নাই। আহা ইহার প্রত্যেক পথ সংসার চক্রের চঞ্চল পরিবর্ত্তনের সাক্ষ্য দিতেছে। মরি! মরি! কোন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা। যিনি এই ধাঁধা প্রস্তুত করিয়াছেন তাঁহার পদরেণু গ্রহণ করিবার বাসনা হয়, কারণ তিনি সংসারে যে কি প্রকারে ধাঁধা মানবকে ভ্রান্ত করে তাহা বুঝিয়াছিলেন, সংসারে কত প্রকার ধাঁধা আছে তাহা জানিতেন। কিন্তু ধাঁধা লাগায় কে? আশা! বটে ত, আশাই ত আমায় এখানেও ধাঁধা লাগাইয়া দিল। দেখিতে গেলে পৃথিবীর সকল *কার্য্যের সহিত গোলোক ধাঁধার তুলনা করা যায়। প্রথম দেখ—আশা!* আমি এক আশা করিলাম, কিন্তু অন্য প্রকার ফল হইল। গোলোক ধাঁধার এ পথে গেলাম, দেখিলাম পথবন্ধ। বস্তুতঃ সাংসারিক প্রতি কার্য্যেই এই ঘটনা পরিদৃশ্যমান! বাল্যে পিতা মাতা, কৈশোরে ভগিনী ভ্রাতা, যৌবনে প্রিয়তমা, প্রৌঢ়ে পুত্র কন্যা, বার্দ্ধক্যে পৌত্র পৌত্রী—তোমায় সংসার ধাঁধা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে—কিন্তু বুঝিবে কে?—তাই বলি সংসার তোরে বলিহারি! আর গোলক ধাঁধা নির্ম্মাণকর্ত্তা তোরেও বলিহারি!

সুধু তাই নয়,—সংসারের কার্য্যকারিতা দেখ, আর আমার এই সর্ব্ব-সন্তাপহারী গোলক ধাঁধার কার্য্যকারিতা দেখ। এত ক্লেশ করিয়া মধ্যস্থলে আসিয়াছি, আর কি, এবার ইচ্ছামত যেখানে সেখানে বেড়াইব—বাহিরে যাইব। ওমা! এ আবার কি? আবার যে সেই ধাঁধা! সংসারেও এ ক্রীড়া বিরল নহে, ধোঁকার মজা সংসারে প্রচুর। যৌবনে কত শত ধাঁধা চরণে বিদলিত করিয়া জীবনযাত্রা যেন তেন প্রকারেণ নির্ব্বাহ করিলে। মনে করিলে বার্দ্ধক্যে সুখী হইবে, কিন্তু তাহা কোথায়! আবার যে ধাঁধা সেই ধাঁধা। প্রথম জীবনে মাতা পিতা হারাইলে, যৌবনে তোমার দক্ষিণ হস্ত, বশম্বদ ভ্রাতা তোমায় ত্যাগ করিল, পুত্র উপযুক্ত হইয়া উঠিতেছে, আর চিন্তা নাই, কিন্তু ঈশ্বর তোমায় আবার ধাঁধার আবর্ত্তে ফেলিয়া তাহাকেও আত্মসাৎ করিলেন। মনে করিলে তোমার কনিষ্ঠ পুত্র তোমার

বার্দ্ধক্যের একমাত্র সহায় হইবে। হরি! হরি! সব গেল, তোমার সেই অন্তিমকালে, তোমার জীবন দীপের সেই স্তিমিতপ্রায় সময়ে,—যখন বিভীষিকাময়ী সংসার তাহার সহস্র জিহ্বা বাহির করিয়া তোমার অস্থি লেহন করিতে উদ্যত, সেই সময়ে তোমার একমাত্র সহায়, অন্ধের যষ্টি, আশার প্রদীপটীও নিবিল, এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে! কিন্তু উপায়ই বা কি? উপায় নাই সত্য, কিন্তু ধাঁধা ঘুচেনা কেন? আমি সেই চিন্তায় গাঢ়রূপে নিমগ্ন হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

শৈল শিখরে।

বসন্তের নব অভ্যুদয়,—নব শ্যামবরণে যখন প্রকৃতিসতী সজ্জিতা, যখন মলয়হিল্লোলে কি জীব কি উদ্ভিদ্ সকলকেই নবরসে উত্তেজিত করে, পিকবর আপন সুমধুর স্বরে জগতস্থ জীব সম্প্রদায়ের হৃদয়ে নবভাব সমুদিত করে, যে সময়ে লতায় পাতায় মহীরুহে অপূর্ব্ব আরণ্য প্রণয়ের মোহিনীমূর্ত্তি বিরাজমান, আমি সেই মনোহর সময়ে একদা কোন পর্ব্বতে শ্রান্তিদূর করিতে যাই। সে নবমীর রাত্রে পর্ব্বতের কৃষ্ণ কলেবরে যেন জ্যোৎস্না হাসিতেছিল। সে দৃশ্য অভূতপূর্ব্ব মনোহর, আমি অনেকক্ষণ অতৃপ্তনয়নে সেই সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিলাম, পরে তাহার সেই কুটিল পথাবলম্বন করিয়া সেই পর্ব্বতশিখরে উপস্থিত হইলাম। এ আবার নূতন দৃশ্য আমার মস্তকোপরি সুনীল নৈশাম্বরে মধুর হাসি হাসিয়া বাসন্তীয় চন্দ্র ক্রীড়া করিতেছে; পাঠক! চাঁদের ক্রীড়া দেখিয়াছ? এ ক্রীড়া তোমার আমার সহিত নহে,—কাদম্বিনীর সহিত, মধ্যে মধ্যে দুই একখণ্ড সুদৃশ্য শ্বেত মেঘখণ্ডের সহিত সেই নবমীর শশধর ক্রীড়া করিতেছিল, এক একবার নীরদখণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া আপন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মৃদু আভা প্রকাশ করিয়া জগতে এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃজন করিতেছিল, আবার কখন বা সহসা তন্মধ্য হইতে বাহির হইয়া জগৎসংসারকে হাসির তরঙ্গে ভাসাইতেছিল। জানিনা যে প্রকৃতির সহিত চন্দ্রের কি সম্বন্ধ, কিন্তু আমি সেই অত্যুচ্চ স্থল হইতে দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছিলাম যে চন্দ্রের সহিত প্রকৃতির অতি নিকট সম্বন্ধ; প্রকৃতি চন্দ্রের অদর্শনে যেন মলিন ও বিষণ্ণ এবং তাহার দর্শনে আনন্দে উন্মত্ত হইতেছিল।

আহা! চন্দ্র যখন তাহার ক্ষুদ্রবদন জলদখণ্ডে আবৃত করিতেছিল, তখন দূরস্থ নদীর এক অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় নদীর সহিত চন্দ্রের বড় সখ্যতা; চন্দ্রের অদর্শনে নদী যেন ভয়াবহ শোকের চিহ্ন প্রকাশ করিতেছিল, সে চিহ্ন কি তাহা একবার এইরূপ সময়ে দেখিও তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ আবার যখন সহাস্যবদনে সুধাংশু দেখা দিতেছিল, তখন তাহার আনন্দের কথা কি বলিব! নদীবক্ষ যেন শতভাগে বিভক্ত হইয়া নৃত্য করিতেছিল। আমি নিঃশঙ্ক হৃদয়ে শৈলশিখরে উপবিষ্ট হইয়া কখন নিশানাথের হাসি, কখন প্রকৃতিব মধুর ভাব, কখন বৃক্ষবল্লরীর নৃত্য, কখন বা আরণ্য প্রণয় দৃষ্টি কবিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হৃদয়ে নবীন ভাবকে প্রতিষ্ঠা করিতেছিলাম। তখন একটী আরও সুন্দর দৃশ্য অবলোকন কবিলাম, দূরবর্ত্তী শিখরদেশ হইতে নিম্নস্থ চন্দ্রকিরণের, কখন বৃক্ষপত্রের সহিত, কখন বা নদী বা জলের সহিত ক্রীড়া। সে সৌন্দর্য্য যে কি অপূর্ব্ব তাহা কি বলিব! আমি অনেকক্ষণ এইরূপে প্রকৃতিশোভায় বিমোহিত হইয়া উপবিষ্ট রহিলাম, পরে পর্ব্বতসম্বন্ধে আমার হৃদয়ে আর একটী নবভাবের উদয় হইল।

আমি সেই শৈলশিখর হইতে সুদূরস্থিত পল্লীনিবাসিগণের অবস্থা ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল মনুষ্য তোমরা এক, কিন্তু তোমাদের হৃদয়ের এত বিভিন্নতা কেন? এই ত রজনীকালে কি ধর্ম্ম ভীরু, কি পাপী, কি জ্ঞানী, কি মূর্খ সকলেই অচেতনপ্রায় নিদ্রিত, সকলেরই এক কার্য্যকারিতা, কিন্তু যেই নিদ্রা ভাঙ্গিবে আর পবস্পরে বিভিন্ন হৃদয়ধারণ করিয়া জড় জগতের ভীতি সম্পাদন করিতে থাকিবে। তখন মনে হইল রজনী তোমার ক্ষমতা ধন্য, তুমি এই অসংখ্য জীব সম্প্রদায়কে কি অদ্ভুত ইন্দ্রজালবলে অকর্ম্মণ্য অবস্থায় অবস্থাপিত কর! নরকে শিক্ষা দাও যে মনুষ্য তোমার ক্ষমতা অতি অল্প, অতি সামান্য, তুমি মোহমদে ভ্রান্ত হইয়া আর আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করিও না। তোমার জ্ঞানের বিনোদপথ রজনী ঐ দেখ তোমাকে ইঙ্গিত করিয়া, তাহার বিনোদচক্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া তোমায় শিক্ষা দিতেছে,—নর তুমি নম্র হও, স্বভাবের নিকট আত্মপরীক্ষা দাও, বিনীত হইতে শিক্ষাকর, তাহা হইলে তোমার জীবনপথ নির্ব্বিঘ্ন হইবে, নতুবা এই জীবনে পদে পদে পদস্খলিত হইবে; আত্মজ্ঞান হারাইবে, আর আর্ত্তনাদ করিবে।

দেখ, মানবজীবন কি আশ্চর্য্য, কি অদ্ভুত, আবার কি কিম্ভূতকিমাকার,

ইহা একপক্ষে কত প্রীতিপ্রদ ও অপরপক্ষে কি ভয়াবহ! এই অসংখ্য শরীরী মধ্যে কত ধার্ম্মিক, কত পরহিতকারী, কত পরসুখে সুখী। আবার কত পাপী, পরশ্রীকাতর, পরানিষ্টকারী রহিয়াছে। কত উন্নত-মনা, সরল, কত নীচহৃদয়সম্পন্ন ক্রূর! পাঠক! তুমি একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ, দেখিবে আমার আশ্রয়স্থান পর্ব্বত এই জড়জগতের প্রধান আদর্শ, এই জগৎসংসারের মনুষ্যজীবনে যাহা আছে, তাহা এই পর্ব্বতে দেদীপ্যমান। দেখ এই অভ্রভেদী পর্ব্বত অসংখ্য জীবজন্তু ও পাদপশ্রেণীকে অক্ষুণ্ণ মনে আশ্রয় প্রদান করিয়া উন্নত মনের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহার কুটিলপথ ক্রূর হৃদয়ের আদর্শ। তরুগণে লতাবেষ্টনী প্রেমিকার আদর্শ, উচ্চশির মহীরুহ যোগীর প্রতিমূর্ত্তি, সরিজ্জল তৃপ্তির আলয়, ফল সঙ্কুল বৃক্ষ দাতার প্রতিরূপ, গন্ধবিহীন কীটাকীর্ণ পুষ্প বারবনিতার স্থানীয়। তিক্ত ফলাবনতবৃক্ষ কৃপণ সদৃশ। দেখ এখানে কত সুরভিপুষ্প নির্জ্জনে বিকশিত হইয়া অলক্ষ্যভাবে লয়প্রাপ্ত হইতেছে, ইহ সংসারের জ্ঞানীর জ্ঞানপ্রকাশের অনুপায়, বা অনেচ্ছার পরিচায়ক। আবার ঐ দেখ কণ্টক বৃক্ষমধ্যে একটী সুধাধার ফলের বৃক্ষ। কণ্টকবৃক্ষ তাহার বিকাশ ধ্বংস করিয়াছে, তাহাকে ফলাবনত হইতে দেয়না। ইহা সংসারের কুসংসর্গের দেদীপ্যমান মূর্ত্তি।

আবার দেখ, কোথাও শার্দ্দূল, কোথাও সিংহ, কোথাও বা নিরীহ মেষ বাস করিতেছে। উদারচেতা নদী—সন্তোষের সহিত সকলকেই পরিতৃপ্ত করে, মেষকে যেরূপ শীতল সলিল প্রদান করে, মেষহন্তা শার্দ্দূলকেও তদপেক্ষা নিকৃষ্ট পানীয় দেয়না। শার্দ্দূলের পরিতৃপ্তি মেষে, আবার মেষের সন্তোষ তৃণে, নদী তাহার বিচার করেনা; স্রোতস্বতী আপন কার্য্য করিতেছে, তাহাদের ফল তাহারা আপনি পাইবে। ব্যাঘ্র বৃদ্ধাবস্থায় অনাহারে দিনযাপন করে, কিন্তু মেষের বৃদ্ধাবস্থাতেও আহার্য্য প্রচুর। ইহারা মনুষ্যকে দুরাকাঙ্ক্ষা ও মিতাকাঙ্ক্ষার শিক্ষা প্রদান করে। ব্যাঘ্রগণ ইহজগতের নরহত্যাকারী নর ব্যাঘ্রের আদর্শ, মেষ ভদ্রশ্রেণী।

আমি অনেকক্ষণ এইরূপে চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে নবমীর শশধর বিশ্রাম গ্রহণ করিল, আমি একাকী সেই জনশূন্য দুরারোহ শৈলশিখরে ভীতি বিহ্বলচিত্তে উপবিষ্ট রহিলাম। উপায়ান্তর নাই, সেই ঘোর অন্ধকারে পর্ব্বতের সেই কুটিল পথাবলম্বন করিয়া অবতরণ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। একে একাকী তাহাতে সেই শ্বাপদসঙ্কুল স্থান, বাঙ্গালির হৃদয়ে এতদবস্থায় পতিত

হইলে যে কি ভাবের উদয় হয়, তাহা বাঙ্গালিকে বুঝাইতে হইবে না। যতদূর সাধ্য একটী নিরাপদ স্থান বাছিয়া লইলাম। সাহসে ভর করিয়া তথায় রাত্রিযাপন করিতে বাধ্য হইলাম, তখন পর্ব্বত ভয়াবহ কৃষ্ণাম্বর ধারণ করিয়াছে; সে মূর্ত্তি অবলোকন করিলে হৃদ্‌কম্প হয়, আমি একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করি, আর আতঙ্কে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে . আকাশের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম, দেখিলাম সে পূর্ব্বশ্রী নাই, ঘোর কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, শশধরকে না দেখিতে পাইয়া তারকাগণ যেন তাহাদের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছে, প্রকৃতির এই বিভীষিকাময়ী দৃশ্য অবলোকন করিয়া আমি সমধিক বিস্ময়ান্বিত হইলাম। দেখিতে দেখিতে গগনপ্রাঙ্গণে দুই একখণ্ড মেঘ দেখা দিল, ক্রমশঃ মেঘমালা ঘনীভূত হইয়া গগনপট সমাচ্ছাদিত হইল, একে একে একটী একটী করিয়া সকল তারাই যেন বিষাদে আপন আপন চক্ষু মুদিল। ক্রমে মুষলধারে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন চন্দ্রবিহনে তারকারাজী শোক প্রকাশ করিয়া কাঁদিতেছে। চপলা ছুটিয়া ছুটিয়া যেন চতুর্দ্দিকে শশধরের অনুসন্ধান করিতেছে, দেখিতে না পাইয়া মধ্যে মধ্যে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বিষাদের চিহ্ন জ্ঞাপন করিতেছে। আমার বক্ষ দুর্ দুর্ করিতে লাগিল, আমার সেই পূর্ব্ব আশ্রয়ে ভীতিবিহ্বল চিত্তে বিকম্পিত হৃদয়ে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত রহিলাম। ক্রমে আমার অজ্ঞাতসারে নিদ্রাকর্ষণ হইল, আমি অচেতন হইয়া নিদ্রাভিভূত হইলাম। যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন দেখি পূর্ব্বাকাশে রক্তিমবরণে তপনদেব সমুদিত, তাঁহার প্রখর রশ্মি শৈলশিখর আচ্ছাদিত করিয়াছে, সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী বক্ষে সেই স্নুবর্ণরশ্মি ক্রীড়া করিতেছে। সুদূরে নবদূর্ব্বাদলে সেই স্বর্ণসম প্রভাসম্পন্ন বর্ণ ক্রীড়া করিতেছে। অনন্ত প্রকৃতি রাজ্য সেই শোভান্বিত হইয়া পরম রমণীয়ভাব ধারণ করিয়াছে। দেখিলে মন মোহিত হয়, হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। আমি অনেকক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে সেই মনোমুগ্ধকর বিপুল শোভা দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু দেখিয়াও যেন আশা মিটেনা, হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়না। তখন আমার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, মনে হইল প্রকৃতি যেন আমার বিষাদময়ী চিত্তকে শান্তিশিক্ষা প্রদান করিতে গত নিশিতে সেই ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। ভাবিলাম মানব, তুমি প্রকৃতি হইতে শান্তি শিক্ষাকর, ধৈর্য্য শিক্ষাকর—তোমার জীবনের দিনে চির-পূর্ণিমা রহিবে না, বা চিরকাল তাহা ঘনঘটা-তমসাচ্ছাদিত থাকিবে না, জীবনে সুখ দুঃখের ওতপ্রোত ভাব অবশ্যম্ভাবী। ধৈর্য্যচ্যুত হইও না, নিরাশ

হইও না, ক্রমে তোমার হৃদয়াকাশ হইতে মেঘমালা বিদূরিত হইয়া সূর্য্যের প্রখররশ্মি দেখা দিবে। আর তোমার জীবন গগনে সুধাংশু সমুদিত দেখিয়া একেবারে আহ্লাদে অধৈর্য্যও হইও না, তাহাতে আবার ঘনঘটার সমাবেশ অসম্ভব নহে। সে যাহাই হউক পর্ব্বতের কি দুঃখে কি সুখে এই সমভাব ও প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। আমি পর্ব্বতের এতাদৃশ উন্নত ভাবকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে দিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

সমাপ্ত।

কমলকুমারী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মাতা ও কন্যা।

জ্যৈষ্ঠ মাস, বেলা প্রায় সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, প্রখর তপনের কিরণজালে মহানগরী দিল্লী বিদগ্ধ প্রায়। লুই ছুটিতেছে, কাহার সাধ্য ঘরের বাহির হয়। রাজপথ উত্তপ্ত, গৃহের প্রস্তর রাশি উত্তপ্ত, প্রশান্ত যমুনার সুনির্ম্মল সলিল রাশিও সেই সঙ্গে উত্তপ্ত হইয়া যেন সেই বিশ্ব-স্রষ্টার মহাপ্রচণ্ড ভাবের পরিচয় দিতেছে। ছাদে অন্ন ছড়ান আছে, শুকাইয়া যাইতেছে—কিন্তু একটীও বায়স নাই; সকলেই বৃক্ষশাখার স্নিগ্ধছায়ায় লুকাইয়া আছে। পথে লোক নাই বলিলেই হয়, সকলেই গৃহাদির নিম্ন তলে আশ্রয় লইয়া শ্রান্তি দূর করিতেছে, ভীষণ উত্তাপ হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে। এই সময়ে সেই সৌধ কিরীটিনী মহানগরীর উত্তর প্রান্তস্থ প্রান্তরের একটী কুটীর দ্বারে একটী দীনা মলিনা বৃদ্ধা করকপোলিতা হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। ঘোর দারিদ্র্য, ঘোর দুশ্চিন্তা যেন তাঁহার চির সহচরী। তাঁহার সেই কঙ্কালসার ললাটে বিধাতা যেন তাঁহার লৌহ লেখনী দ্বারা দরিদ্রতার ভীষণ চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছেন। সেই জ্যোতিঃহীন কোটরা-শ্রয়ী চক্ষু যেন সংসারে বিষাদময়ী চিত্রের বিষণ্ণভাব সন্দর্শন করিতে বদন মধ্যে স্থান পাইয়াছে। বৃদ্ধা স্থিরদৃষ্টে পথপানে চাহিয়া যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে দুই একটী হৃদয় বিদারী দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে।

বিশ্বপতির সকল কার্য্যই অদ্ভুত। তাঁহার সুখ, দুঃখ, দয়া মায়ার কথা আমরা বুঝিনা। সংসারে কেহ হাসে কেহ কাঁদে। কিন্তু হাসি কান্নার আবার উত্তর বিশেষ কত। হাসির সঙ্গে সঙ্গে কাহারও কান্না দেখা দেয়, কাহারও বা কান্নার সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসি দেখা দেয়, কাহারও বা কান্নার উপর কান্না। সে ক্রন্দনের আর শেষ নাই।

মানব ক্রন্দন ভালবাসেনা, আপনিও কাঁদিতে চায়না, পরকেও কাঁদিতে

দেখিলে কষ্ট পায়। কিন্তু সেই হাসি কান্না যাঁহার আজ্ঞাবহ তাঁহার অসীম হাসির ভাণ্ডার বর্ত্তমান্ থাকিতেও কেন যে লোকে কাঁদে তাহাই ত বুঝা যায় না।

বৃদ্ধার রোদন বড় সহজ নহে। তাহার সুখের সংসার ছিল। পুত্র কন্যায় গৃহ সুশোভিত ছিল, স্বামীর স্নেহ ভালবাসায় হৃদয়পূর্ণ ছিল। কমলার কৃপায় দুঃখের নামও জানা ছিল না। কিন্তু জানিনা সেই নির্ম্মল হৃদয়াকাশে কেন সহসা চির দুঃখের কাল মেঘ দেখা দিল। তিনি ক্রমে ক্রমে কমলার কৃপা হারাইলেন, পুত্র কন্যা হারাইলেন, প্রাণাধিক স্বামী হারাইলেন। যাঁহার সংসার বালক বালিকার মধুর হাসিতে প্রমত্ত ছিল, সেখানে দীর্ঘনিশ্বাস ভিন্ন এখন আর কিছুই নাই। যিনি প্রাসাদোপম অট্টালিকা মধ্যে অসূর্য্যম্পশ্যা ভাবে বাস করিতেন, তাঁহার আজি পর্ণকুটীরে বাস। আজি তিনি নিঃসম্বল নিঃসহায়—যাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পাইলে দাস দাসীগণ কৃতার্থ জ্ঞান করিত, তিনি আজি মুষ্টিমেয় উদরান্নের জন্য লালায়িতা, আর কি চাই? মনুষ্যের ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? বৃদ্ধার এখন সম্বল একটী মাত্র কন্যা, কিন্তু উদরান্নের সংস্থান নাই। নিজের চক্ষু নাই, চলিবার শক্তি নাই। বালিকার ভিক্ষালব্ধ অন্নই এখন তাঁহাদের জীবিকা। আরও কষ্টের কি বাকি আছে?

বৃদ্ধা করকপোলিতা হইয়া পূর্ব্বের সেই সুসময়—পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করিতেছিলেন। মনে কত কথার উদয় হইতেছিল। হায়, তাঁহারও যে একদিন সুদিন ছিল একথা তাঁহাকে দেখিলে আর কে বিশ্বাস করিবে?

বৃদ্ধা ভাবিতেছিলেন "ভগবান আর কেন? এত দুঃখ দিয়াও কি তোমার আশা মিটে নাই, আর যে দেখিতে পারিনা, চরণতলে স্থান দাও।"

বস্তুতঃ এমন অবস্থা সংসারে বড় বিরল, কিন্তু এত দুঃখেও বৃদ্ধা ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন হয় নাই। কৃতঘ্নের ন্যায় তাঁহার নিন্দা করে নাই—এখনও যে কন্যাটী আছে ইহাই তাঁহার আনন্দ, এই জন্য তিনি ঈশ্বরের যেন কত অনুগৃহীতা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বালিকা, এই দারুণ রৌদ্রে কোথায় ঘুরিতেছে, কোথায় ভিক্ষা করিতেছে তাহার স্থির আছে কি? মানুষ যে ঘরের বাহির হইতে পারেনা, এমন সময় সে কোথায়? তবে কি কোথাও মূর্চ্ছা গিয়াছে, তবে কি কোথাও পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। ওঃ কি দুশ্চিন্তা, বৃদ্ধার দুইটী নয়ন বহিয়া দর্ দর্ ধারে অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সহসা যেন সেই জ্যোতিঃহীন নয়নযুগল প্রসন্ন হইল, তিনি যাঁহার ধ্যানে ছিলেন যেন তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, অনতিবিলম্বেই একটী পরমা সুন্দরী দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা সেই কুটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। আঁধার ঘরে যেন সহসা জ্যোতির্ম্ময়ী দামিনী বিকাশ পাইল।

ছিন্ন বসনা, অঙ্গে ধূলী, প্রখর তপনতাপে মুখমণ্ডল সমধিক রক্তাভ, কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদমালা, বদন বিশুষ্ক কিন্তু এত হীন অবস্থাতেও সুন্দরীর সৌন্দর্য্যের বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে নাই—সেই সুটানা চক্ষু, তদুপরে সূক্ষ্ম ভ্রূযুগলের রক্তভাবি, মনোহর নাসিকা, সেই গোলাপকলিকা সদৃশ ওষ্ঠযুগল, সেই ক্ষুদ্র কর্ণদ্বয়—ক্ষুদ্র অথচ পরিপাটী ললাটের গঠন ভঙ্গী, স্ফুরিত অথচ মনোমুগ্ধকর গণ্ডস্থল, সেই অঙ্গের সুগোল সুমার্জ্জিত গঠন, জানিনা বিধাতা কত সাধে কত যত্নে, কত অধ্যাবসায়ে গড়িয়া তাঁহার অক্ষয় শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অভাগিনীর এ ভাব কেন? এ সোনার কমল ধূলায় কেন?

বৃদ্ধা বালিকাকে দেখিয়া স্নেহভরে কহিলেন "কমল, এলি মা?"

বালিকাটীর নাম "কমল"—বা "কমলকুমারী," কমল বিমর্ষ ভাবে বলিল "হাঁ মা।"

বৃদ্ধা বালিকাকে কোলে করিয়া সস্নেহে মুখ চুম্বন করিলেন এবং তাঁহার চিবুকে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন "মা কমল, তোর্ এ যাতনা যে আর দেখ্‌তে পারিনে।"

কমল মাতার বক্ষে আপন মস্তকভার ন্যস্ত করিয়া স্নেহভরে বলিলেন "দুঃখ কি মা।"

বৃদ্ধা। কষ্টের আর কি শেষ আছে।

কমল। আমার ত কোন কষ্ট বোধ হয় না।

বৃদ্ধা চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "তোকে আবার ভিক্ষা করে পেট চালাতে হবে তা জানিনে।"

বৃদ্ধা কাঁদিতে লাগিলেন।

কমল। কাঁদ কেন মা—তোমার চখের জল দেখ্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়। তত কষ্ট আর কিছুতে হয় না।

বৃদ্ধা। না মা, আর কাঁদ্‌বো না

কমল। মা এখনও জল খাওনি?

বৃদ্ধা। না মা তুমি না খেলে কি আমি খেতে পারি।

কমল। আমি যে পথে খাই।

বৃদ্ধা। না কমল ওটা মিছে কথা।

কমল। না, খাই বই কি।

বৃদ্ধা। কখন?

কমল। তৃষ্ণা পেলেই খাই।

বৃদ্ধা। কি খাস্ কমল।

কমল। যে দিন যা থাকে।

বৃদ্ধা। চাল ছাড়া ত আর কিছুই দেখিনা।

কমল। তাই খাই, তুমি সকালে সেই দুটী চালই মুখে দিয়ে জল খেলেও যে হয়।

বৃদ্ধা। আচ্ছা খাব—তুমি রোজ খাবে ত?

কমল। খাব।

বৃদ্ধা স্নেহ ভরে বালিকার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন "তুমি নেয়ে এস আমি ভাত চাপাই।"

কমল চুপ্ করিয়া রহিল।

বৃদ্ধার বিশুষ্কবদন আরও বিশুষ্ক হইল, বলিলেন "আজ কি ভিক্ষা পাওনি।"

কমল। পেয়েছি।

বৃদ্ধা। তবে।

কমল। দুটী খানি চাল পেয়েছি, কি হবে মা।

বৃদ্ধা চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "আহা তোর কপালে এত দুঃখ ছিল কমল। তুই আমার দুধের ছেলে, তোকে কিনা ভিক্ষা করে আমায় খাওয়াতে হ'ল।"

কমল বিষণ্ণ ভাবে কহিল "তাই কই পারি মা, চলে পা ছিঁড়ে গেছে, তবু পেটের ভাত হলো না।"

বৃদ্ধা। তোমার ত হবে।

কমল। না মা আমি খাব না, তোমার এই দুখানা হাড়, না খেয়ে ক'দিন বাঁচ্‌বে?

বৃদ্ধা। বালাই, ষেটের বাছা আমার, তুমি খাবে না আমি খাব? আমার গেরাস্ উঠ্‌বে?

কমল। কেন মা, আমি আবার ভিক্ষে কর্‌তে যাব, এনে খাব।

বৃদ্ধা। ঐ কটী চেলের ভাত রেন্ধে দি, খেয়ে ভিক্ষেয় এস, এনে দিলে আমি খাব।

কমল। না মা তা হবে না, তা আমি খাব না।

বৃদ্ধা। তবে দুজনে খাই এস।

অগত্যা তাহাই স্থির হইল। সেই কটী চাউল বৃদ্ধা রন্ধন করিতে লাগিলেন, কমল স্নান করিয়া আসিল, সেই ছিন্ন বসন মাত্র তাহার সম্বল সুতরাং তাহাই অঙ্গে রৌদ্র তাপে শুষ্ক করিতে লাগিলেন।

রন্ধন হইলে উভয়ে সেই অন্নগুলি আহার করিলেন, বৃদ্ধার খাওয়াই হইল না কেবল কমলকে ভুলাইবার জন্য খাইতে বসা। কমলকুমারী খাইতে খাইতে ভাবিতে ছিলেন "হায় কি করিলাম কেন মাকে খাইতে বসাইলাম। পেটও ভরিল না অথচ অন্ন মুখে দিলেন, আজ ত আর খাইতে পাইবেন না। উপবাসই সার হইবে। কিন্তু আশা বলিতেছিল "ভয় কি? আটা ভিক্ষা কি পাওয়া যাইবে না, এক এক দিন ত অনেক আটা পাওয়া যায়।" আহারান্তে কমল আবার সেই অসহ্য সূর্য্যতাপে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভিক্ষায় গমন করিলেন। হা ভগবান বালিকার এত দুঃখ দেখিয়াও কি তোমার দয়া হয় না?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মেঘেতে বিজলী।

অভাগিনী কমলকুমারী সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে সজল চক্ষে বিষাদিত অন্তঃকরণে ভিক্ষায় চলিলেন। ভগবান, তোমার অনন্ত লীলা বুঝা ভার তুমি বালক বালিকা বুঝ না, বৃদ্ধ যুবা ভাব না, তোমার অশান্ত নিয়তি-চক্রে সকলেই ঘুরিতেছে, পাঁশ কুঁড়ে পদ্ম ফুল দেখিলে যে দুঃখ, আকন্দ ফুল দর্শনে তত দুঃখ হয় না, বুঝি মনুষ্যের সেই ভ্রম সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করাইতে উষর ক্ষেত্রে কমল রূপিণী পারিজাতের বিকাশ। জগদীশ! ধন্য তোমার তুলাদণ্ড, ধন্য তোমার ন্যায়পরায়ণতা তোমার বিচার বুঝা ভার!

কমল ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে—কিন্তু যেখানে পাঁচজন ভদ্রলোক সেখানে

তাহার মুখ ফুটে না, চাহিতে পারে না, তাহার দুঃখের কথা জানাইতে পারে না নির্জ্জনে একাকী কাহাকেও দেখিলে তাহাকে বলে, নতুবা রমণী মণ্ডলীই তাহার যাচ্ঞার স্থান। কমল প্রত্যহ আপনাদের আবশ্যক মত ভিক্ষা পাইলেই সন্তুষ্ট হইতেন, আর ভিক্ষা করিতেন না, সেই জন্য যেদিন কম পাইতেন, সে দিন প্রায়ই অর্দ্ধাহার হইত। আজি বালিকার দশায় তাহাই ঘটিয়াছে। এরূপ ঘটনা বিরল নহে।

এরূপ অর্দ্ধাহারে তিনি আপনার জন্য কোন বিশেষ ক্লেশ অনুভব করেন না, তাঁহার দুঃখ বৃদ্ধা মাতার জন্য, কমলের বড়ই মাতৃ-ভক্তি, মাতা-কেই ইহ জগতের সার বলিয়া জানিতেন এবং উপাস্য দেবী ভাবিয়া ভক্তি করিতেন।

কমল ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি লইয়া দ্রুতপদে স্বকুটীরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন এমন সময় দেখিলেন একটী বৃদ্ধা তাহার দিকে আসিতেছে। হাতে লাঠি, পরিধান বস্ত্র মলিন, অঙ্গে দুই একখানি রূপার গহনা, মসির ন্যায় বর্ণ, চক্ষু দুটী লাল। দেখিলেই যেন ভয় হয়, বৃদ্ধা বালিকাকে বলিলেন "শোন শোন।"

কমল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, বৃদ্ধা বলিলেন "তোমার নাম কি?"

কমল। কমলকুমারী।

বৃদ্ধা। কোথায় গিয়াছিলে।

কমল ঘাড়টী হেঁট করিয়া বলিল "ভিক্ষায়।"

বৃদ্ধা। ওমা তোমার আবার ভিক্ষা কর্‌তে হয়।

কমল। না কর্‌লে খাব কি?

বৃদ্ধা। তোমার আর কে আছেন?

কমল। মা।

বৃদ্ধা। বিয়ে হয়নি?

কমল। না।

বৃদ্ধা। বিয়ে কর্‌বে?

কমল কোন কথা কহিলেন না।

বৃদ্ধা। আমি তোমার বড় ঘরে বিয়ে দিতে পারি। কত গহনা পর্‌বে, কত সুখ হবে।

কমল। আমি কি জানি, মা সে কথা জানেন।

বৃদ্ধা। তার সঙ্গে ত আমার দেখা হবেনা। এখন তোমার কি মত তাই বল ?

কমল। আমি কিছু জানিনা।

বৃদ্ধা। তোমরা কি জাত ?

কমল। রোজ্‌পুত।

বৃদ্ধা। আহা তবে বড় ভাল হয়েছে, কমল এক কাজ কর!

কমল। কি ?

বৃদ্ধা। আমার সঙ্গে এসে বাড়ী চিনে যাও, কাল তোমার মাকে সব জিজ্ঞাসা করে খবর দিও। রাজার ঘরে বিয়ে দিয়ে দেবো।

কমল। তুমি মার কাছে চলনা।

বৃদ্ধা। বুড় মানুষ অত কি চল্‌তে পারি। এস আমার বাটীতে এস।

বেলা আর বেশি নাই, ফিরিয়া আসিতে পাছে রাত্রি হয় কমলার এই চিন্তা হইল, কিন্তু বৃদ্ধা যে বলে রাজার ঘরে বিয়ে হবে। বালিকার সে প্রলোভন বড় বেশী ঠেকিল। তথাপি বলিলেন "কাল কোন সময় এইখানে এলে দেখা হবেনা ?"

বৃদ্ধা। তাও কি হয়।

কমল। কত দূর যেতে হবে ?

বৃদ্ধা। ঐ মাঠের ওদিকে।

কমল। ফির্‌তে যদি সন্ধ্যা হয়ে যায়।

বৃদ্ধা। ভয় কি মা, তোমায় দেখে আমার বড় মায়া হয়েছে। আমার মেয়েকে তোমার সঙ্গে দেবো, সে তোমায় বাড়ীতে রেখে আস্‌বে।

কমল সুতরাং যাইতে সম্মতা হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বুড়ির বাড়ী।

কমল যখন বুড়ির বাড়ীতে পৌছিলেন, তখন বেলা অবসান প্রায়। বাড়ীটী বড়ই নির্জ্জন স্থানে। সেখানে জন-মানবের সমাগম নাই বলিলেই হয়। বৃদ্ধা বসনাঞ্চল হইতে একটী চাবি খুলিয়া বাটীর সদর দরজা খুলিল।

বাটীর মধ্যে তিনটী ঘর, একটী ইঁদারা, দুটী আম গাছ, একটী বাতাবি নেবুর গাছ, আরও দুই একটী অন্যান্য ফলের গাছ আছে।

বৃদ্ধা তখন আপন ঘুন্‌সি সংলগ্ন আর একটী চাবি বাহির করিয়া একটী কক্ষদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিল। আমাদের অভাগিনী কমলকুমারী তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন "কই বাড়ীতে যে কেউ নাই।

বৃদ্ধা। আবার কে থাক্‌বে?

কমল। তোমার মেয়ে?

বৃদ্ধা। সে এখনি এসে তোমায় নিয়ে যাবে। ভয় কি?

কমলের চক্ষুজল উথলিল, বলিল "আর আমি থাকতে পার্‌বো না, মা আমার সারাদিন উপবাসী আছেন।"

বৃদ্ধা বলিল "তুমি একটু বসোনা, সে এলো বলে।"

বালিকা অগত্যা সেই গৃহমধ্যে উপবেশন করিলেন, কিন্তু মন যে মানেনা, সন্ধ্যা যে হইয়া গেল আরও কি পরের ঘরে থাকা যায়? কমল ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, আর থাকিতে পারিবে কেন? আজ চার্‌টী আটা পাইয়াছেন, মনে করিয়াছিলেন, দিবসে ত মার খাওয়া হয় নাই, আজ তবু হইবে। কিন্তু তাহাও বুঝি হয় না। কমল বিশুষ্কবদনে বলিল "ওগো আর যে আমি থাকৃতে পারিনা।"

বৃদ্ধা তখন গৃহমধ্যে যে মাদুরটী পাতা ছিল, তাহা উঠাইল। তাহার নিচের চার্‌টী মাটি তুলিয়া ফেলিল। একটী কাষ্ঠের তক্তা দেখা গেল, সেই ঘরের মেজের একটী গহ্বর রহিয়াছে; বৃদ্ধা আলো জ্বালিয়া বলিল "আমার সঙ্গে এস দেখি, একটা লালঠান বার করি।"

এই বলিয়া বৃদ্ধা সেই গহ্বরমধ্যে নামিল। বেশ ছোট ছোট সিঁড়ি রহিয়াছে, কমল কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার অনুসরণ করিলেন।

তাহার নীচে বেশ যেন একটী ছোট ঘর। তবে পরিষ্কার নয়। আলোক দেখিয়া রাশি রাশি আর্‌স্থলা উড়িয়া উঠিল। কিচ্‌মিচ্‌ করিয়া ইঁদুরের পাল ছুটিয়া পলাইল। সহসা বৃদ্ধার হস্তস্থিত আলোক নিবিয়া গেল। বালিকা ভয় পাইয়া বলিল "তুমি কই গো?"

আর কেহ উত্তর দিল না। সহসা—কে যেন উপরে উঠিয়া গিয়া সেই গহ্বর মুখস্থ তক্তাখানি টানিয়া দিল। তবে কি বৃদ্ধা আর কাছে নাই।

কমল হস্ত প্রসারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে বৃদ্ধাকে খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু

কোথায় কে? তখন মনে হইল ঐ বুঝি কে তাহাকে স্পর্শ করিতেছে। বালিকার হৃদয়ে ভূতের ভয় জাগিয়া উঠিল!

কমল অতি কষ্টে সিঁড়ি দিয়া উঠিলেন, কতকদুর যাইয়াই মাথায় তক্তা ঠেকিল, হাত দিয়া তাহা সরাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

কমল বুঝিল বৃদ্ধার অভিসন্ধি ভাল নয়। ইহারা দস্যু হইবে, কিন্তু তাহার সঙ্গে ত অর্থাদি নাই, তবে তাহাকে ধরিয়া আনিবে কেন? তবে কি এটা ভূতের বাড়ি? বৃদ্ধা কি প্রেতিনী? তাই সম্ভব, দস্যুতে তাহাকে আনিবেনা, ভূতেই আনিয়াছে, তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্তপান করিবে!

বালিকা হৃদয়ে অধিকক্ষণ আপনার প্রাণের ভয় স্থান পাইল না। ভাবিল "মরি তায় দুঃখ নাই, কিন্তু আমি মরিলে মা যে না খেতে পেয়ে মারা যাবেন। একে আমার শোক—তায় উদরান্নের জ্বালা। কি যন্ত্রনা, মা তোমার কপালে ভগবান এত কষ্টও লিখিয়াছিলেন।"

কমলের চক্ষু বহিয়া অবিরল ধারে অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

বৃদ্ধা সেই গুপ্ত কক্ষমধ্যে কমল কুমারীকে বন্দিনী করিয়া আপনি উপরে আসিল। পুনর্ব্বার আলোক জ্বালিয়া গৃহকর্ম্ম করিতে লাগিল, এমন সময় চারিজন ভীষনাকার লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে এক-জন বলিল "কি বুড়ি কি হলো?"

বৃদ্ধা। হবে আর কি, তাকে বাগে পাইনা।

লোক। না হলে যে নয়।

বৃদ্ধা। তুই কি কর্‌বি বল?

লোক। সে কথায় কাজ কি, তোর পঞ্চাশ এখনি নিয়ে তাকে দেনা।

বৃদ্ধা। তাত নেবেনা, কি কর্‌বি তা না বল্‌লে হবে না।

লোক। সত্তিই তার বিয়ে দেবো।

বৃদ্ধা। কার সঙ্গে?

লোক। মুনিয়া বাইজির ছেলের সঙ্গে।

বৃদ্ধা। শেষ বেশ্যা নাচওয়ালীর ছেলের হাতে অমন মেয়ে দিবি!

লোক। সুখ ত হবে।

বৃদ্ধা। কসম্ খেয়ে বল কত পাবি।

লোক। পাঁচ-শ।

বৃদ্ধা। মিছে কথা।

লোক। তোর মাথার কিরে।

বৃদ্ধা। আমি নিজেই ত পাচ-শ নেবো।

লোক। সে কি?

বৃদ্ধা। তার কম এ কাজে কে হাত দেয়। ও বড় ঘরওয়ালা মেয়ে—যদি কথা বেরিয়ে পড়ে আর বাদ্‌সার কানে যায় তা হলে কাজি সাহেব শির জুদা করে দেবে না।

লোক। সে ভয় নেই।

বৃদ্ধা। ভরসাও নেই। আমি একবার ঠেকেছি।

লোক। এ একবার ঘরে ঢুকিয়ে দিলেই হলো। আর বেরোয় কার সাদ্ধি। সেখানে কত যত্ন পাবে, তোয়াজ পাবে—কাঙ্গালের মেয়ে মা ভুল্‌বে, সব ভুল্‌বে।

বৃদ্ধা। সে যা হোক টাকার কথা কি বল দেখি?

লোক। সে যা হয় হবে।

তখন বৃদ্ধা বলিল "আমি এনেছি, কিন্তু ছেড়ে দেব না।"

লোক। সে কি?

বৃদ্ধা। পাঁচ-শ টাকা তবে দে।

লোক। পাঁচ-শ।

বৃদ্ধা। পঞ্চাশ হাজার ফেল্‌লে মুনিয়ার বেটা অমন মেয়ে পাবে না।

লোক। তাই দেবো।

তখন বৃদ্ধা লোকগুলিকে সেই গুপ্ত কক্ষ মধ্যে লইয়া গেল। তাহারা যাইয়া দেখিল সেই ত বটে! আহ্লাদের আর সীমা নাই। কিন্তু কমল কি নিদ্রিতা? একজন তাহাকে ঠেলিল, কিন্তু দেখিল কোন সাড়াশব্দ নাই। বুঝিল কমলের জ্ঞান নাই। আহা কমল, ঈশ্বরের কি অতুল দয়া যে তোমার মোহ হইয়াছে। তুমি এখন সেই কৃপাময়ের অতুল কৃপায় সকল যন্ত্রনা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছ!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কমলের অবস্থা।

জ্যৈষ্ঠ মাসের জ্যোৎস্নাবতী যামিনীর একযাম মাত্র অবশিষ্ট, মেদিনী সুধাঃ ধবলিত অট্টালিকার ন্যায় ধপ্ ধপ্ করিতেছে,—জ্যোৎস্না-স্নাত যুবতীর অঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে! সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জগতের প্রাণী মাত্রেই ময়ুখ-মালীর দুঃসহ কর পীড়নে স্তম্ভিতপ্রায় ছিল, এক্ষণে জগদানন্দদায়ক সুধাংশুর শীতল কর নিকরে স্নিগ্ধ হইয়া সেই দারুন যাতনার কথা বিস্মৃতির নীরে ভাসাইয়া দিতেছে। সুমধুর মৃদু মন্দ সমীরণ কখন মহীরুহের নবোত্থিত কিশলয় স্পর্শ করিয়া, কখন অনূঢ়া মাধবীর কুসুমিত কুন্তল স্পর্শ করিয়া, কখন বা পুষ্প শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া, আবার তখনই উঠিয়া সহকার শাখাবলী মধুপখার মধুকণ্ঠ উত্তেজিত করিয়া কোথায় উধাও হইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে। সেই সুমন্দ বায়ু হিল্লোলের মধুর স্পর্শ সুখানুভূতিতে প্রমত্ত হইয়া ঘুমের ঘোরেই যেন ডাকিয়া উঠিতেছে "কুউ—কুউ।" পাপিয়া পিকবরের পঞ্চমস্বরকে জিনিবার জন্য নবীন পত্রাবৃত তিন্তিড়ী শাখায় বসিয়া মনের সাধে আপন গলাবাজি করিতেছে। কোকিল তখন চুপ করিয়া তাহার অপরিণামদর্শিতার কথা ভাবিয়া বিদ্রূপসহকারে ভাবিতেছে "চোক্ ত তোর যায় নাই—আ-মর্, ধৃষ্টতা যে আর সহ্য হয় না।"

ক্ষুদ্রকায় দধিমুখ নাচিয়া নাচিয়া জিল্‌গলায় টপ্পা নবিশীর চূড়ান্ত দেখাইতেছে, সে যেন জানে সরিমিঞ্ঞারই আদর বেশী—কালোয়াতি গান শুনে কে? বুঝে কে?—তবে বাহাবা না দিলে অজ্ঞতা প্রকাশ পায় বলিয়া দেয়, কিন্তু ভালবাসে আমার এই নাচুনি কণ্ঠস্বর,—খেয়ালের খেয়াল দেখাই সার।

অন্যান্য বিহঙ্গম সম্প্রদায় কেহ বা মোটা গলায় দোহারী করিতেছে, কেহ বা ঝিম গলায় সুর দিতেছে। দূরে গোপনে বসিয়া ঝিল্লিকুল রোসনচৌকী বসাইয়াছে, প্রভাতী বায়ুর মধুরসঞ্চারে জগতের জীবকুলকে সুষুপ্তির কোমল ক্রোড় হইতে জাগরিত করিতে—ভৈরোঁয় ভজন গাহিতেছে। চক্রবাক্ চক্রবাকী সে সুমধুর সঙ্গীত তরঙ্গে মাতিয়া বাঁয়ায় সঙ্গত না করিয়া যেন মাঝে মাঝে থাকিয়া থাকিয়া পক্ষ সঞ্চালনে তাল দিতেছে। তাহাতে মন উঠিবে কেন? অদূরে পুণ্যসলিলা যমুনা ক্ষুদ্র বীচিমালার

লহরী তুলিয়া তটস্থ বালুকারাশিতে প্রতিহত হইয়া অবিশ্রান্ত অবচ্ছিন্ন কাদ্যে সুন্দর সঙ্গীত কবিতেছে। সে বিপুল শোভায় উন্মত্ত হইয়া সলিল যেন কথন আপন বক্ষস্থিত তরণী সমূহকে নাচাইতেছে, কথন তাহাদের গলদেশ ধরিয়া নাচিয়া নাচিয়া করতালি দিয়া তাহাদিগকে গান শুনাইতেছে। পৃথিবী শান্তিময়ী,—হা হুতাশ নাই, দীর্ঘনিশ্বাস নাই—তাড়না নাই, যাতনা নাই, যেন অমরাবতীর শান্তি ছায়ায় এ জ্বালাময়ী সংসার আচ্ছাদিত। তাহা ক্ষণিক হইলেও সুখদ। এ সময় ধনীর ধন বৃদ্ধির চিন্তা দূরে গিয়াছে, রাজার রাজ্যরক্ষা বা শত্রুদমনের চিন্তা নাই। বীরের শত্রু শিবির আক্রমণের চিন্তা দূরে মন হইতে পলায়ণ করিয়াছে। মধ্যবিত্তের সংসার পরিপালন চিন্তা অন্তর্হিত হইয়াছে। ধনির বিলাস, গৃহস্থের অবিশ্রাম শ্রম, দরিদ্রের ক্ষুধা, কাতরের আর্ত্তনাদ, বিরহিণীর বিরহ যাতনা, দয়িতের ব্যথা, যেন কোথায়—কোন দূরদেশে পলায়ন করিয়াছে, সকলেই এখন বিরামদায়িনী, সর্ব্বসন্তাপ-হারিণী, সর্ব্বদুঃখ-বিনাশিনী শান্তি দেবীর সুকোমল অঙ্কে অঙ্গ বিস্তার করিয়া সমান সুখ-সম্ভোগ করিতেছে। এ সময় রাজায় প্রজায়, ধনী নির্দ্ধনে, সুন্দর কুৎসিতে প্রভেদ নাই। অপূর্ব্ব রম্য হর্ম্ম্যের সুউচ্চ কক্ষে দোলায়মান বিজনের ধীর সঞ্চালনে নবনীত লাঞ্ছিত সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আশু-নিদ্রাকর স্নেহ দ্রব্য সিঞ্চনে ধনী যেরূপ সুষুপ্তি সুখ উপভোগ করিতেছেন, একজন দিনহীন দরিদ্রও পথি পার্শ্বস্থ বটবৃক্ষ তলে আপন ছিন্ন বস্ত্রখানির একাংশে সেই কঠোর ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া সেইরূপ সুখে নিদ্রা যাইতেছে। তাই বলি মনুষ্যের কাছে সকল বিষয়েরই ইতর বিশেষ জ্ঞান আছে, কেবল দেবতার কাছেই নাই!

কি সুখের সময়,—মানবজীবনে এ হেন সুখের সময় আর নাই। ধনী ধনচিন্তা ভুলিয়াছে—কৃপণ আপনার সযত্ন রক্ষিত ধনের যত্ন ছাড়িয়াছে—ভিক্ষুক আপনার উদারান্নের জন্য ভিক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছে,—নব দম্পতি পলকের বিচ্ছেদে প্রলয় জ্ঞান হারাইয়াছে—পতি বিয়োগ বিধুরাবালা বিচ্ছেদ জ্বালায় জলাঞ্জলি দিয়াছে—পুত্র শোকাতুরা জননী পুত্রের মৃত্যু ভুলিয়া স্বপ্নে তাহার সুন্দর হসিত-আনন দেখিতে পাইয়া সুখের সাগরে ভাসিতেছে। বহু পুত্রের জননী যেরূপ আপন সন্তান সন্ততীকে নিদ্রিত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পতির সহিত সুখালাপ করেন, নির্ম্মলা শান্তিময়ী নিশা সুন্দরী তেমনি ভাবে আপন অগণিত সন্তান সন্ততিকে সুষুপ্তির সুখময়ী অঙ্কে স্থাপিত করিয়া

প্রাণপতি সুধাকর সহবাসে সেইরূপ আনন্দে বিভোর হইয়া মুখভরা হাসি হাসিতেছেন। প্রাচীন উপন্যাস প্রথিত সুন্দরী রাজকন্যার মধুর হাস্যে মুক্তা বর্ষণের চারু চিত্র জগৎকে প্রত্যক্ষ করাইতেছেন। সে হাসিতে দুর্ব্বাদলে রাশি রাশি মুক্তা ছাড়াইয়া পড়িতেছে।

স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের তারতম্য নাই—সুখানুভূতির ইতর বিশেষ নাই—কিন্তু একবারেই কি নাই? আছে বই কি? আজি এই সময়ে একবার অভাগিনী কমলের মাতাকে দেখিলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। তিনি জ্ঞান হারা—আত্মহারা—নিদ্রাদেবী আজি তাঁহাকে ভুলিয়াছেন। তাই বলি সকল নিয়মেরই বুঝি ব্যভিচার আছে? আমরা এখন আর সে বৃদ্ধার দারুণ দুঃখ কাহিনী শুনাইয়া পাঠকের হৃদয় ব্যথিত করিব না, সে দুঃখের বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুভব করাই ভাল। তবে এই সময়ে হতভাগিনী কমলের কি হইতেছে তাহা পাঠককে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

এই সময়ে দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ কুতব্‌মিনারের প্রায় দুই ক্রোশ উত্তর দিয়া দ্রুতবেগে দুই খানি এক্কা যাইতেছে, একখানিতে আরোহী তিনজন পুরুষ, অপর খানির একজন পুরুষ ও একটী বালিকা। সে বালিকাটীই আমাদের কমলকুমারী।

কমল এখনও জ্ঞানশূন্যা—ক্রমে গাড়ি দুটী, একটী বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, বাটীটি নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত—সম্মুখে নির্ম্মল স্নিগ্ধসলিলা যমুনা সহস্র বাহু তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া প্রবাহিতা। অপর তিনদিকে সুবিস্তৃত প্রান্তর। বাটীটি দ্বিতল, নিতান্ত প্রকাণ্ড না হইলেও ক্ষুদ্রায়তন নহে। বাটীতে অনেক গুলি দাস দাসী আছে, কিন্তু এখন তাহারা সকলেই নিদ্রিত।

গাড়ি দুটী যখন সেই অট্টালিকার দ্বারদেশে উপস্থিত, তখন ভোর হইয়া আসিল, জ্যোৎস্না মলিন হইয়া গেল, আকাশ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, ক্ষুদ্র নক্ষত্রগুলি আকাশের কোণে মিশাইয়া গেল, আর দৃষ্টি গোচর হয় না। যে গুলি বড় বড়, সে গুলি মলিন হইয়া খদ্যোতের ন্যায় মিট্ মিট্ করিতে লাগিল। রাত্রিকালে দ্রুম দেহে কৌমুদী রাশি রূপার ন্যায় দেখাইতেছিল—এখন কেমন বিবর্ণ ধারণ করিল। যে চন্দ্রমার মনোহর করজালে আকাশ, অবনী, দিঙ্মণ্ডল দেদীপ্যমান ছিল, তাহা এখন কেমন ধীরে ধীরে যেন কোথায় সরিয়া যাইতেছে। ক্রমে শীতল প্রভাত সমীর ধীরে ধীরে বহিয়া নদীর জল, গাছের পাতা কাঁপিয়া উঠিল, পূর্ব্বদিক ফর্‌সা হইল, ক্রমে ধীরে ধীরে জ্যোতিঃ-

হীন বিবর্ণ একটী সুগোল পদার্থ যেন আকাশ অঙ্কে ভাসিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে তাহা ছুটিয়া উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল—দেখিতে দেখিতে আবার বর্দ্ধিতায়তন ও প্রভাময় হইয়া উঠিল। সেই জীবগণের প্রাণস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় দিবাকর আবার আপনার করজালে মেদিনীকে বিত্রস্ত করিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন।

এই সময়ে কমলের অল্প জ্ঞানের সঞ্চার হইল, কমল "মা মা" বলিয়া উঠিয়া বসিল। কিন্তু মা কই? কমল চক্ষু মর্দ্দিত করিয়া যাহা দেখিল তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না, আবার চক্ষু বুজিল, আবার মর্দ্দিত করিল, আবার চাহিল। তাই ত বটে—সম্মুখে যে কয়জন অপরিচিত লোক, বিস্তৃত নদী—সুন্দর অট্টালিকা। আর কে একজন সুরূপা রমণী তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। তিনি কমলকে বলিলেন "এস মা এস।"

কমল স্নেহ সম্ভাষণে ভুলিয়া গেল। বিগত রজনীর ভীষণ অন্ধকার গৃহের কথা তখনও তাহার হৃদয়ে জাগিতেছিল, সুন্দরীর সুন্দর কান্তি তাহার মন ভুলাইল। কমল তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া আশ্বস্তা হইলেন।

রমণীটী যত্নসহকারে কমলকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত কল্পনা।

যমুনা তটে একদিন প্রাতঃকালে দুইটী অশ্বারোহী মৃদুমন্দ ভাবে অশ্বচালনা করিতে ছিলেন। দুইটী অশ্বই সুন্দর—অশ্বারোহী দুইটী ও সুন্দর। তাঁহাদের মধ্যে একজন যুবক, অপরের প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করিয়াছে। উভয়েই সাধারণ রাজপুতদিগের বেশভূষা পরিহিত, কিন্তু এবেশ কি তাহাদের শোভা পায়? না এবেশ তাহাদের যোগ্য।

বয়স্থ অশ্বারোহীটী জয়পুরাধিপতি মহারাজ মানসিংহ, যুবকটী সম্রাট আকবরসাহের পৌত্র সাহাজাদা খসরু।

মহারাজা মানসিংহ বলিলেন, "আমি আবার বলি তুমি কাশ্মীরে যাইও না।"

খসরু। কেন তাহা না বলিলে, আমি কি করিব, তাহা বলিতে পারি না।

মান। এ বলিবার সময় নয়।

খসরু। কেন ?

মান। সে সকল অতি গোপনীয় কথা।

খসরু। তবে জানিয়া রাখুন, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিব না।

মান। খসরু, বল কি ? তুমি কি জাননা আমি কে ?

খসরু। আপনি আমার পরম পূজ্য মাতুল, কিন্তু আপনি কি জানেন না আমি কে ? আমি বাদসাহ পুত্র রাজ্যলাভ বাসনা আমাদের জীবনের লক্ষ্য, তাহার উপর পিতা পিতামহ কর্ত্তৃক কাশ্মীর যাইতে আদিষ্ট, আপনি কোন সাহসে আমায় সে কার্য্যে প্রতি নিবৃত্ত করিতে সাহস পান ?

মানসিংহের বদনে বিষাদ চিহ্ন বিকসিত হইল, তিনি স্থির দৃষ্টে যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলেন "খসরু, তুমি অন্যায় বুঝিলে। আমি হিন্দু তুমি মুসলমান, আমিও একজন প্রতাপান্বিত স্বাধীন নৃপতি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কোন স্বার্থ সিদ্ধির অভিপ্রায়ে তোমার পিতৃ করে আমার প্রাণপ্রিয়ভগ্নীকে সমর্পণ করিয়াছিলাম ? আজি আমি জগতের চক্ষে ঘৃণ্য—মুখে প্রকাশ করিবার সাহস না পাইলেও অন্তরে সকলেই আমায় ঘৃণা করে, কৌশলে আমার আতিথ্য স্বীকার করে না, আমাব সহিত পান ভোজনে বিরত ! কিন্তু বল দেখি, আমি কোন আশায় এত যাতনা সহ্য করিয়াছি ও করিতেছি ?

খসরু। আপনি আমায় "তুমি" বলেন, আমি আপনাকে "আপনি" বলি। আপনাকে দেখিলে আমি সসম্মানে গাত্রোত্থান করিয়া আবাহন করি, পিতামহের আপনি দক্ষিণ হস্ত, আপনি পাঁচ হাজারি অশ্বারোহির অধ্যক্ষ। সময়ে সময়ে বাদসাহের অন্তঃপুর—যে অন্তঃপুরে বনের পাখিও প্রবেশ করিতে ভীত হয়, সেখানে প্রবেশ অধিকার পান, ইহা অপেক্ষা আর কি আশা করিবেন ? তাহার উপর কথা, বাদসাহ কাহাকেও বিবাহ করিব বলিলে কে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করে ? হিন্দু মুসলমান যে এখনও একাকার হইয়া যায় নাই তাহা আমাদের অনুগ্রহের ফল। বাদসাহ মনে করিলে কামানের তেজে একদিনে জাতিত্ব ঘুচিয়া যায়।

মানসিংহের অধর প্রান্তে ক্ষীণ হাসি প্রতিভাত হইল। বলিলেন "হিন্দুর এখনও বাহুবল আছে। তুমি বালক,তোমায় আব অধিক কি বুঝাইব। মেওয়ারের ভীষণ যুদ্ধ কি মনে জাগেনা। আমিই ক্ষত্রিয় রাজাদের বাধ্য করিয়া দেশে শান্তি স্থাপনা করিয়াছি,—নতুবা কাশ্মীর জয় কেন, আজি বাদসাহ দিল্লীতেও

এমন নির্ব্বিঘ্নে খোসরোজের বিলাস ঘোরে দিন কাটাইতে পারিতেন না। তুমি স্বীকার না কর, কিন্তু বাদসাহ তাহা স্বীকার করেন।”

খসরু। কিন্তু এ সকল কথার সঙ্গে আমার কাশ্মীর গমনের কি সম্বন্ধ আছে বুঝিলাম না।

মান। আছে বই কি?—বাদসাহের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে, এ সময়ে কি তোমার বিদেশ বাস কর্ত্তব্য?

খসরু ক্ষণেক কি চিন্তা করিয়া বলিলেন “কিন্তু এমন মনে হয় না যে রণ বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। যদি না পাই আমার মন্দ ভাগ্য বই কি?”

মান। ঈশ্বর না করুন কিন্তু যদি সেই অবস্থাই ঘটে, তাহা হইলে কি হইবে। রাজ্যে কি বিশৃঙ্খলা ঘটিবে না?

খসরু। কেন পিতা আছেন, দিল্লীর সিংহাসনের প্রকৃত অধীশ্বর বর্ত্তমান রহিলেন, বিশৃঙ্খলা ঘটিবে কেন?

মান। সাহাজাদা দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলে আমার সুখ কি? আমি যে রাজ্য ছাড়িয়া সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া, শরীরপাত করিয়া খাটিতেছি, সকলকে বাধ্য করিতেছি, সে কি সেলিমের জন্য?

খসরুর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল বলিলেন “আপনি কি আমায় সাংসারিক স্নেহ মমতা বিস্মৃত হইতে বলেন, আমায় পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তস্করের ন্যায় দিল্লীর সিংহাসন চুরি করিতে বলেন?”

মান। স্নেহ মমতা বাদসাহ পুত্রের জন্য নয়, সে সকল সামান্য গৃহীর সাধের সামগ্রী, তোমার আমার নয়—“জোর যার দেশ তার” একথা কি জাননা?

খসরু। মামা, ক্ষমা করিবেন, এ কার্য্য আমার দ্বারা হইবে না। কিন্তু আর কখন এমন কথা শুনিলে আপনাকে রাজদ্রোহী বলিয়া বিবেচনা করিব এবং বাদসাহ পুত্রের রাজদ্রোহীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহাই করিব।

মান। তোমার মার কথা শুনিবে?

খসরু বিস্মিত হইয়া বলিলেন “আমি এ সকল কথার অর্থ বুঝিলাম না। তিনি কি স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করিবেন?

মান। উদ্দেশ্য থাকিলে করিতে হয় বই কি?

খসরু। ধিক্ আপনার উদ্দেশ্যে, ধিক্ আপনার হিন্দুর আচার, ব্যবহার, স্নেহ, মমতায়। পতিকে যে নারী দেবতা ভাবিতে জানে না তাহার জীবনই বৃথা। তিনি দরিদ্রের কুটীর বাসিনীই হউন, আর প্রতাপান্বিত বাদসাহের অঙ্কসুশোভিনীই হউন। মা মুসলমান কন্যা হইলে বোধ হয় এ কথা শুনিতাম না, কিন্তু মার মুখে শুনিয়াছি, পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতে মাতৃ-শিরচ্ছেদন করিয়াছিলেন, আবশ্যক হয় আমিও তাহাই করিব।

মান। বুঝিলাম তুমি বাতুল।

খসরুর হস্ত তরবারে স্থাপিত হইল। তিনি রোষকষায়িত নেত্রে মানসিংহের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তখন মানসিংহ বলিলেন "খসরু, মাতৃহত্যার পূর্ব্বে মাতুলহত্যাই কর। আর এ সকল সহ্য হয়না।"

খসরু দেখিলেন মানসিংহের চক্ষু সজল হইয়াছে। বিস্মিত হইয়া কহিলেন "ভাল, জিজ্ঞাসা করি আমি বাদসাহ হইলে আপনার কি সুখ?"

মান। আমার ভগ্নীর গর্ভজাত সন্তান বাদসাহ হইবেন ইহা অপেক্ষা আর সুখ কি আছে।

খসরু। পিতার অবর্ত্তমানে হইব।

মান। সেটা দুরাশা। অনেক মুসলমানের ইচ্ছা তুমি বাদসাহ না হও। সেলিমের অন্য পুত্র হন।

খসরু। কেন?

মান। তুমি হিন্দু নারীর গর্ভজাত বলিয়া। তাই বলি, এ সময় আমার বর্ত্তমানে কেহ ভয়ে কেহ মিত্রতায় সে কথা তুলিতে পারিবেন না, কিন্তু ইহার পর কি হইবে? তোমার পিতার অপর সন্তান সিংহাসন পাইলে আমার সুখ কি? তখন হয় ত আমার প্রেতাত্মা সেই শোকে জর্জ্জরিত হইয়া পরলোকেও কষ্ট পাইবে।

খসরু। পিতার স্নেহ অসীম, তিনি কি সে কথা শুনিবেন?

মান। আমি যদি দেখাইতে পারি যে তোমার পিতার অভিপ্রায় নয় যে তুমি রাজ্য পাও।

খসরু চুপ করিয়া রহিলেন। কোন কথা কহিলেন না। মানসিংহ বুঝিলেন আর বিরক্ত করা উচিত নয়—আজ এই পর্য্যন্ত, এমন সময় খসরু বলিলেন "সে যাহাই হউক আমায় কাশ্মীর যাইতেই হইবে।"

মান। যাও, কিন্তু সংবাদ পাইবা মাত্র আসিবে।

খসরু। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য।

মান। তবে এখন আমি চলিলাম।

এই বলিয়া মানসিংহ হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে অশ্বকে কষাঘাত করিয়া দ্রুতগমনে চলিয়া গেলেন। সাহাজাদা খসরু একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে মানসিংহের অশ্ব অদৃশ্য হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মুন্না বাইজি।

মুন্না বাইজির নাম সে সময়ে দিল্লীতে জানিত না এমন লোকই ছিল না। মুন্নার যেমন কোকিল কণ্ঠ, তেমনি কর্‌তব, তেমনি শিক্ষা, তেমনি কায়দা—গান শুনিলে সকলেই মোহিত হইতেন। গানের পরীক্ষা বালক ও গীতি শাস্ত্রে অনভিজ্ঞদিগের দ্বারাই ঠিক হইয়া থাকে। গায়ক হইলে রসজ্ঞকে মুগ্ধ করিতে পারে, কিন্তু মধুর কণ্ঠ না হইলে আপামর সাধারণে মোহিত হয় না। যে গান বালকেরও প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ তাঁহাব গানই প্রশংসার্হ, মুন্নার সেই ক্ষমতা ছিল!

নর্ত্তনে মুন্নার প্রতিদ্বন্দী কে? সে নাচ বুঝিতে জ্ঞানের আবশ্যক করিত, কোন্ সময় কোন অঙ্গ নাচিতেছে তাহা দর্শককে সযত্নে দেখিতে হইত। যিনি দেখিতে পাইতেন তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। বাদসাহ মুন্নার নাচ দেখিয়া এত প্রীত হইয়াছিলেন, যে তিনি তাহাকে মাসিক সহস্র মুদ্রা মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তদ্ব্যতীত বহুমূল্য অনেক রত্ন অলঙ্কারাদিও দিয়া ছিলেন। তাহার উপর মুন্না নাচিলে বাদসাহ প্রতিরাত্রে তাহাকে পাঁচ শত মুদ্রা দিতেন। এরূপ নাচ সপ্তাহে অন্ততঃ দুই তিন দিন হইত। তবে আর মুন্নার অর্থ সঞ্চয় হইবে না কেন?

বিলাতের কথা ধরি না। বিলাতে ভাল গায়িকা ও অভিনেত্রীর সহিত মুন্নার তুলনা হয় না, সে দেশ ও এদেশে প্রভেদ অনেক। ইংলণ্ডের প্রধানা গায়িকা শ্রীমতী ল্যাংট্রের সুখৈশ্চর্য্যের কথা সকলেরই জানা আছে। তিনি প্রাসাদ সম অট্টালিকায় বাস করেন। তাঁহার বাসগৃহের জানালা রত্ন

খচিত। তাঁহার রত্নাদির সহিত ভারতেশ্বরীর স্বকীয় রত্নরাজীর নাকি তুলনা হয় না। অন্যের কথা আর কি বলিব। ল্যাংট্রের বার্ষিক আয় প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা। তৃতীয় পক্ষের বিবাহের সময় তিনি তিন কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এ সব যেন আরব্য উপন্যাসের কথা। মুন্নার তত অর্থ ছিল না, তবে এদেশের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

মুন্নার সৌন্দর্য্য-কথা প্রবাদ স্বরূপ। উর্ব্বশী আর কে, সেই মুন্না, একথা অনেকে বলিতেন, অনেক বড় লোকে মুন্নার-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। আমাদের দেশের স্বর্ণ বাইজীর ন্যায় তাঁহারও লোককে ফকির করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তাই বলি মুন্নার অট্টালিকা না হইবে কেন? দাস দাসী না থাকিবে কেন?

মুন্নার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গর্ভ হয়। ক্ষোভের সীমা পরিসীমা ছিল না—আর কি সৌন্দর্য্য থাকিবে? আর কি লোকে তাহাকে খুঁজিবে? কিন্তু সন্তান হইলেও মুন্নার দেহের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল না। কিন্তু জানিনা, কেন সেই পর্য্যন্ত মুন্নার আর সন্তানাদি হয় নাই।

মুন্না ভাবিয়াছিল তাহার কন্যা হইবে। ইহাও সুখের কথা, কিন্তু বিধি তাহাতে বাদ সাধিলেন, মুন্নার কন্যার পরিবর্ত্তে পুত্র হইল, মুন্না পুত্র লইয়া কি করিবে? পুত্র লইয়া তাহাকে আরও বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। মুন্নাকে ষোড়শী যুবতীর মত দেখাইত। সন্তান বড় হইলে শত সতর্কতা সত্ত্বেও সে কখন কখন "মা মা" বলিয়া নিকটে ছুটিয়া আসিত, সে সময় কোন লোক জন উপস্থিত থাকিলে মুন্নার লজ্জার শেষ থাকিত না। মুন্না অধোবদন হইতেন। কৌশলে জানাইতেন ছেলেটী তাঁহার গর্ভজাত নয়।

আজি সেই পুত্রের বয়ঃক্রম চতুর্ব্বিংশতি বৎসর হইয়াছে। মুন্নার ইচ্ছা একটী সুন্দরী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। বেশ্যার সুন্দরী কন্যা ছিল, তাহারা সাহ্লাদে বিবাহ দিতেও প্রস্তুত, কিন্তু মুন্না বেশ্যার কন্যা চায় না। কোন দরিদ্র গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করা তাহার বাসনা, কিন্তু দেশ যে এখনও রসাতলে যায় নাই, ইহাই তাহার দুঃখ!

আজি অনেক দিনের আশা পূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে। মুন্না সুন্দরী কমলকে পাইয়াছে। কমলকে যত্নের সীমা নাই—কিন্তু দরিদ্র কন্যা কমল যে বিবাহে সম্মতা নয়। কমলের মার জন্য প্রাণ অস্থির, তাহার কি আর বিবাহ বাসনা আছে? বিশেষতঃ মুন্নার পুত্রকে?

মুন্নার ন্যায় তাঁহার পুত্রটীও সুন্দর কিন্তু হইলে কি হয় কমল তাহাকে চায় না। তাহার এত দুঃখ, এত যাতনা, তবু কমল তাহাকে চায় না। মুন্না বলিয়াছিল "তোমার সব দুঃখ ঘুচাইব, তোমার মাতাকে সুখে রাখিব। তুমি সম্মতা হও।"

উত্তর পাইয়াছিল "মা কি আর বেঁচে আছেন, যদিও থাকেন তোমার অন্ন আহার করা অপেক্ষা তাঁহার মৃত্যু অনেক ভাল বলিয়া বিবেচনা করি।"

কথাটা মুন্নার ভাল লাগে নাই। মুন্না সেই দিনই কমলকে একটী কক্ষ মধ্যে আবদ্ধ করিয়া বলিল "দেখি তোমার তেজ কতদিন থাকে, অনাহারে কতদিন থাকিতে পার।"

কমল। যত দিন না মরি।

মুন্না। তাই হোগ, মলে ফেলে দিব।

কমল। আমার ত তাই ইচ্ছা।

তাই কমল বন্দিনী। বন্দিনী হইলে কি হয়, মুন্না তাহাকে আহার করাইবার অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু কমল কিছুতেই আহার করে না। আজ দুই দিন এই অবস্থায় আছে। তবুও ত বালিকার প্রাণ বিয়োগ হয় না।

ক্লাইভ এক সময়ে আত্মহত্যার চেষ্টায় বিফল হইয়াছিলেন। বীর কেশরী নেপোলিয়ানও আত্মহত্যায় অকৃতকার্য্য হন, কিন্তু শেষে তাঁহাদের অনেক সুখ সৌভাগ্য হইয়াছিল, কিন্তু আবার পরিণাম যাতনাও যথেষ্ট হইয়াছিল। ইহা কি সেই পাপ বাসনাব পরিণাম? আজি কমলের হৃদয়েও সেই পাপ আত্মহত্যার বাসনা বলবতী। কিন্তু মৃত্যু ত হয় না!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিপদে সহায়।

মুন্না বাইজির দ্বিতলের একটী কক্ষ মধ্যস্থ বাতায়নপথে কমলকুমারী আসীনা। দেখিলেই বোধ হয় দূরে প্রান্তরের দিকে কি দেখিতেছেন, কিন্তু চাহিয়া থাকিলে সকল সময় ত দেখা যায় না। কমল চাহিয়া আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার মন যে কোথায় পড়িয়া আছে তাহার স্থিরতা নাই।

এই সময়ে দেখা গেল সেই দিকে অশ্বারোহণে কে আসিতেছেন। অশ্বারোহী সাহাজাদা খসরু। আসিয়া পর্য্যন্ত কমলকুমারী বাহিরের একটী লোকেরও মুখ দেখেন নাই, সুতরাং আজি সহসা অশ্বারোহীকে দেখিয়া তাঁহার মন প্রফুল্ল হইল। মনে হইল "ইহাঁকে বলিলে কি আমার উদ্ধার হইবে না।" মন বলিল "হইবে বই কি, এমন রূপবান্ পুরুষের হৃদয় কি কখন কঠিন হইতে পারে?" তখন মনে কত নিরাশার উদয় হইল, মনে হইল "তিনি যদি এ পথ দিয়া না যান, যদি আমার কথা শুনিতে না পান" ক্রমে সে ভয় গেল। যুবক সেই দিকেই আসিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে তিনি ঊর্দ্ধ দৃষ্টে বাতায়ন পথে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। বালিকা হইলে কি হয়, যিনি সৌন্দর্য্য দেখিতে জানেন তাঁহার কি আর সে বলিকা রূপও একবার নয়ন ভরিয়া না দেখিয়া থাকিবার উপায় আছে?

যুবক যখন বাতায়নের ঠিক নিম্ন দেশে আসিলেন, তখন বালিকা সজল নয়নে, উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে, কাতর ভাবে বলিলেন "আমায় রক্ষা করুন।"

অশ্ব থামিল। যুবক বলিলেন "তুমি কে?"

কমল। দুঃখিনী কন্যা।

যুবক। এখানে কেন?

কমল। ধরিয়া আনিয়াছে, গৃহস্বামিনী সন্তানের সহিত বিবাহ দিবে বলিয়া।

যুবক সে কথার কোন উত্তর না দিয়া সবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিয়া চলিয়া গেলেন। কমলের আশা ভরসা ঘুচিল।

বেলা প্রায় দশটা, মুন্না বাইজিকে দাসীতে সুবাসিত তৈল মাখাইয়া দিতেছে এবং তিনি আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া কি একটী রাগিণী আলাপন করিতেছেন, এমন সময় দ্বারদেশে দশ জন সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইল। মুন্না চমকিল, তেলমাখা বন্ধ হইল, বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল, মুখ দিয়া কথা সরিল না, দাসীর দিকে চাহিয়া বিস্ফারিত নেত্রে উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

এমন সময় তাহারা উপরে উঠিল, অনেক লোকের পদশব্দ শুনা গেল। তাহারা ক্রমে মুন্নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মুন্না কণ্ঠস্বর কষ্টে ঠিক করিয়া লইয়া বলিল "এখানে শুভাগমন কেন?"

সৈনিক দিগের মধ্যে একজন বলিল "এ ঘরে কেহ অবরুদ্ধ আছে কি?"

মুন্নার গলা যেন তখন কে ধুলা দিয়া বুজাইয়া দিয়াছে। মুন্না কথা কহিতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না।

সৈনিক পুরুষটী আবার বলিল "কথা কহিতেছ না যে ?"

মুন্না গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল "আমার ঘরে ?"

"শুনিতে পাও নাই কি ?"

"অনিচ্ছায় অবরোধ ?"

"তত জানিনা, কোন বালিকা আছে কি না ?"

"আছে।"

"তাহাকে বাহির করিয়া দাও।"

"আমি—"

মুন্না কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সৈনিক পুরুষটী তাহাতে বাধা দিয়া বলিল "কোন কথা নয়, এখনি বাহির করিয়া দাও।"

"কোথায় লইয়া যাইবেন ?"

"সে কথার আবশ্যক কি ?"

"আজি অনেক—"

মুখ হইতে এই কথা বাহির হইতে না হইতে দশখানি তরবারী কোষ হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে নিষ্কোষিত হইল। দাসী "বাপ্‌রে গেলাম রে" বলিয়া চিৎকার করিয়া ছুটিয়া পলাইল। মুন্না আর কোন কথা না কহিয়া যে কক্ষ মধ্যে কমল কুমারী অবরুদ্ধা ছিলেন তন্মধ্যে তাহাদিগকে লইয়া গেলেন। বালিকা প্রথমতঃ সৈনিক পুরুষদের দেখিয়া ভয় পাইলেন কিন্তু তখনই মনে হইল এ সমস্তই সেই যুবকের কার্য্য, মনে মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে তাঁহার কুশল কামনা করিলেন।

তখন একজন সৈনিক পুরুষ বলিলেন "আমাদের সঙ্গে এস।"

বালিকা তাহাদের অনুসরণ করিলেন। বাহিরে শিবিকা ছিল, তাহাতে আরোহন করিলেন, যমুনা তীরে তাহারা বালিকাকে সুস্বাদু ফল মূলাদি আহার করাইয়া সেই দারুণ আতপ তাপকে উপেক্ষা করিয়া শিবিকা লইয়া চলিল।

বেলা প্রায় চারিটার সময় একটী ক্ষুদ্র গৃহ দ্বারে শিবিকা নামাইল। কমল দেখিলেন সেই যুবকটী গৃহদ্বারে সহাস্য আননে দণ্ডায়মান। তিনি কমলকে শিবিকা হইতে অবতরণ করিতে বলিলেন। কমল নামিলে সৈনিকগণ শিবিকা লইয়া চলিয়া গেল।

যুবক বলিলেন "কেমন, রক্ষা করিয়াছি ত?"

বালিকা কি সে কথার উত্তর দিতে পারে? মুখে কথা আসিল না, কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিল, দুই চক্ষে তপ্ত অশ্রুধারা বহিল।

যুবক সস্নেহে বালিকার চক্ষুজল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন "ভয় কি কাঁদিও না।"

কমলের বাস্তবিক আর এখন কোন ভয় নাই, সুতরাং ভয়ের জন্য কাঁদে নাই। বলিকা কেন কাঁদিল তাহা সে জানে না।

যুবক আবার বলিলেন "কাঁদিও না,—তোমার নাম কি?"

কমল অধোবদনে বলিল "কমলকুমারী।"

যুবক। কে আছেন?

কমল। মা।

যুবক। আর——

কমল। আর কেহ নাই।

যুবক। তোমায় কি করিয়া উহারা লইয়া গিয়াছিল?

কমল তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল।

যুবক। তোমার বাটী কত দূর?

কমল। অতি নিকট।

যুবক। এখান হইতে চিনিতে পারিবে?

কমল। হাঁ, আমি কতদিন এ সকল স্থানে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

যুবক। একলা যাইতে পারিবে?

কমল ঘাড়টী নাড়িয়া কহিল "হাঁ।"

যুবক। চল তোমার মার কাছে লইয়া যাই।

কমল সাহ্লাদে কহিল "আসুন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নূতন লোক।

কমল কুটীরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলে যুবক বলিলেন "কমল, এই তোমার বাটী?"

কমল। হাঁ।

যুবক কুটীরের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন কিন্তু কোন কথা কহিলেন না।

কমল যখন গৃহে আসিলেন, তখন কমলের মাতা ভূমিশয্যায় উপুড় হইয়া পড়িয়াছিলেন। কমলের কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি চমকিয়া উঠিলেন। মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন। যাহা দেখিলেন তাহা দেখিবার আর বুঝি তাঁহার আশা ছিল না। তিনি ছুটিয়া গিয়া বালিকাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "কমল কমল—"

কমল "মা মা" বলিয়া তাহার উত্তর দিলেন, কিন্তু হতভাগিনীকে আর সে "মা" বাণী শুনিতে হইল না, তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

কমল মাতৃবদনে জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন, যুবক ব্যজন করিতে লাগিলেন অনেকক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তখন আবার সোৎসুকভাবে বলিলেন "কই মা, আমার কমল কই?"

"এইযে মা।"

বলিয়া কমল উত্তর দিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন "আজ দু'দিন কোথায় ছিলি মা?"

কমল আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন, এবং যুবক কর্ত্তৃক কি উপায়ে উদ্ধার হইলেন তাহাও কহিলেন।

বৃদ্ধার দুইটি চক্ষু বহিয়া দর্‌দর্‌ ধারে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তিনি যুবকের দিকে ফিরিয়া কহিলেন "বাবা ঘরে এমন কিছু নাই যে তাহাতে তোমায় বসিতে দি।"

যুবক তখন একটী ছেঁড়া মাদুরের একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিলেন "এইযে আমি বেশ ব'সেছি।"

বৃদ্ধা। ও কি আর বসা হলো বাবা।

যুবক কমলের দিকে ফিরিয়া কহিলেন "তবে এখন আসি।"

কমল কি উত্তর দিবে তাহা আর খুঁজিয়া পায় না। শেষে বলিল "সেই কি আপনার বাটী?"

যুবক। আমি যে কখন কোথায় থাকি তাহার স্থির নাই।

কমল। তবে আর আপনাকে হয় ত দেখিতে পাইব না।

যুবক। কেন?

কমল বিস্মিতা হইয়া বলিলেন "আপনি আসিবেন!"

যুবক। হলেই বা, তাতে দোষ কি?

কমল মস্তক অবনত করিয়া আর কোন উত্তর দিলেন না।

যুবক বৃদ্ধার হস্তে একটী স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া বিদায় চাহিলেন।

এ যে স্বর্ণ মুদ্রা! যাঁহার অদৃষ্টে তামার পয়সা দেখাই কদাচ ঘটে, তাহার হাতে সোনার টাকা বিস্ময়ের কথা বটে। বৃদ্ধা বলিলেন "এ যে মোহর!"

যুবক মৃদু হাসিয়া কহিলেন "হলেই বা।"

বৃদ্ধা। আমাদের এত দেওয়া কেন?

যুবক। তা হোক।

বৃদ্ধা ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "এটী আপনি নিয়ে যান।"

যুবক। কেন?

বৃদ্ধা। আমার নিয়ে কোন ফল নেই, ভাঙ্গাতে ত পার্‌বো না।

যুবক। কেন?

বৃদ্ধা। তা হলে কোতয়াল চোর বলে ধরবে।

যুবক। আমি কত্তোয়ালকে বারণ করে দিয়ে যাব। আমিত রাজ সরকারে কাজ করি।

কমল আগ্রহ সহকারে বলিলেন "কি কাজ?"

যুবক। অশ্বারোহী সৈনিক।

কমল। তা হোগ, মোহর আমরা নেবোনা।

যুবক অগত্যা স্বর্ণ মুদ্রাটী পুনঃ গ্রহণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার কালে আবার শীঘ্র আসিবেন ইহাও বলিয়া গেলেন। এ কথায় কমল বড়ই সন্তুষ্টা।

বেলা প্রায় অবসান, পশ্চিমাকাশ অস্তগামী সূর্য্যালোকে এখনও রঞ্জিত। গগনমণ্ডল যেন পক্ষিগণের কাকলীতে পূর্ণ, দূরে সৌধ কিরিটীনী দিল্লীর সৌধপুঞ্জে এখনও সূর্য্যকর ক্রীড়াপর। প্রকৃতিকে অন্ধকার আবরণে আবরিত করিতে আর অতি অল্প মাত্র বিলম্ব, এমন সময় গুটীকত লোক নানাবিধ আহার্য্য ও বসন ভূষণ আনিয়া বৃদ্ধার কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধা বলিলেন "এ সকল কে পাঠাইল?"

উত্তর। একটী যুবক।

বৃদ্ধা। তিনি কে?

উত্তর। তাহা জানি না।

বৃদ্ধা বুঝিলেন যে ইহা সেই দয়ালু যুবকের কার্য্য, সুতরাং সে গুলিকে গ্রহণ করিলেন।

অল্পদিন মধ্যেই বৃদ্ধার কুটীর পার্শ্বে তাহার বাসার্থ সুন্দর গৃহ প্রস্তুত হইল। বৃদ্ধা শুভদিন দেখিয়া নূতন গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং সেই সঙ্গে হোম প্রভৃতি আনুষ্ঠাণিক ক্রিয়াদিও সম্পাদিত হইল। লক্ষ্মী পূজার সময় বৃদ্ধা বড় মনোকষ্ট পাইতেন। দক্ষিণার ভাল ব্যবস্থা হইত না বলিয়া পুরোহিত মহাশয় আসিতেই চাহিতেন না। ভিক্ষালব্ধ অন্নের যৎসামান্য প্রাপ্তিতে তাঁহার মন উঠিত না। বৃদ্ধাকে তিনি কত তিরস্কার করিতেন, পূজাদি করিতে নিষেধ করিতেন.কিন্তু বৃদ্ধা তাহা শুনিতেন না,অনেক কান্না কাটা করিয়া; অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া তাঁহাকে আনিতেন। আজি আর তাঁহাকে ডাকিতে হয় না, তিনি নিজেই উপস্থিত।

পাড়ার লোকে বড় একটা তাঁহার বাটীতে আসিতেন না। ভয় পাছে বৃদ্ধা কমল খাইতে পায় নাই বলিয়া কিছু চায়, কিন্তু আজি সকলেরই আত্মীয়তা বাড়িয়াছে। প্রতিবেশীরা তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইতে ব্যস্ত।

এ সংসারে সকলেই সুখের খেলা ভালবাসে, সুসময়ে ঘরে লোক ধরে না, কিন্তু দুর্দ্দিনে কেহ উঁকি মারে না। বসন্তকালে যখন বন উপবন নব পল্লব, পুষ্প মুকুলে পরিশোভিত হয়, মলয় মারুৎ সুমন্দ হিল্লোলে প্রবাহিত হইয়া জীবদেহে তৃপ্তি সম্পাদন করে, তখন কোকিল আসিয়া কুহুরবে মধুর গীত গায়—কিন্তু নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন বিদ্যুল্লতা প্রভাসিত বর্ষার দিনে আর তাহার দেখা পাইবে না। তখন আর সে তোমায় সেই পঞ্চম তানে মন ভুলাইবে না। স্বভাবের এই বিচিত্র গতি সংসারেও পরিদৃশ্যমান।

কিন্তু এই যে বাটী প্রস্তুত করিয়া দিল, প্রত্যহ আহার্য্য ও অর্থাদি সাহায্য করিয়া এই নিঃস্ব পরিবারের দারিদ্র ঘুচাইলেন, তিনি কে? এ প্রশ্ন বৃদ্ধা হইতে প্রতিবেশী সকলেরই মনে উদয় হইল, কিন্তু কেহই কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। পল্লীর প্রবীন লোকেরা যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিলে তিনি আদৌ তাঁহাদের সহিত দেখা করেন না, একদিন অনেকে গোলমাল বাঁধাইল, যুবকের নিকট বল প্রকাশে পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা পাইল, কিন্তু তিনি সে দিন কোন পরিচয় না দিয়া বলিয়া গেলেন "আগামী কল্য পরিচয়

দিব।” সকলে সেই উৎসাহে রহিলেন, কিন্তু তাহার পরদিন প্রাতঃকালে পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া সকলকে বাঁধিয়া চালান দিল এবং জোর করিয়া পরিচয় পাইবার আশায় ভদ্র সন্তানের অমর্য্যাদা করার জন্য বিশেষ অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করিল।

পুলিশের উপর লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা চির দিনই সমান, সুতরাং সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কাজি সাহেবের নিকট আবেদন করা হয়। কাজি সাহেব তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না, পক্ষান্তরে ওরূপ কার্য্য আর কখন করিলে যে বিশেষ শাস্তি পাইবে তাহা বুঝাইয়া দিলেন, সুতরাং সেই পর্য্যন্ত আর কেহ যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করা দূরে থাকুক তাহার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিতেন না।

যুবকটী আপনাকে রাজপুত জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন এবং নাম বলিয়াছিলেন “প্রতাপ সিংহ”! বৃদ্ধা ও কমল তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস না করিবার কোন কারণও ছিল না।

বৃদ্ধার ঘরে প্রত্যহ এত অধিক পরিমাণে আহার্য্য সামগ্রী আসিত যে তাহাতে একটী বৃহৎ পরিবারের ভরণ পোষণ হয়। বৃদ্ধা প্রতাপকে অত দ্রব্য সামগ্রী পাঠাইতে নিষেধ করিলে, তিনি কেবল হাসিতেন আর বলিতেন “কই আমিত কিছু পাঠাই না।”

কমল কিন্তু ছাড়িতেন না, বলিতেন “তবে কে দেয়?”

প্রতাপ। তা কেমন করিয়া জানিব।

কমল। এবার তবে চেষ্টা করিয়া জানিবেন।

প্রতাপ। সে কথা ভাল—আর যদি জানিতে পারি তাহা হইলে তাহাকে পাঠাইতে নিষেধও করিব।

প্রতাপ এখন প্রায় প্রত্যহই কমলকে দেখিতে আসেন। কমলও যেন তাঁহাকে দেখিয়া পুলকিত হন। বৃদ্ধারও মনে আনন্দের উদ্রেক হয়।

কমলকে আর ভিক্ষায় বাহির হইতে হয় না, কমলের ঘরে জিনিষ ধরে না, কমলই এখন প্রত্যহ কত খাদ্য সামগ্রী বিলাইয়া দেন, দরিদ্রকে পরিতোষ করিয়া আহার করান।

ভিক্ষা করিতে কমলের পূর্ব্বে অনেক সময় কাটিয়া যাইত, সুতরাং মাতার ইচ্ছামত সেবা সুশ্রুষা করিতে পারিতেন না। এখন সে অভাব ঘুচিয়াছে। কমল প্রাণ পুরিয়া মাতৃ সেবায় নিরতা, তাহার ইহাই মহা সুখ!

নবম পরিচ্ছেদ।

অবস্থার পরিবর্ত্তন।

এ জগতে অদৃষ্টের দাস নহে কে? তুমি স্বীকার কর বা না কর, নিয়তির উপর প্রভুতা বিস্তারের তোমার ক্ষমতা কি? তুমি কে? তোমার ক্ষমতা কি যে কোন কার্য্য সম্পাদন কর। যাহা হইবার তাহা আপনি হয়, কেবল আমরা তাহা না দেখিয়া কখন অহঙ্কারে মত্ত হই, কখন শোকে ক্ষোভে ঘৃণায় ম্রীয়মাণ হই। নেপোলিয়ান এ কথা মানিতেন, গ্রহের প্রসন্নতা স্বীকার করিতেন, কিন্তু ভাগ্য-অপ্রসন্নতার সময় তাহা উপেক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ অদৃষ্টের প্রসন্নতাই সংসারের সুখ—আর অদৃষ্টের বিরূপতাই দুঃখ। রাজ রাজেশ্বর সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর, যাঁহার পদতলে শত শত নৃপতি নতশির, শত শত লোক যাঁহার স্তব পাঠে নিযুক্ত—অনুগ্রহ প্রত্যাশী, যাহার অতুল সুখৈশ্বর্য্য দেখিয়া লোক বিস্মিত হতবুদ্ধি, যাঁহার প্রবল প্রতাপে লোক কম্পিত, তাঁহারও ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটে! ঈশ্বরাবতার রবিকুল তিলক স্বয়ং রামচন্দ্র রাজ্যাভিষেকের দিবসে দীন বেশে বনচারী হইয়া অশেষ কষ্টভোগ করিয়া ছিলেন, অপরের কথা আর কি বলিব? কোথায় সে কনকময়ী রত্ন কিরিটিনী লঙ্কাপুরী, কোথায় সেই দাসে রূপী দেবগণ পরিসেবিত অমিততেজা লঙ্কেশ্বর, কোথায় তাঁহার লক্ষ পুত্র? সে বংশ আজি নির্ম্মূল। কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র কোথায়? আর সেই দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা আখ্যা প্রাপ্ত আকবর সাহের বংশধরগণ আজি কোথায়? পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল যে তাঁহার সেই সাধের প্রাসাদ সমূহ আজি বিজাতীয়ের অধিকার ভুক্ত হইবে? তাই বলি অদৃষ্টের নিকট ধন, জন, মান, মর্য্যাদা, বিষয়, বিভব, কিছুই চিরস্থায়ী নহে। অদৃষ্ট এ সকলকেই তৃণবৎ জ্ঞান করে। আবার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে না হয় কি? আমাদের কমলের অদৃষ্ট প্রসন্নতা কি তবে আশ্চর্য্য কথা?

কমলের হইয়াছেই বা কি? কমল এখনও অবিবাহিতা,—এখনও অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী সুধাধবলিত সৌধশিখর-বিহারিণী হইতে পারেন নাই, ভিক্ষা মাত্র ঘুচিয়াছে, তাই বলি হইয়াছে আর কি? যাহার মনে কপটতা নাই—যাহার মাতৃভক্তি অতুল, তাঁহার অদৃষ্ট প্রসন্নতা যদ্যপি না হয়, তবে আর কার হইবে? কিন্তু মনে বড় ভয় হয় সুধাংশুকুলভূষণ ধর্ম্মাত্মা যুধি-

স্থির, জগতের যাবতীয় লোকের ধর্ম্ম কার্য্যের আদর্শ স্বরূপ হইয়াও রাজ্যচ্যুত ও বনবাসী হইয়াছিলেন। দাস্যবৃত্তি অবলম্বনে অজ্ঞাতরূপে বিরাট ভবনে কাল হরণ করিতে হইয়াছিল, তাই বলি আমাদের কমলের তবে আশা কোথায়?

অর্থ স্বাচ্ছল্যে, প্রতাপের সহবাস সুখে, কমলের আজ প্রায় একটী বৎসর সুখে কাটিয়াছে। কমলের জীবনের মধুর বসন্তের দিনে আবার বুঝি বর্ষা দেখা দেয়। বালিকার কোমল প্রাণের সুখ-স্বপ্ন বুঝি অসময়ে ভাঙ্গিয়া যায়!

বসন্তের নব অভ্যুদয়—নব বিকসিত কোমল পল্লবে তরু লতা নূতন শোভায় সুশোভিত। চ্যূত কলিকা অঙ্কুরিত হইয়া প্রণয় প্রয়াসী মধুকরে প্রেম সম্ভাষণ করিতেছে। চারি মাস ধরিয়া গাহিবার বায়না পাইবার আশায় পিকবর মুকুলিত সহকার শাখায় আপন কৃষ্ণ কলেবর লুকাইয়া গলায় গিট্‌কিরি বাহির করিতেছে। দেখা দেখি সকল পাখীই সন্ধ্যা নাই সকাল নাই, রিহার্স্যেল দিতেছে। বেয়াড়া বেসুরো ছাতারেগুলো জ্বালাতন আরম্ভ করিয়াছে, রিহার্সেলের ধুমে দিনরাত্র বিহঙ্গম রবের বিরাম নাই। বড় লোকের বড় কথা—ঋতু রাজের আগমনে সকলেই তাঁহার পরিচার্য্যায় নিযুক্ত। মলয় গিরি ব্যজনকের কার্য্য-ভার গ্রহণ করিয়াছে। তাই সুমন্দ হিল্লোলে দক্ষিনানিল সকাল সন্ধ্যায় ঝুর্ ঝুর্ করিয়া বহিয়া শরীর জুড়াইতেছে। সে কি আর তোমার আমার সেবায় রত—তা নয়। সুধাংশুদেব ক্ষয়কাশে ক্ষীণ দেহ হইলেও উঠিয়া পড়িয়া ফরাসের কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত। মণিমুক্তা খচিত সুনীল বিচিত্র চন্দ্রাতপে উদয় হইয়া সুন্দর নৈশালোকে মেদিনীকে হাস্য মুখী করিতেছেন। এ সময়ে উদ্যা-নের অপূর্ব্ব শোভা! পুষ্পবতী মাধবী আপন সৌরভে বিভোর হইয়া গাঢ় আলিঙ্গনে মুকুলিত সহকারে আবদ্ধ। মল্লিকা, মালতী, যুথিকাদি সুরভিত কুসুমকুল নবোঢ়া কামিনীর মধুর হাসি হাসিতেছে। নিশির শিশিরের শীতলতা ঘুচিয়াছে। কমলিনী প্রাণনাথের অল্পায়ুর জন্য খেদের আধিক্যে জীবন ত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু এখন আবার নব জীবন প্রাপ্ত হইয়া সরো-বরের শোভা সম্পাদন করিতেছে, ভ্রমর ভ্রমরী তাহার পাতিব্রতের গুণগান করিতেছে। কিন্তু আপনার গুণগান যেন তাহার ভাল লাগিতেছে না, তাই হেলিয়া দুলিয়া তাহাদিকে তৎকার্য্যে নিরস্ত হইতে বলিতেছে। আজি এ হেন সুখের দিনে আমাদের কমল কুমারী বিষণ্ণা কেন?

কমল প্রায় প্রত্যহই প্রতাপ সিংহকে দেখিতে পান, কিন্তু আজ যে তিন

দিন তাঁহার দেখা নাই, আজও যে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তথাপি প্রতাপ ত আসিলেন না। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, রাত্রি আসিল, সে রাত্রিও পোহাইল, কিন্তু প্রতাপের দেখা নাই। পর দিবস কমল আরও উৎকণ্ঠিতা হইলেন। পাঠক, কমলের এত উৎকণ্ঠার কারণ কি? তবে কি কমল মনে মনে প্রতাপকে ভাল বাসিয়াছেন, আত্ম সমর্পন করিয়াছেন? সে প্রাণের গোপন কথা কেমন করিয়া বলিব?

আবার রাত্রি আসিল। কমলের আর কখন রাত্রি এত দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয় নাই। রাত্রি যেন আর পোহায় না, কতবার তন্দ্রা আসিল, কতবার ভাঙ্গিল, ক্রমে সে রাত্রিও পোহাইল। পরদিন যথা সময়ে আবার আহার্য্য আসিল, কমল প্রত্যহই তাহাদিগকে ব্যগ্রতা সহ প্রতাপের কথা জিজ্ঞাসা করেন, আজিও করিলেন। উত্তর কিন্তু আশাপ্রদ নয়, তাহারা প্রতাপকে চিনে বলিয়া স্বীকার করে না। আজও সেই উত্তরই পাইলেন। কমলের আশা নিষ্ফল হইল, হৃদয় ব্যথিত হইল। কমল হৃদয় বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, গৃহের বাহিরে যাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কমল ভাবেন তবে ইহারা কে? যদি প্রতাপের লোক না হইবে তবে আমাদের প্রতি ইহাদের এতাদৃশ অনুগ্রহ কেন? আর যদি প্রকৃতই প্রতাপের লোক হয়, তাহা হইলে তাঁহার সংবাদ দেয় না কেন? আমার তাপিত প্রাণ শীতল করে না কেন? কমল এই রূপ কতই ভাবেন, কতই কাঁদেন।

আর একদিন সেই লোকগুলি আবার আসিলে, তাহাদিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধকে কমল জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনিও কি প্রতাপ সিংহকে জানেন না?"

বৃদ্ধ। না।

কমল। এত আহার্য্য কে পাঠায়?

বৃদ্ধ। তা জানি না।

কমল। সে কেমন কথা। কোথা হইতে এই সকল আসে।

বৃদ্ধ। তাহার ঠিক নাই। একটী লোক আমাদিগকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া এই সমস্ত এখানে দিয়া যাইতে বলেন।

কমল। প্রত্যহই তবে তোমরা এস কেন, অন্য লোক দিয়াও ত তিনি পাঠাইতে পারেন।

বৃদ্ধ। সে কথা কেমন করিয়া জানিব।

কমল। আমি যদি এ সমস্ত না লই।

বৃদ্ধ। আমরা রাখিয়া চলিয়া যাইব।

কমল। তথাপি সত্য কথা বলিবেন না।

বৃদ্ধ। বলিবার উপায় থাকিলে বলিতাম বই কি?

কমল। তবে তুমি সমস্ত জান।

বৃদ্ধ। আমি জানিনা বলিয়া ভাবিলে আপনার আর প্রত্যহ জিজ্ঞাসার কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

কমল আবার বিষণ্ণা হইলেন। আবার কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া চিন্তা মগ্না হইলেন, কমলের মুখে আর সে হাসি নাই, সে স্ফূর্ত্তি নাই, নয়নের সে প্রাণ-হারী সৌন্দর্য্য নাই, সাধের কমল যেন শুষ্ক, অমন সুধাংশু যেন প্রভাহীন।

এক দিন দুদিন করিয়া সপ্তাহ, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এইরূপে একটী মাস অতীত হইল। কমল এ জীবনে অনেক মাস যাইতে দেখিয়াছে, কিন্তু এত দীর্ঘস্থায়ী মাস আর কখন দেখে নাই। কমলের মানসিক যাতনা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

বৃদ্ধা মাতা তাহার মনোভাব বুঝিলেন একদিন বলিলেন "কমল, তুই দিন দিন এমন হচ্ছিস্ কেন মা?"

কমল জড়িতস্বরে তাহার উত্তর দিল "কই না—না।"

এই কথা বলিয়া দ্রুত পদে তথা হইতে চলিয়া গেল, বাহিরে যাইয়া চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিল। বিধাতঃ প্রেমের পারিণামই কি ক্রন্দন, না ক্রন্দনে প্রেমের পরিপুষ্টি?

দশম পরিচ্ছেদ।

সুখসম্মিলন।

কমলের বাটী দিল্লীর প্রসিদ্ধ কুতব মিনারের অতি নিকটবর্ত্তী। কমল প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সেই বিশাল স্তম্ভের নিকট উপস্থিত হইতেন। তাঁহার একটী সমবয়স্কা প্রতিবেশিনী প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে যাইতেন। কুতবমিনারে কি আছে, যে তাহা দেখিয়া শান্তি লাভ হইবে? থাকুক আর নাই থাকুক কমল প্রত্যহ তথায় যাইতেন, তাহার গগনস্পর্শী চূড়ারদিকে স্থির দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতেন, আর কত কি ভাবিতেন। ভাবনা আর কি,—সেই প্রতাপ সিংহ,—যাতনা—তাহার বিরহ।

কুতবমিনারের পার্শ্বস্থ, প্রস্তরোপরি এক দিন কমল এক মনে উপবিষ্টা, এমন সময়ে একটী যুবক আসিয়া পশ্চাৎ দিক হইতে হস্ত দ্বারা তাঁহার চক্ষুদ্বয় আবরিত করিলেন।

কমল বলিলেন "দূর পোড়ার মুখী ছাড়।

যুবক হাত ছাড়িয়া হাসিয়া কহিলে "পোড়ার মুখী নয়, পোড়ার মুখো।"

কমল চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন "আ-আ-আপনি।"

যুবক। আবার "আপনি" অমন করিলে ত আর কথা কহিব না।

কমল যেন সহসা স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন, তাঁহার হৃদয় যেন মর্ত্ত ছাড়িয়া স্বর্গের বিমল বিভায় বিভাষিত হইল, মধুর হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা তুমি।"

যুবক। আমি কে?

কমল অধোবদনে মৃদু হাসিয়া কোন কথা কহিলেন না।

যুবক কমলের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "কে বল?"

কমল। না।

যুবক। তবে আমি আবার যাইব।

কমল। আবার!

যুবক। তবে বল আমি কে?

কমল। প্রতাপ আমার প্রতাপ——

যুবক সস্নেহে বলিলেন "তুমি আমার সাধের কমল।"

কমল। আমি এখানে আছি কি করিয়া জানিলে?

যুবক। প্রাণ যারে চায় সে কোথায়, তাহা জানা কি বড় কঠিন?

কমল। আমি তোমার সঙ্গে আর কথা কহিব না।

যুবক। কেন?

কমল। এত দিন কোথায় ছিলে?

যুবক। কোন বিশেষ কার্য্যে দেশান্তরে গিয়াছিলাম।

কমল। তবে আমি আর তোমায় ভাল বাসিব না।

যুবক। কেন কমল?

কমল। আবার কবে কাঁদাইয়া যাইবে?

যুবক কমলের মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন, "তুমি আমার জন্য কেঁদে ছিলে কমল?"

কমল। না, কাঁদিনি বই কি!

যুবক। আমিই কি কাঁদিনি?

কমল। কখনই না।

যুবক। কিসে জান্‌লে?

কমল। প্রাণ কাঁদ্‌লে কি না দেখে থাকা যায়?

যুবক। বিশেষ কার্য্য——

কমল তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন "ভালবাসায় আবার কার্য্য কি?"

যুবক। অন্যায় করিয়াছি, ক্ষমা কর।

কমল। তুমি ত কোন অন্যায় কর নাই যে ক্ষমা করিব।

যুবক। আমার উপর রাগ করিয়াছ?

কমল। তোমার উপর রাগ ইহা কি সম্ভব? তুমি যে আমার জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব, তোমার উপর রাগ করিব!

যুবক। তবে কি করিয়াছ?

কমল। কিছু না।

যুবক। সত্যই কি কিছু না?

কমল। না,—কেবল আপন মনে, আপন প্রাণে, এই এক মাস যে কি যাতনা ভোগ করিয়াছি তাহা আমিই জানি।

যুবক। সে দুঃখ ভোল।

কমল। তাহাতে ভুলিয়াছি।

যুবক। কখন?

কমল। তোমাকে দেখিবা মাত্র।

যুবক স্নেহ ভরে কমলকুমারীকে আলিঙ্গন ও মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন "আমাকে দেখিবা মাত্র কমল?"

কমল। হাঁ, তোমাকে দেখিবা মাত্র।

যুবক। কমল, তুমি আমায় ভালবাস?

কমল মৃদু হাসিয়া কহিলেন "না।"

যুবক। তুমি কি সত্যই আমায় ভালবাস?

কমল স্থির দৃষ্টে যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলেন "সে কথা আর কেন?"

যুবক। আমার কাজ আছে।

কমল। তবে আমি বলিব না।

যুবক। না বল।

কমল। লোকে পুণ্য কাজ করিয়া সে কথা মুখে আনে না। আমি আনিব কেন?

যুবক। তবে ভালবাস?

কমল কোন উত্তর দিলেন না।

যুবক পুনরপি বলিলেন "একটী কথা বলি শুনিবে?"

কমল। শুনিব।

যুবক। আমি অতি দীন হীন, আমায় ভালবাসিবে?

কমল। বাসিব।

যুবক। আমি বিদ্রূপ করিনি।

কমল। আমিও করিনি।

যুবক। ভাবে বুঝিতেছি তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিতেছ না, কিন্তু আমি প্রকৃতই বলিতেছি যে আমার অবস্থার ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

কমল। কিসে?

যুবক। আমার যে চাকরিটী ছিল তাহা আর নাই।

কমল। এই!

যুবক। এটা সহজ কথা নয়। আমার দিন চলা ভার হইয়াছে।

কমল। সামান্য সৈনিক বিভাগের চাকরীই যে তোমার এক মাত্র অবলম্বন একথা আমার কখন মনে হয় নাই।

যুবক। কেন?

কমল। এত সৌন্দর্য্য—এত লক্ষ্মী-শ্রী, আমি সৈনিক কর্ম্মচারীদের মধ্যে কখন দেখিনি।

যুবক হাসিয়া কহিলেন "তবে কি তুমি আমায় রাজার ছেলে বলিয়া মনে করিয়াছিলে না কি?"

কমল। কতকটা করিয়াছিলাম বৈ কি।

যুবক। তাই ভালবাসিয়াছিলে বুঝি?

কমলের সেই প্রশান্ত নয়নকোণে কোপের চিহ্ন বিকাশিত হইল। কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

যুবক। কমল ভাবিয়া দেখ—এখনও বিবেচনা কর, তোমার সে অতুল

রূপ, সৌন্দর্য্য তাহাতে অনেক ক্ষত্রিয় রাজপুত্র তোমায় বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু সে সুখ ছাড়িয়া তুমি এ দরিদ্র রাজপুতকে কেন ভালবাসিবে ?

কমল। তাহাতে কোন ক্ষতি আছে কি ?

যুবক। আছে বই কি—তোমায় যদি সুখীই না করতে পারি তবে বিবাহ করি কেন ? তুমি বাল্যাবধি অনেক ক্লেশ পাইয়াছ, আবার ভবিষ্য-জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট করি কেন ?

কমল। কথাটা বুঝিলাম না।

যুবক। কেন ?

কমল। আমার কপালে সুখ না থাকিলে কেহ কি আমায় সুখী করিতে পারে ?

যুবক। না পারিলেও চেষ্টা ত করিতে হয়।

কমল। তুমি আমায় ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন করিবার চেষ্টা পাইও না।

যুবক। আমি সে কথা বলি নাই।

কমল। তবে আর কি বলিতেছ ?

যুবক। নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিতে বলিতেছি।

কমল। অনেক দিন তাহা ভাবিয়া ঠিক করিয়াছি।

যুবক। কি ঠিক করিয়াছ ?

কমল। আমি তোমা বই আর কিছু চাই না, আমি সহায়, সম্পদ, মান, যশ কিছুরই প্রার্থিনী নহি—আমার পূর্ব্বাবস্থা কি ছিল ভাই ?

যুবক। তথাপি তোমার কুটীর ছিল।

কমলের চক্ষু সজল, বলিল—"প্রতাপ, তুমি আমার হৃদয় জান না, তোমায় বিবাহ করিয়া যদ্যপি আমাকে অতি হীনাবস্থায় পর-পদসেবিকা দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া উদরান্ন সংস্থান করিতে হয়; এমন কি যদি পরান্নে জীবন-ধারণও করিতে হয়; তরুতলে বাস, অধিক কি কোথায় উত্থান, কোথায় শয়ন তাহারও যদ্যপি স্থিরতা না থাকে; অনন্তব্যাপী নক্ষত্রখচিত নৈশাকাশই যদ্যপি আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থান হয়, তাহা হইলেও তোমার সহবাসে আমার সুখ ধরিবে না। তোমার মুখে হাসি দেখিলে আমি সকল যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিব, কিন্তু প্রতাপ বল—বল, তুমি কি আমায় ভালবাস ?"

প্রতাপ সস্নেহে কমলের সেই সলজ্জ মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "তোমায়

ভালবাসি কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ ?—কমল, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না ?

কমল লজ্জিত হইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—"না করি বই কি।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সুখের শেষ।

এইরূপ অনন্ত সুখে কমলের দুইটী বৎসর কাটিয়া গেল। কমলকুমারী মহাসুখে মহানন্দে প্রতাপ-সন্দর্শন-সুখ-ভোগে দুইটী বৎসর কাটাইল। দুইবার হাসিতে হাসিতে শারদীয় জ্যোৎস্না চলিয়া গেল, দুইবার রঙ্গ সহ বসন্তের মৃদু অনীল তাহাদের কোমল দেহায়তন পরিপুষ্ট করিল। আজি সেই সুখ শান্তি-ময় দুইটী বৎসর অতীত হইয়াছে। এখন আর কমল বালিকা নহে, এখন তাহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর, যৌবনের মন-মুগ্ধকর মোহিনী ছটা তাহার অঙ্গে অঙ্গে উছলিয়া পড়িতেছে—পুরাতনে নূতনের সমাবেশ হইয়াছে, কমলকুমারীর জীবনবর্ষে আজি বসন্ত উদয় হইয়াছে,—মধুর ফাল্গুন মাস দেখা দিয়াছে।

পাঠক! তুমি সেই দ্বাদশবর্ষীয়া কমলকুমারীর বালিকা বয়সের সুন্দর রূপ বিভায় একদিন চক্ষু জুড়াইয়াছ, কিন্তু আজি তাহাতে আবার কি নূতন শোভা হইয়াছে তাহা দেখিবে না কি? আজি তোমার সেই নয়ন পরিতৃপ্তকারী রম্য-কাননের কচি কচি চারা গাছগুলিতে কি ফুল, কি পাতা, কি কুঁড়ি, কি বল্লরী, স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া তোমার নয়ন সম্মুখে রহিয়াছে, তাহা আঁখি মেলি দেখিবে না কি?

সেই বালিকা বয়সের চক্ষু দেখিয়াছ, আজি আবার তাহার ভাবান্তর দেখ, কি মনোহর উজ্জ্বলতায় পরিপূর্ণ, ওষ্ঠযুগল কে যেন অলক্তকে অল্প রঞ্জিত করিয়াছে। বিধাতঃ! তুমি কি সেই অবধি কেবল কমলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেই নিযুক্ত আছ? বক্ষের কি মোহন ভাব! বস্তুতঃ দূর হইতে দেখিলে কমল মানবী বা সুচতুর ভাস্কর নির্ম্মিত প্রস্তরমূর্ত্তি তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

নিতম্বিনীর নিতম্বভাব কি পরিপাটী, উরুদেশ কি মনোহর—তায় আবার তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ সূক্ষ্ম বসন ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে। কে এমন সুন্দর পদযুগলের সৃষ্টি করিয়াছিল রে? কুঞ্চিত কেশদাম যেন উন্মাদ ভাবে সেই পদ চুম্বন করিতেই ধাবিত। অঙ্গুলির গঠন পরিপাট্য কি সুন্দর, সে সৌন্দর্য্যের

উপমা নাই ;—দন্তাবলী এমন সৌন্দর্য্য সহকারে সন্নিবেশিত যে তাহার উল্লেখ করা যায় না, যে সেই কমল মুখের মধুর হাসি দেখিয়াছে, সেই জানে যে তাহা কত সুন্দর, তাহাতে বিধাতার কি অপরূপ শিল্প নৈপুণ্য বিরাজমান!

কমলের বেশ বিন্যাস করা নাই। একদিন প্রতাপ তাঁহাকে বেশ বিন্যাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কমল তাহার প্রতি উত্তর দিয়াছিল, "যে দিন সমাজ-চক্ষে তুমি আমার, আমি তোমার হইব, সেই দিন বেশ-বিন্যাস করিব—এখন নয়।"

প্রতাপ। তাহার এখনও বিলম্ব আছে।

কমল। কেন প্রতাপ, তুমি কি আমায় বিবাহ করিবে না, আমার হইবে না?

প্রতাপ। বালাই।

কমল। তবে এত বিলম্ব করিতেছ কেন? আত্ম-পরিচয়ই বা দাও না কেন?

প্রতাপ। সময় হইলে সকলি বলিব।

কমল। তাহার আর কত বিলম্ব?

প্রতাপ। আর বেশী নয়—হয় শীঘ্র আমাদের বিবাহ হইবে, না হয় আমায় আবার রণস্থলে যাইতে হইবে।

কমল। কোথায়?

প্রতাপ। কাশ্মীরে।

কমলের চক্ষু সজল হইল। প্রতাপ সিংহ বলিলেন "তুমি কাঁদিতেছ?"

কমল। তুমি কাঁদাও কেন?

প্রতাপ। আমি সত্যই বলিয়াছি।

কমল। আমি যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করি না—তবে—

প্রতাপ। তবে কি?

কমল। আমায় বিবাহ করিয়া যাও।

প্রতাপ। তাহাতে সুখ কি?

কমল। আমারও সঙ্গে যাইবার অধিকার জন্মিবে।

প্রতাপ। রণে জয় পরাজয় আছে।

কমল। তাহাতে ক্ষতি কি।

প্রতাপ। যদি মারা যাই।

কমল। আমিও সেই সঙ্গে মরিব।

প্রতাপ কমলের মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, তাহা স্থির গম্ভীর। বলিলেন "এটা কি অন্তরের কথা?"

কমল। প্রাণের কথা।

প্রতাপ। তবে একদিন তুমি আমার প্রদত্ত অলঙ্কারগুলি পর।

কমল। না প্রতাপ তাহা পরিব না, আমায় সে অনুরোধ করিও না। আমি এখন মাকে গোপন করিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করি। আর কি আমার তোমার সঙ্গে পথে ঘাটে বেড়াইবার দিন আছে। তবে নিতান্ত থাকিতে পারি না বলিয়াই আসি।

বসন্তকাল,—আজি কমলকুমারী একখানি পরিষ্কার কাপড় পরিয়া নির্জ্জন প্রান্তরে একাকিনী অনন্ত প্রকৃতি-ভাণ্ডারের নবীন শোভা দেখিতেছেন। আমরা বলি প্রকৃতিকে আপন সৌন্দর্য্য দেখাইয়া লজ্জা দিতেছেন। কেশদাম অরচিত, পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত; মৃদু অনিল তাহাদিগকে লইয়া পরম কৌতুকে ক্রীড়া করিতেছে, কখন বা মাতিয়া উঠিয়া রমণীকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে। রমণী মৃদু হাসিয়া শশব্যস্তে বসন সাবধান করিতেছে; মনে মনে প্রাণশূন্য বায়ুকে ভর্ৎসনা করিতেছে—অমনি অপাঙ্গে এদিক ওদিক চাহিতেছে। পাঠক! কাহার জন্য কমল এখানে? তাহা কি আর বলিতে হইবে? কিন্তু কৈ কুমার কোথায়? সূর্য্য যে অস্ত যায়, সন্ধ্যা যে আর থাকে না? এ শোভা, এ অনন্ত শোভা—আর তিনি কখন দেখিবেন?

আজ দুইটী বৎসরের পর কমলের চক্ষু আবার সজল হইল, প্রতাপ আজি আবার আসিলেন না। আজকাল করিয়া সপ্তাহ গেল, আবার প্রতাপ অদৃশ্য, হা বিধাতঃ! কমলকে কেন কাঁদাও?—ও চক্ষু ত কাঁদিবার জন্য সৃজন কর নাই।

সপ্তাহ সপ্তাহ করিয়া মাস অতীত হইল; কিন্তু প্রতাপ আসিলেন না, দিনে দিনে কমলের মানসিক যাতনা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, দিনে দিনে বিভাকর বিহনে কমল শুকাইতে লাগিল।

পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, দিল্লী হইতে হিন্দু দাসেরা সেই পর্য্যন্ত প্রতিদিন কমলকে নানাবিধ আহার্য্য ইত্যাদি আনিয়া দেয়, কাহারও নিষেধ শুনে না, কাহারও কথা মানেনা; তাহারা আপন মনে আপন কার্য্য করিয়া যায়। কিন্তু আজি সন্ধ্যা হইল, কই তাহারাও আসিল না ত?

ক্রমে তাহাদের আসাও বন্ধ হইল। কমল মনে মনে জানিত যে আত্মীয় প্রেরণ কুমারের কার্য্য। সুতরাং তাহাদিগকে না আসিতে দেখিয়া তাহার মন আরও সন্দিগ্ধ হইল,—চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, মনে হইল—"প্রতাপ কেমন আছে, তাই বা কে জানে?"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নব পরিবর্ত্তন।

আগ্রার রাজপ্রাসাদের একটী সুসজ্জিত কক্ষে বাদসাহ আকবর সাহের পুত্র—ভারতের ভাবী সম্রাট সেলিম উপবিষ্ট। দ্বারদেশে দ্বাদশজন অস্ত্রধারী দ্বাররক্ষা করিতেছে। মূল্যবান্ কিংখাপের উপর সল্মার কারুকার্য্য সম্পন্ন পোষাক পরিয়া বহুসংখ্যক দাস সাহাজাদার আদেশ প্রতিপালনার্থ দণ্ডায়মান। সাহাজাদা সুমধুর-কস্তুরী-সৌগন্ধ-আমোদিত তামাকু সেবন করিতেছেন, এমন সময় সেই কক্ষমধ্যে একজন দৌবারিক প্রবেশ করিয়া করপুটে কহিল "মহারাজ মানসিংহ সাহাজাদার দর্শনপ্রার্থী।"

সেলিম কুণ্ডলীকৃত ভূজঙ্গিনীসম আলবালা হইতে একমুখ ধূম উদ্গীরণ করিয়া রক্ষীর দিকে চাহিলেন।

রক্ষী করপুটে দণ্ডায়মান রহিল, তখন সেলিম আবার ধূমপান করিতে লাগিলেন, আবার ধূম নিঃসারণ করিয়া কহিলেন "সেলাম দাও।"

দাস কুর্ণিস করিয়া চলিয়া গেল। অনতিবিলম্বেই সুন্দর বেশ ভূষায় বিভূষিত হইয়া মহারাজ মানসিংহ প্রবেশ করিলেন। মানসিংহ ভূমিস্পর্শ করিয়া সেলাম করিলে সেলিম আসন হইতে উঠিয়া মহারাজের হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে আপন আসনেই বসিতে বলিলেন।

মহারাজা সহাস্তে কহিলেন, "চিরদিনই কি এত লোক দেখান সম্মান দেখাইতে হয়?"

সেলিম। লোক দেখান ত নয়, অন্তরের। আর আপনার যে সম্মানের সম্বন্ধ। সুধু তাই নয়, আপনি বাদসাহের পরম মিত্র। পঞ্চ হাজারীর অধ্যক্ষ। কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও আপনাকে সম্মান দেখাইতে আমি বাধ্য।

মান। আপনাদের অনুগ্রহেই আমি চিরবাধ্য।

সেলিম। মহারাজ মানসিংহ রাজনৈতিক চূড়ামণি। বৃথা আত্মীয়তা জন্য যে তিনি এ সময়ে আমায় সাক্ষাৎ দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। সেলিমকে কি আপনার কোন অভিলাষপূর্ণ করিয়া কৃতার্থ হইবার অবসর দিবেন?

মানসিংহ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কার্য্য আছে বটে—তবে আমার নিজের নয়। উপদেশের জন্য আসিয়াছি।"

সেলিম। আদেশ করুন।

মান। কথাটা নিতান্ত গোপনীয় বলিয়া মনে করিতে হইবে।

সেলিম। কার্য্য ইচ্ছানুরূপই হইবে।

মান। সাহাজাদা খসরু একটী দরিদ্রার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন।

সেলিমের চক্ষুদ্বয় স্থির হইয়া আসিল, বলিলেন, "খসরু—আমার সন্তান খসরু।"

মান। আপনার সন্তান।

সেলিম। যবনী সহ?

মান। না, হিন্দু।

সেলিম। বেশ্যা?

মান। না কুলকামিনী।

সেলিম। আমার সন্তান যে পথে ঘাটে যাহার তাহার সঙ্গে প্রণয় করিবে তাহা আমার ইচ্ছা নয়।

মান। আমারও তাই।

সেলিম। তাহাকে বিবাহ করিতে চায়?

মান। কোন কথা প্রকাশ নাই।

সেলিম। সে কিরূপ?

মান। আত্মপরিচয় গোপন করিয়া ভালবাসা জন্মিয়াছে।

সেলিম। কেন?

মান। বোধ হয় যুবতী মুসলমানকে আত্মসমর্পণ করিবে না,—বিবাহ সে না বলিয়া।

সেলিম হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন "যে মুসলমানের করে প্রতাপশালী মহারাজ মানসিংহ ভগ্নী সমর্পণ করিতে পারেন, সে যবনকে একটা অপরিচিত হিন্দু কন্যা বিবাহ করিবে না ইহা কি সম্ভব?

মান। সম্ভব বলিয়াই বলিতেছি, আমি বিশেষ করিয়া জানিয়াছি বলিয়া বলিলাম, নতুবা অন্য উপায় করিতাম।

সেলিম। কি করিতেন, খসরুর সেই অপরিচিত কন্যার সহিত বিবাহ দিতেন, সেই অপরিচিত অশিক্ষিত দরিদ্র কন্যার গর্ভে সন্তান উৎপাদিত হইয়া দিল্লীর পবিত্র সিংহাসন কলুষিত করিত?

মান। আমার সে অভিপ্রায় নয় বলিয়া এত সকল কথা প্রকাশ করিতেছি, নতুবা করিব কেন? খসরু অপেক্ষা সাহাজাদা খুরমের আমি সমধিক পক্ষপাতী। তাই আমার মনে হয় যবনকুল নারীরা হিন্দু ললনা অপেক্ষা গুণবতী।

সেলিমের বদনে মধুর হাসি দেখা দিল, বলিলেন "আপনি বর্ণনা করিলে বলি আমারও বিশ্বাস হয়। কিন্তু সে যাহা হউক এ সব কি কথা, সম্রাটের সন্তান, যাহাকে দুদিন পরে সম্রাট হইতে হইবে, তাহার কি যে সে প্রজার কন্যার সহিত প্রণয় করা কর্ত্তব্য? আবার তাহাকে বঞ্চনা করিয়া—আত্মপরিচয় গোপন করিয়া? এখন দেখিতেছি "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই কথা বুঝি পিতার সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইবে।

মান। এখন কি করা কর্ত্তব্য?

সেলিম। রমণীকে বন্দিনী করুন। তাহার গৃহাদি দগ্ধ করিয়া দিন।

মানসিংহ ক্ষণেক নিস্তব্ধ ভাবে রহিল বলিলেন "সেটা কি ঠিক বাক্য।"

সেলিম। সম্রাটের স্বার্থ রক্ষার জন্য কোন কার্য্যই দুষ্কর্ম্ম নহে।

মান। তাহার কোন অপরাধ নাই।

সেলিম। তবে কি করিতে বলেন?

মান। খসরুর অজ্ঞাতে স্থানান্তরিত করা।

সেলিম। কোথায় রাখিবেন?

মান। মহিমহলে, কালে বেগম নুরজাহানের পরিচারিকা হইবে।

সেলিম মধুর হাসিয়া কহিলেন "নুরজাহান নামে যে কেহ আমার বেগম হইবে এ কথা মনে হইল কেন?"

মানসিংহ সহাস্যে কহিলেন "আত্মীয়ে আত্মীয়ের মনোভাব জানিতে পারে।"

সেলিম ক্ষণেক আলবোলার রত্নখচিত মুখনলে অন্যমনস্কভাবে ওষ্ঠদ্বয় স্থাপন করিয়া কহিলেন "তবে সেই ভাল।"

মহারাজ মানসিংহ অভিবাদন করিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নূতন অবস্থা।

অভাগিনী কমলার আবার পূর্ব্ব দশা দেখা দিয়াছে। আবার তাহার অন্নচিন্তা উপস্থিত। কি করিয়া বৃদ্ধা মাতার ভরণপোষণ করিবে তাহাই ভাবিয়া অস্থির। এখন আর কমল বালিকা নহে, যে যাহার তাহার কাছে যাইয়া ভিক্ষা করিবে, এখন তাহার অঙ্গে মদনের রাজ্যাধিকারের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান। যুবতী কমল কি করিয়া ভিক্ষায় বাহির হয়? অথচ ভিক্ষা ভিন্ন উপায়ই বা কি?

কমল মনে মনে নানা প্রকারচিন্তা করিল, পরিশেষে ভিক্ষায় যাওয়াই স্থির হইল। পরদিবস অতি প্রত্যুষে অনলোত্থান করিয়া ভিক্ষা করিতে বহির্গত হইল।

আজি কমল সহরে, আর কখন সে সহরে আসে নাই, যদিও আসিয়া থাকে, সে অতি শৈশব অবস্থায়। কমল ভিক্ষা করিবে কি, দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি হইল। কেহ বিদ্রূপ করিতেছে, কেহ উপহাস করিতেছে, কেহ কত কথা কহিতেছে। কমলের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল, কমল অনেক কষ্টে সে ভাব দমন করিয়া অন্য দিকে চলিল।

কমল বিমর্ষচিত্তে আপন মনে যাইতেছে এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল "কমল।"

কমল ফিরিয়া দেখিল, যে বৃদ্ধ তাহাদের বাটীতে আহার্য্য লইয়া যাইবার সময় সঙ্গে যাইতেন, ইনি সেই ব্যক্তি।

বৃদ্ধ বলিলেন "আমায় চিনিতে পার?"

কমলের বক্ষ দুর্ দুর্ করিতেছিল, মনে হইতেছিল পাছে সে বলে যে প্রতাপের কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে! কম্পিত স্বরে কহিল "পারি।"

বৃদ্ধ। এ দিকে কোথায় যাইতেছ?

কমল। ভিক্ষায়।

বৃদ্ধ। কেন তোমাদের কি বড় কষ্ট হইয়াছে?

কমল সজল চক্ষে বলিল "বড় কষ্ট।"

বৃদ্ধ। সে যুবকটি আর আসেন না, বটে?

কমল। না, আপনি তাঁহার কোন সংবাদ জানেন কি?

বৃদ্ধ। কিছু না।

কমল বিমর্ষ হইলেন।

বৃদ্ধ। তুমি চাকরী করিবে?

কমল। কোথায়?

বৃদ্ধ। বাদসাহ বাটীতে। তোমার কোন আশঙ্কা নাই—জাতি যাইবার ভয় নাই—আমি তোমার পিতৃ সদৃশ, আমার কথায় বিশ্বাস কর।

কমল। করিব।

বৃদ্ধ। কিন্তু আগ্রায় যাইতে হইবে

কমল। আগ্রায়!

বৃদ্ধ। ভয় কি?

কমল। মা যে আছেন।

বৃদ্ধ। তাহা জানি, তিনিও যাইবেন, সেইখানে তাঁহাকে একটি বাসা ভাড়া করিয়া দিব।

কমল। তবে যাইব।

বৃদ্ধ কমলের হস্তে গুটীকতক টাকা দিয়া বলিলেন "যাও বাজার করিয়া লইয়া যাও, আহারাদি করগে, কাল ভোরে তোমাদিগকে লইতে যাইব।"

কমল কুমারী নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে বৃদ্ধের নিকট হইতে টাকা কয়টী লইয়া আপন আবশ্যকমত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বাটী গেলেন। আহারান্তে সমস্ত কথা মাতাকে বলিলেন। আকবর সাহের রাজ্যে হিন্দু মুসলমানে বিদ্বেষ ভাব ছিল না, ধর্ম্মগত কোন অনিষ্টাচরণ হইত না, তথাপি বৃদ্ধা তাহাতে সহসা স্বীকার করিলেন না, কিন্তু কমল অত্যন্ত জীদ্ করায় অগত্যা স্বীকৃতা হইলেন।

পরদিবস প্রত্যূষে বৃদ্ধ আসিয়া কমল ও তাহার মাতাকে আগ্রায় লইয়া গেলেন। বাদসাহের প্রাসাদ সন্নিকটে একটী সামান্য বাসা বৃদ্ধার জন্য ভাড়া করিয়া দিলেন, এবং কমলকে বাদসাহ আকবর সাহের তনয় সাহাজাদা সেলিমের পত্নীর দাসীভাবে নিযুক্তা করিয়া দিলেন। কমল প্রত্যহ মাতার নিকট আসিয়া আহার করিবার অনুমতি পাইলেন এবং তাহার স্বভাব গুণে বেগমও তাহাকে আপন ভগ্নীর ন্যায় ভাল বাসিলেন।

কমলের ন্যায় রমণীকে কে না ভালবাসে? কে না যত্ন করে?—কিন্তু বলিতে কি তাহার ভাগ্য বড় মন্দ। যিনি রাজমহিষী হইবার উপযুক্ত; ভাগ্য দোষে আজি তিনি সামান্য পরিচারিকা মাত্র! আর কি হইবে?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রতাপ সিংহ।

কমলার দাসী বৃত্তি অবলম্বন করিবার প্রায় দুই মাস পরে একটী যুবক সন্ধ্যার প্রাক্কালে কমলের কুটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তথায় কেহই নাই, চালে খড় নাই—ঘর ভগ্ন প্রায়। তন্নিকটে দুই এক ঘর ইতর লোকের আবাস ছিল, তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাহাদিগের দ্বারে দ্বারে যাইয়া কমল এবং তাহার বৃদ্ধা মাতা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কেহই কোন সংবাদ দিতে পারিল না।

যুবকের বদনমণ্ডল গম্ভীর হইল, শারদীয় চন্দ্র যেন রাহুগ্রস্ত হইল, যুবক বিমর্ষ ভাবে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, সেই ভগ্ন কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নীরবে ক্ষণেক অশ্রুবর্ষণ করিয়া তথা হইতে ধীর পাদবিক্ষেপে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার তৎকালিন মনোভাব বর্ণনা করা দুরূহ, সে যাতনা সহৃদয় বুঝিতে পারে, কিন্তু বুঝাইতে পারে না। "মন কেমন" যে কি, তাহা লোকে বুঝে, কিন্তু বুঝাইতে জানে না।

যুবক ধীরে ধীরে মহানগরী দিল্লীতে বাদসাহ আকবর সাহের সুবিস্তৃত প্রসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ত্রিতলের একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া একটী সুন্দর শয্যায় শয়ন করিলেন, এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রগাঢ় চিন্তার পর বলিলেন "কমল, প্রাণাধিক কমল, তুমি কোথায় গেলে, আমায় অকূল পাথারে কোথায় ভাসাইয়া গেলে ?"

যুবকের দুই চক্ষু বাহিয়া তপ্ত অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ ক্রন্দনের পর চক্ষু মুছিয়া একটী সঙ্কেত করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সুন্দর বেশ ভূষায় বিভূষিত একটী অল্প বয়স্ক ভৃত্য আসিয়া তাঁহার পদ প্রান্ত চুম্বন করিয়া করযোড়ে দাঁড়াইল।

যুবক বলিলেন "আমির খাঁ কোথায় ?"

ভৃত্য। আগ্রায়।

যুবক বিরক্তিসহকারে কহিলেন "যাও।"

ভৃত্য প্রস্থান করিল। আমির খাঁ সেই বৃদ্ধ মুসলমানের নাম। আমির খাঁ, সাহাজাদা খসরুর বড় বিশ্বাসী ভৃত্য।

তখন যুবক বলিলেন "সকলি ফুরাইয়াছে আমারও সময় নিকট—কমল

বিহনে এ প্রাণ কি ধরিতে পারিব? বিধাতঃ! যে ছবি স্বর্গে দুর্ল্লভ, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিবে কেন?"

যুবক গলদেশ হইতে মুক্তামালা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, বলিলেন "আর কেন, যখন কমল হারাইয়াছি, তখন আর এই ছাই মালা কেন? কটীদেশ হইতে রত্নখচিত স্বর্ণ কোষস্থিত করবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তুমি নিপাত যাও, যুদ্ধ সাধ জন্মের মত হৃদয় হইতে দূরে যাও—এই নৃশংস যুদ্ধ-পিপাসায় আতুর হইয়া আজি এক বৎসর কমল ছাড়িয়া বিদেশে ছিলাম। সেই জন্যই কমল হারা হইলাম। কমল, প্রাণাধিক কমল একবার দেখা দাও——"

আর কথা ফুটিল না, যুবক উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন "কেন যুদ্ধ সাধ—কেন কাশ্মীর গিয়াছিলাম, রণজয়ী হইয়া আমার কি সুখ হইল? এ জীবনের মত হৃদয় হারা হইলাম। না গেলে, ইতিহাস লেখক না হয় আমাকে কাপুরুষ বলিত,—বলুক ইতিহাস—শত জন্ম কাপুরুষ হইব। বিধাতঃ! দয়াময়! আমার জীবনসর্ব্বস্ব কমলকে দাও—কমল—কমল—ক——"

যুবক সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মূল্যবান কিংখাপ আসনে নিপতিত হইলেন। তদ্দণ্ডেই অগণিত দাস "কি হইল—কি হইল, সাহাজাদার কি হইল" বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তৎক্ষণাৎ হাকিম আসিয়া বহুযত্নে তাঁহার সংজ্ঞা সম্পাদন করিলেন।

সাহাজাদা চক্ষু উন্মীলন করিয়া মনে মনে বলিলেন "রণোমত্ত প্রাণ, কেন প্রেম নীর-পাণাভিলাষ করে? প্রেম ত সাহাজাদার দাস নয়,—এ বিশ্বসংসারে পথের ভিখারী হইতে সাহাজাদা পর্য্যন্ত প্রেমের দাস।"

সাহাজাদা আজি বৎসরাতীত হইল কাশ্মীরে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। সেখানে এক বৎসর অতি কষ্টে কাটাইয়া ছিলেন, মনে করিয়াছিলেন "এই-বার যাইয়া কমলের চরণতলে পড়িয়া আত্ম পরিচয় দিব, তাহার কি দয়া হইবে না। মুসলমান বলিয়া কি আমায় ঘৃণা করিবে? এত আশা, ভালবাসা প্রভৃতি সমস্তই কি ভুলিয়া যাইবে? না না, তাহা পারিবেনা,—যদি পারে?—পারে তাহারই সম্মুখে এ তুচ্ছ প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।"

সাহাজাদা কাশ্মীর হইতে আসিয়াই তাই প্রাণের প্রাণ কমলের কুটীরে কমলমুখী কমলকুমারীকে দেখিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কোথায় কমল—আর কোথায় কমলবল্লভ সাহাজাদা খসরু!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অনুতাপ।

সাহাজাদা বিমর্ষভাবে কক্ষমধ্যে উপবিষ্ট, এমন সময় তথায় মহারাজা মানসিংহ উপস্থিত হইলেন। খসরু বড়ই চিন্তামগ্ন, সুতরাং প্রথমে মহারাজের আগমন উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। মানসিংহ অনেকক্ষণ তাঁহার প্রতি স্থিরদৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া ধীর মধুরস্বরে স্নেহভরে ডাকিলেন "খসরু।"

সাহাজাদা শুনিতে পাইলেন না। মহারাজা আবার ডাকিলেন "খসরু।"

এবার তাঁহার চিন্তা ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখেন সম্মুখে মহারাজা মানসিংহ দণ্ডায়মান। শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন মহারাজা খসরুকে বসাইয়া আপনি তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, এবং বলিলেন "কেমন আছ ?"

খসরু। ভাল আছি।

মান। কিন্তু তোমার মুখ দেখিয়া ত তাহা বোধ হয়না।

খসরু বদন অবনত করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। তখন মহারাজা আবার বলিলেন "আমি সকলই শুনিয়াছি—সকলই জানি।"

খসরু তাঁহার বদন প্রতি তাকাইলেন। মানসিংহ বলিলেন "কথা নিতান্ত গোপনীয় হইলেও তোমার অবস্থা দেখিয়া না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।"

খসরু নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে মহারাজের বদন প্রতি তাকাইয়া বসিয়া রহিলেন।

মানসিংহ বলিতে লাগিলেন "তোমার পিতার ইচ্ছায় কমল স্থানান্তরিত হইয়াছে।"

খসরু সাগ্রহে বলিলেন "কোথায় ?"

মান। তাহা জানিনা। ফলে আমি না থাকিলে হয় ত তাহাকে বন্দিনী হইয়া প্রাণ হারাইতে হইত।

খসরু। কেন ?

মান। তোমায় ভালবাসিত বলিয়া।

খসরু। তবে ভালবাসা পাপ ?

মান। সাহাজাদাকে ভালবাসা বটে।

খসরু। এই কি আপনার মত ?

মান। আমার নয়, তোমার পিতার।

খসরু। পিতার রাগের কারণ কি?

মান। তিনি বলিলেন "যে বাদসাহপুত্র গোপনে যেখানে সেখানে প্রেম বিলাইয়া বেড়ায়, সে দিল্লীর বাদসাহ হইবার অনুপযুক্ত।

খসরু। আর তাঁহার ভালবাসার যথেচ্ছাচারটা কি?

মান। আমি ত সে কথার উত্তর দিতে পারিনা।

খসরু। পিতাকে এ সংবাদ কে দিল?

মান। তাহাও জানিনা।

খসরু। আমি এখনি পিতার নিকট যাইব, কমলকে কোথায় রাখিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিব।

মানসিংহ সবিস্ময়ে বলিলেন "খসরু, তুমি কি পাগল হইলে।"

খসরু। কেন?

মান। তিনি কি মনে করিবেন, পুত্রের কি পিতাকে এই সমস্ত কথা বলা কর্ত্তব্য?

খসরু সরোষে কহিলেন "আর পিতার কি পুত্রের এই সমস্ত গুপ্তকার্য্যে হস্তক্ষেপকরা কর্ত্তব্য? যিনি বাদসাহ আকবর সাহের ন্যায় পিতার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে পারেন, তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত করিবার চেষ্টা পাইতে পারেন, বন্দি করিবার উদ্যোগ করিতে পারেন, তাঁহার অসাধ্য কাজ এ জগতে আর কি আছে।"

মানসিংহ মনে মনে মহা সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলেন "তাই বলিয়া কি তুমিও সেই পদানুসরণ করিবে?"

খসরু। না করিব কেন? তিনি যদি আমার প্রতি স্নেহশূন্য হইতে পারেন, তবে আমিই বা না হইব কেন?

মান। তিনি হিন্দু রমণীকে ঘৃণা করেন, তাই কমলের উপর বিরক্ত।

খসরু। কি! আমার মার অপেক্ষা মুসলমান রমণী ভাল? ধিক্ তাঁহাকে—আর ধিক্ আপনাকে, যে মার মত নারীকুলভূষণের গর্ভে আজি আমি মুসলমান সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

মান। খসরু, বিরক্ত হইও না। ভাবিয়া দেখ যে, আমার ভগ্নীর গর্ভে ভাবি দিল্লীশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এত সুখের আশা না থাকিলে আমি এ কার্য্যে অগ্রসর হইতাম না।

খসরু। ছার সিংহাসন!—আজি আমি হিন্দুস্থান হইলে কমলকে পাইবার চিন্তা কি? আমার রাজ্য বাসনা নাই—আমি ভিখারী হইয়া বিবাগী হইব। আপনি সিংহাসনের আশায় এইখানে থাকুন।

মান। বল কি?

খসরু। আমার যে কথা সেই কাজ।

মান। তবে দিনকতক অপেক্ষাকর, আমায় অনুসন্ধান করিতে দাও।

খসরু। সে আশা বৃথা।

মান। বৃথা নয়, কিন্তু কমল তোমায় বিবাহ করিবে কি? -

খসরু। আমি আর বিবাহের প্রত্যাশী নই,—এখন তাহাকে একবার দেখিলে আমার সকল যাতনা যায়।

মান। তবে আমি যেখানে পাই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব। এখন চলিলাম।

এই বলিয়া মানসিংহ চলিয়া গেলেন। মনে মনে ভাবিলেন "এইবার কার্য্য সিদ্ধ হইবে। পিতা পুত্রে মনান্তরের সূত্রপাত হইয়াছে।" খসরু আবার একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কমল ও বেগম।

দিবা দ্বিপ্রহর অতীত, আগ্রার মতিমহলের একটী সুসজ্জিত কক্ষ মধ্যে একটী ষোড়ষবর্ষিয়া যুবতী সুচারু কারুকার্য্য সম্বলিত মর্ম্মর প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে গোলাপের ফোয়ারা শত মুখে সুশীতল সুবাসিত গোলাপ জল উদ্গীরণ করিয়া দেহের শান্তি ও গৃহের সৌগন্ধ সম্পাদন করিতেছে। যুবতী তাঁহার সেই সুন্দর মনোহর পদযুগল ফোয়ারার নিম্নস্থ গোলাপ জলে স্থাপিত করিয়া বিমর্ষ ভাবে কি ভাবিতেছিলেন। গোলাপ জল যুবতীর সুন্দর মনোহর পদযুগল চুম্বন সুখাস্বাদনে বিভোর ও মৃদুমন্দ বাহিত হইয়া আপন জীবন সার্থক করিতেছিল। কিন্তু এ সুখেও যেন যুবতীর নয়ন দ্বয়ে শোকোচ্ছ্বাস বিভাসিত! হায় রে বিষাদ, তোমার রাজ্যাধিকারের বিজয় আধিপত্যের নিকট সকলি তুচ্ছ! সেলিম, যিনি বাদসাহ জাহাঙ্গির নামে আখ্যাত হইয়া দিল্লীর শাসনদণ্ডের স্বেচ্ছাচার ব্যবহারে সমগ্র

—ভারত ভূমি বিকম্পিত করিয়াছিলেন, তাঁহার মহিষি হৃদয়েও তুমি তোমার ভীষণ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়াছ।

যুবতী এইরূপ বিষাদিত ভাবে উপবিষ্টা এমন সময় তথায় কমল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কমলের এখনও হিন্দু বেশ, কিন্তু অতি পরিপাটী, যুবতী তাঁহার সকল দাসীরই হিন্দু নামের পরিবর্ত্তে একটী করিয়া ম্লেচ্ছ নাম দিয়াছিলেন, কিন্তু কমলের দেন নাই, তাহাকে কমল বলিয়াই ডাকিতেন।

কমলকে দেখিয়া যুবতী হর্ষোৎফুল্ল নয়নে বলিলেন "কমল, আমার কাছে এস।"

কমল যুবতীর নিকট বসিয়া বলিলেন "আপনি আজ এত বিষণ্ণ কেন?"

যুবতী। কমল, আমি কবে বিষণ্ণ নই, তুমি কবে আমায় হাসিতে দেখিয়াছ?

কমল। দেখি নাই বটে, কিন্তু দেখি না কেন? আপনার অভাব কিসের?

যুবতী গম্ভীর ভাবে বলিলেন "আমার অভাব নয় কি? আমার কি সুখ আছে ভাই, তবে অর্থ সুখ,—কে কবে অর্থ সুখে প্রকৃত সুখী হইয়াছে? যে রমণী পতি সুখে সুখী নয়, তাহার আবার সুখ কি?"

কমল। কেন, সাহাজাদা কি আপনাকে ভালবাসেন না?

যুবতী। তুমি পাগল, সাধের ভালবাসা কি পাঁচ জনে হয়। ভাই, আমি কে আর তিনি কে, তিনি প্রভু আমি দাসী; এখানে কি প্রণয় সম্ভবে? প্রণয় শূন্য রমণী হৃদয় কি অসার নয়?

কমল। আমি বনের পাখি বনে থাকি, ও কথা কি করিয়া বুঝিব?

যুবতী। না কমল, তুমি সব বুঝ, তুমি যাহা বুঝ, আমি জানি, আর কেহ তাহা বুঝে না।

কমল নীরবে রহিলেন।

যুবতী। একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব?

কমল। করুন।

যুবতী। তুমি কেন সদাই বিষণ্ণভাবে থাক, বন-বিহঙ্গিনীর এভাব কেন?

কমল। কেন, আমি ত হাসি,—কত হাসি।

যুবতী। সে যেন জোর করে।

কমল। না, স্ব-ইচ্ছায়।

যুবতী। সেদিন রঙ্গ মহলের সেই কোনের ঘরটীতে একলা বসে কাঁদ্‌ছিলে কেন ?

কমল। আপনি কিরূপে জানিলেন ?

যুবতী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আমি জ্যোতিষ জানি।"

কমল। মার অসুখ করেছে বলে।

যুবতী। তখন ত তোমার মার অসুখ করেনি।

কমল। তবে মন বোধ হয় আপনা আপনি কেঁদে ছিল।

যুবতী। সুধু কি প্রাণ কাঁদে ?

কমল। আমরা অনাথা, আমাদের সকলি সম্ভবে।

যুবতী। না কমল তুমি আমার কাছে গোপন কর্‌ছ।

কমল। আমি আপনার দাসী, আমাকে ও প্রশ্ন কেন ?

যুবতী। আমি কি তোমায় কখন দাসী বলিয়া ভাবি ?

কমল। না।

যুবতী। তবে কেন ও কথা ?

কমল। আর বলিব না।

যুবতী। তবে বল, তুমি কি কাহাকেও ভালবাস ?

কমল। বাসি।

যুবতী। কাহাকে ?

কমল। প্রতাপ সিংহকে ?

যুবতী। তিনি কে ?

কমল। তাহা জানি না ?

যুবতী। জান না ?

কমল। না।

যুবতী। তিনি কোথায় ?

কমলের চক্ষে জল আসিল, কোন উত্তর দিলেন না।

যুবতী। তবে কি তিনি নাই ?

কমল সজল চক্ষে বলিলেন "বালাই।"

কিন্তু তাহার ইন্দিবর চক্ষু বহিয়া সবেগে টস্‌ টস্‌ করিয়া জল পড়িল।

যুবতী। তুমি কাঁদ্‌চ ?

এমন সময়ে একজন দাসী আসিয়া কহিল "সাহাজাদা আসিতেছেন।"

কমল শশব্যস্তে উঠিয়া গেলেন, অন্য কক্ষে প্রবেশ করিয়া আবার নীরবে আপন মনে, উদাস হৃদয়ে, কাঁদিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত রহস্য!

কমল কুমারীর মাতা সাংঘাতিক পীড়িতা, তাঁহার জীবনের আশা অতি অল্প। কমল বড়ই বিষণ্ণা। আজি চারি দিবস ধরিয়া কমল বাদসাহ ভবনে যায় নাই, কেবল মাত্র বৃদ্ধা মাতার সুশ্রূষায় নিরতা।

বেলা প্রায় অবসান, এমন সময় কমল একবার বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার ইচ্ছা হইল। একটী দাসীকে মাতার নিকট রাখিয়া আপনি প্রাসাদাভিমুখে চলিল।

বাদসাহ ভবন দেখা যাইতেছে, আর অল্প দূর মাত্র যাইলেই কমল তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবে এমন সময়ে দূরে একটী ভীষণ জনতা পরিলক্ষিত হইল। তাহা কি জানিবার জন্য কমল একটী হর্ম্ম্যপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। এই সময়ে কমলের একটী সমবয়স্কা রমণী আসিয়া মেহদী-রঞ্জিত হস্তদ্বারা তাহার চক্ষুদ্বয় আবরিত করিল, কমল চমকিয়া উঠিল, যুবতী হাসিতে হাসিতে বলিল "ভয় পেয়েছ?"

কমল। তুমি? বেশ ভাই এস, আমরা দু'জন হলাম।

যুবতীটী কমলের পার্শ্বে দাঁড়াইল। এটীও রঙ্গমহলের একটী বাঁদী।

দেখিতে দেখিতে অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা জয়োল্লাসে রণবাদ্য বাজাইয়া তাহাদের সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে দেখা গেল, মহা-সমারোহে অশ্বপৃষ্ঠে একটী সুন্দর যুবক আসিতেছেন।

কমল তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই চিনিল প্রতাপসিংহ, হৃদয় চমকিয়া উঠিল, চক্ষে যেন পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল। কমল মনোভাব অতি কষ্টে গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ইনি কে ভাই?"

বাঁদী কহিল "ও মা সে কি, তুমি কি আগ্রার কোন খবরই রাখ না। ইনি বাদসাহ আকবর সাহের পৌত্র সাহজাদা খসরু, আজ এক বৎসরের

উপর হ'ল কাশ্মীরে লড়াই কর্‌তে গেছলেন, লড়াই জিতে দিল্লীতে এসে-ছিলেন, সেখান থেকে এখানে আস্‌ছেন।"

কমল আর কিছু শুনিতে পাইলেন না, চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিলেন, মাথা ঘুরিয়া গেল তিনি সংজ্ঞাহীনা তাহার বাঁদীর দিকে ঢলিয়া পড়িলেন। বাঁদী "ওমা, একি একি" বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

বাঁদী "কমল, কমল" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে কমলের সংজ্ঞা হইল। কমলকুমারী উঠিয়াই সবিস্ময়ে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিলেন। তখন জনতা অল্পদূরে চলিয়া গিয়াছে।

বাঁদী কহিল "লোকের ভিড় দেখে ভয় হয়েছে?"

কমল একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "হুঁ।"

বাঁদী। এখন কোথায় যাবে?

কমল। রঙ্গমহলে যাচ্ছিলাম, তা আর যাব না।

বাঁদী। তবে কোথায় যাবে?

কমল। মা'র কাছে।

বাঁদী। আমি সঙ্গে যাব কি?

কমল। না।

কমল এই কথা বলিয়া তথা হইতে ধীরপাদবিক্ষেপে নানাপ্রকার চিন্তার তাড়নে অস্থির হইয়া আপন বাসার দিকে গমন করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মৃত্যুশয্যা।

দিবা অবসান প্রায়, জগৎ-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। অনন্ত গগনপ্রদেশে স্তিমিত প্রায় সূর্য্যের তরল কিরণ বিভাষিত, অদূরে তরল কিরণময়ী তরঙ্গিণী তর্‌ তর্‌ শব্দে প্রধাবিতা। যমুনে তুমি কোথায় ছুটিতেছ, আগ্রার এ বিশ্ব-বিমোহন শোভা কি তোমায় ভাল লাগিতেছে না?

এই সময়ে একটী সামান্য গৃহে একটী অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা রুগ্নশয্যায় শায়িতা। তাঁহার মুখভাব দেখিলে প্রতীতি জন্মে যে, তাঁহার জীবন রবিও অস্তমিত-প্রায়,—আর বিলম্ব নাই। বৃদ্ধার শিয়রদেশে একটী কুসুমময়ী যুবতী সজলনেত্রে বসিয়া আছে, তাঁহার সেই সজলনয়ন বৃদ্ধার বদন প্রতি ন্যস্ত।

বৃদ্ধা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "মা কমল, একবার পাশের জানালাটী খুলিয়া দাও না, আমি জন্মের মত সব দেখিয়া নি।"

কমল সশব্যস্তে গবাক্ষদ্বার উন্মোচন করিল। তখন বৃদ্ধার নয়নে সান্ধ্য-গগনের অতুল ছটা—অতুল শোভায় পরিদৃশ্যমান হইল। বৃদ্ধা আকুলনয়নে আকাশপানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন আকাশ কত উচ্চ, ঐখানে—ঐ অনন্ত উচ্চে কি মনুষ্য মরিয়া যায়? তথায় একটী তারা দেখা যাইতেছিল, বৃদ্ধা ভাবিলেন, ঐ তারা সন্নিধানে কি আমি যাইব? প্রাণ কেমন উদাস হইল, চক্ষু নামিয়া পড়িল। তিনি কমলের দিকে ফিরিলেন। কমল গবাক্ষদ্বার নিঃশব্দে বন্ধ করিলেন।

বৃদ্ধা কহিলেন "কমল।"

কমল। কেন মা।

বৃদ্ধা। আমার আর বোধ হয় অধিকক্ষণ সময় নাই—আমার দেহ যেন অবশ হইয়া আসিতেছে, মন বিকৃতি বা উদাসভাব প্রাপ্ত হইতেছে।"

কমল কাঁদিতে লাগিল।

বৃদ্ধা। কমল কাঁদিও না, এ পৃথিবীতে কেহ চিরদিনের জন্য আসে না। কত মহারথী নিপাত হইতেছে, আমি ত কোন্ ছার—তৃণানুতৃণ। তবে তোমার সুখ দেখিয়া মরিতে পারিলে মরণে সুখ পাইতাম, কিন্তু বিধাতা আমার প্রতি বড় বাম।

বৃদ্ধার চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। সেই কোটরাশ্রয়ী চক্ষের জল চক্ষেই রহিল। কমল আপন বসনাঞ্চল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিল।

তখন বৃদ্ধা আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধা হইলেন; বোধ হইল যেন কথা কহিতে তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছে। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "মনে করিয়াছিলাম প্রতাপ—"

কিন্তু আর কথা ফুটিল না। কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। বৃদ্ধা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইলেন। প্রতাপ সম্বন্ধে সকল কথা কমল বৃদ্ধা মাতাকে বলিয়াছে। একবার মনে করিয়াছিল যে, এই মরণ সময়ে ও কথা আর বলিয়া কাজ নাই—আবার ভাবিল, আর ত মা'র দেখা পাইব না, আর ত তাঁহার মধুর উপদেশ শুনিতে পাইব না, তবে না বলি কেন? তাঁহার মধুর উপদেশ লই না কেন? তাঁহার উৎকণ্ঠা দূর করি না কেন? এই ভাবিয়াই সে সকল মর্ম্ম-বিদারী কথা মাতার নিকট বিবৃত করিয়াছিল।

বৃদ্ধা চাহিয়া দেখিলেন যে কমল কাঁদিতেছে, সুতরাং সে কথা চাপা দিয়া বলিলেন "আমি মরি, কিন্তু একটী কথা বলি শুন।"

কমল আগ্রহ সহকারে বলিল "বল মা, বল।"

বৃদ্ধা। আমার কথাটী রাখিও।

কমল। যতদিন প্রাণ থাকিবে ততদিন রাখিব।

বৃদ্ধা। আমি জানি যে তুমি আমায় ভালবাস, অনেক পুণ্য ব্যতীত তোমার মত কন্যা হয় না। আমার জন্য তুমি কত ক্লেশ না সহ্য করিয়াছ। কেবল আমার পেটের দায় তুমি হিন্দু হইয়া যবনগৃহে দাসীবৃত্তি করিতেছ।

কমল আগ্রহ সহকারে কহিল "মা, ও কথা রাখ, কি বলিবে বল?"

বৃদ্ধা। আপন ধর্ম্মচ্যুত হইও না, প্রাণ থাকিতে নয়। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্ম নাই। আমি ত এখনি মরিব, মনে করিও না যে আর আমি তোমায় দেখিতে পাইব না, আমি যেখানেই থাকি তোমার কার্য্য-কলাপ দেখিব। দেখিও মা, অভাগিনীর শেষ অনুরোধ রাখিও। এক গণ্ডুষ জল যাহাতে পাই তাহা করিও। যে মায়ের অন্ন যোগাইতে তাহার জীবিতাবস্থায় এত করিয়াছ মরিলে যেন তাহা একেবারে ভুলিও না। দেখিও মা—মায়ের অন্ন মারিও না।

বৃদ্ধা যেন আরও কত কি বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; দেখিতে দেখিতে কমলের সংসারের একমাত্র সহায় সম্বল বৃদ্ধ মাতা অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিতা হইলেন। কমলের আর দুঃখের সীমা রহিল না। এরূপ দারুণ শোক, কমল ইহ জীবনে আর কখন পায় নাই—সম্ভবতঃ পাইবেও না। হয়ত এ শোক, এ যাতনা, কমল ইহজীবনে কখন বিস্মৃত হইতেও পারিবে না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ সাক্ষাৎ।

কমল চন্দনকাষ্ঠের চিতা প্রস্তুত করিয়া যমুনাতীরে মাতার সৎকার করিয়া যথাসময়ে তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন করিল। শ্রাদ্ধান্তে কমল মতিমহলে বেগমের নিকট হইতে বিদায় লইতে বাদসাহ ভবনে চলিল।

কমল যখন তথায় পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। বেগম মনোমত বেশভূষায় বিভূষিতা হইয়া আপন দাসীমণ্ডলী পরিবৃতা হইয়া বসিয়া আছেন।

কমলের মাতৃবিয়োগ সংবাদ বেগম পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, সুতরাং কমলের দুঃখে আপন সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন।

ক্রমে ক্রমে একটী একটী করিয়া সকল দাসীগুলিই উঠিয়া গেল, তখন সেই বিশাল বিস্তৃত কক্ষমধ্যে বেগম ও কমল ব্যতীত অপর কেহই নাই। এই সুযোগে কমল করপুটে কহিল, "আপনার আমার প্রতি অসীম দয়া ও অনুগ্রহের জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ।"

বেগম। সে কথা কেন উঠিতেছে কমল ?

কমল। আবশ্যক আছে।

বেগম। কি আবশ্যক ?

কমল। আমায় বিদায় দিতে হইবে।

বেগম। কতদিনের জন্য ?

কমল। চিরদিনের তরে।

বেগম। কেন কমল ?

কমল। আর আমি কাহার জন্য এ সংসারে থাকিব ?

বেগম। কি করিবে ?

কমল। সন্ন্যাসিনী হ'ব।

বেগম। এ কচি বয়সে কি কেহ সন্ন্যাসিনী হয় ?

কমল। আমার মত যাহার দশা, সেই হয়।

বেগম। না কমল, আমি তোমায় ছাড়িব না, তোমায় ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না।

কমল। আমাকে ছাড়িতেই হইবে, আমার প্রতি এ অনুগ্রহ দেখাইতেই হইবে।

বেগম। কি উদ্দেশ্য বল, তা না হইলে ছাড়িব না।

কমল। মনের শান্তি সম্পাদন।

বেগম। যাহার হৃদয়রাজ্যে অপরের ছবি জাগে তাহার কোথাও সুখ নাই।

কমল। সে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে।

বেগম বিস্ময়ান্বিতনেত্রে কমলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "তোমার কথা বুঝিলাম না।"

কমল। যাঁহার আশায় এতদিন বুক বাঁধিয়াছিলাম তাঁহার আশা ত্যাগ করিয়াছি।

বেগম। ইচ্ছায় ?

কমল। হ্যাঁ।

বেগম। না কমল একথা বিশ্বাস হয় না, তোমার প্রাণটা যে কোমলতা ভরা।

কমলের সেই বিষণ্ণবদনপ্রান্তে ক্ষীণহাসি দেখা দিল। বলিলেন, "আমি দুরাশয় হৃদয় বাঁধিয়াছিলাম।"

বেগম। কমল, আমায় সকল কথা ভাঙ্গিয়া বল, কোন ফল হয়, জানিও তাহা পূর্ণমাত্রায় হইবে।

কমল। হইবার যে উপায় নাই মা।

বেগম। কেন কমল ?

কমল। আমি সাহাজাদা খসরুকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছি।

সহসা যেন সেই কক্ষমধ্যে গভীর নির্ঘোষে বজ্রপাত হইল, বেগমের হৃদয় যেন কাঁপিয়া উঠিল, তিনি ক্ষণেক গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া বলিলেন " এমন কাজ কেন করিলে ? "

কমল। তিনি প্রশ্রয় দিলেন, প্রবঞ্চনা করিলেন, আমি অবোধ বালিকা কি বুঝিব মা।

বেগম। খসরু আমার সপত্নী পুত্র হইলেও সাহাজাদা সেলিমের ঔরষ জাত। খসরুর প্রবঞ্চনা ! কাহাকে এ কথা বলিতেছ ?

কমল। আপনি জেদ্ না করিলে ত বলিতাম না। যদি অন্যায় করিয়া থাকি মার্জ্জনা করুন।

বেগম। এখন তিনি কি বলেন ?

কমল। আমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।

বেগম। তবে তাঁহার দোষ দাও কেন ?

কমল। আবার বলি মার্জ্জনা করিবেন, তিনি আমার হইতে চাহিলেও আমিত তাঁহার হইতে পারিব না।

বেগমের মুখ ভাব বিকৃত হইল, বলিলেন "সাহাজাদা খসরুর প্রণয় প্রত্যাখ্যান করিবে ?"

কমল। আমি হিন্দু তিনি যবন, তুচ্ছ প্রণয়ের জন্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব ?

বেগম। প্রণয় তুচ্ছ !

কমল। তা বই কি, কে প্রবৃত্তি ইচ্ছায় সফল করা যায়, তাহার আবার গৌরব কি? তাই মনকে অন্য দিকে ধাবিত করিবার চেষ্টা করিতেছি।

বেগম। পারিবে?

কমল। মনের ত বিশ্বাস তাই। সাহাজাদার জন্য হৃদয়ে যে একাগ্রতা, যে ঐকান্তিকতা, যে ভালবাসা স্থান পাইয়াছিল, ঈশ্বরে তাহার অর্দ্ধেকও যদি স্থাপনা করিতে পারি তবেই আমার মুক্তি হইবে। যে রাজ্যে জাতি ভেদ নাই—সেই রাজ্যে হয়ত আবার তাঁহাকে পাইব। এই পার্থিব হৃদয়ের যাতনার শেষ সেই রাজ্যে হইবে।

বেগম আর কোন কথা কহিলেন না। তিনি কমলকে বড় ভালবাসিতেন, সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতেন, তাঁহার দৃঢ় প্রতীজ্ঞা দেখিয়া অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। কমলকে একটী বহু মূল্য মুক্তার মালা উপহার দিলেন, কিন্তু তিনি তাহা না লইযা কহিলেন "ইহা লইয়া কি করিব, আমার আর মুক্তার মালায় প্রয়োজন কি?" তখন বেগম আপন অঙ্গুলি হইতে একটী অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া কমলের হস্তে দিয়া বলিলেন "এইটী রাখ, ইহার মূল্য অতি সামান্য,—মূল্যবান্ বস্তু বলিয়া দিলাম না, আবশ্যকীয় বস্তু বলিয়া দিলাম। যদি কখন আমার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা হয়,—যদি কখন যবনাধিকারের মধ্যে কোন বিপদে পড় তাহা হইলে এই অঙ্গুরী প্রদর্শন করিও, তুমি সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিবে?"

কমল অবনত মস্তকে তাহা চুম্বন করিয়া গ্রহণ করিল, কমল মনে মনে জানিত, তাহার ইহাতে কোন আবশ্যক নাই, তথাপি বেগমকে সন্তুষ্ট করিতে গ্রহণ করিল।

এইরূপ কথা বার্ত্তায় রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইল, তখন কমল কহিল "তবে আসি।"

বেগম। এখনি!

কমল। আর নয়, কল্য প্রত্যুষে আমার আগ্রা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

বেগম মতি মহলের দ্বারদেশে কমলকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন। কিন্তু বিদায় দিতে বড়ই মনোকষ্ট পাইলেন, তিনি মর্ম্মাহতা হইলেন।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

প্রাণের কার্য্য।

মনুষ্যের সকল সুখ ঘটনা, সুখ দুঃখের অসীম ক্ষমতার প্রভাব সকলকেই অবনত শিরে সহ্য করিতে হয়। সুতরাং আকবর সাহও যখন মনুষ্য তখন তিনিই বা অব্যাহতি পাইবেন কেন?

যাঁহার বিপুল ক্ষমতা, যাঁহার অর্থ প্রবাদ সম, যাঁহার সুখ্যাতিতে দিগ্ দিগন্ত পূর্ণ, সেই বাদসাহ কুল তিলক আকবর সাহ আজি মর্ম্মান্তিক দুঃখে ম্রিয়মান। অপরের কথা কি বলিব আপন পুত্র সেলিমই তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। স্থানে স্থানে বিপ্লব অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া পিতৃ রাজত্ব কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও পিতার মনে রাগের উদ্রেক হয় নাই, পুত্রকে ডাকাইয়া তাঁহাকে স্নেহভবে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার গলদেশে বাহুদ্বয় আবদ্ধ করিয়া রোদন করিয়াছিলেন। পুত্রের নীচ অন্তঃকরণের কথা বিস্মৃত হইয়া ভাবিয়াছিলেন তিনি উন্মাদগ্রস্থ, নতুবা কি এমন হয়? উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসাও করান হইয়াছিল। কিন্তু আর সহ্য হয় না।

সেলিমের বারম্বার অত্যাচার, পিতার উপর বীতশ্রদ্ধা প্রভৃতি দেখিয়া বাদসাহের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। এই সময়ে ঈশ্বর তাঁহাকে আবার পুত্র শোকে আতুর করিলেন, উভয়বিধ যাতনায় প্রজাপ্রিয় বৃদ্ধ বাদসাহের জীবনের আশা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে কমিয়া আসিতে লাগিল। প্রজাকুল হা হুতাশ করিতে লাগিল; সকলেই বিষাদিত, সকলেই ম্রিয়মান সকলেই কে দিল্লীর সিংহাসনের অধিকারী হইবে ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। পথে ঘাটে গৃহ প্রাঙ্গনে মসজিদে সকলের মুখেই সেই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল।

কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেরই ইচ্ছা সেলিম বাদসাহ না হন। যে পুত্র বাদসাহ আকবর সাহের ন্যায় পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন, তাঁহার অসাধ্য ক্রিয়া আছে কি? কে আর তাঁহাকে ঐহিকের দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা স্বরূপ দেখিতে চায়? কিন্তু বৃদ্ধ বাদসাহ মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়া সেলিমকে ডাকাইলেন। পুত্রের সকল দোষ ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে দিল্লীর ভাবী সম্রাট বলিয়া স্থির করিলেন। প্রজা পালনের রীতি নীতি ভাল করিয়া বলিয়া দিলেন, আর বলিয়া দিলেন "তোমার উপর প্রজার শ্রদ্ধা ভক্তি নাই— যাহাতে সেই শ্রদ্ধা ভক্তি পাইবার উপযুক্ত হও তাহার চেষ্টা করিবে। মান

সিংহ ও খসরুর শ্বশুর প্রতাপশালী ব্যক্তি, তাঁহারা যাহাতে খসরুকে রাজ্য দিবার চেষ্টা পাইয়া তোমার রাজত্বকাল অশান্তিময় না করেন কৌশলে তাহার চেষ্টা করিবে। খসরুকে হৃদয়বান যুবক বলিয়া জানি, তাহার প্রতি অত্যাচার করিও না। মেহেরেন নেসাতে বোধ হয় এত দিনে বিস্মৃত হইয়াছ, যদি না হইয়া থাক হইবে।"

রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা প্রজার অকর্ত্তব্য, তাই বাদসাহের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সকলেই আবার সেলিমের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। বাদসাহের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল। সেলিমের সকল প্রকার অত্যাচার অপরাধের কথা ভুলিয়া তাঁহাকে পূজা করিবার অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাই বলি, এমন রাজভক্ত জাতি আর আছে কি ?

ইহার অতি অল্প দিন মধ্যেই প্রাতঃ স্মরণীয় বাদসাহ আকবর সাহ মহা নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। সেলিম তৎক্ষণাৎ দিল্লীর মসনদে উপবিষ্ট হইয়া দেশের কর্ত্তব্যতা স্থির করিলেন। তন্মধ্যে দুইটী গোপনীয় কার্য্য সম্পাদিত হইল। একটী সুন্দরী মেহরুননেহার স্বামীকে হত্যা করিয়া তাঁহাকে নুরজাহান বেগম নাম দিয়া মহা সমারোহে দিল্লীতে আনয়ন করা, দ্বিতীয় খসরুকে বন্দী করা এবং তাহার শ্বশুর ও মানসিংহের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা।

খসরু যে দিল্লীর সিংহাসনে পাইবার জন্য চেষ্টিত এ সংবাদ কমল জানিতেন, কিন্তু আজি তাঁহাকে বন্দী করা হইবে, এই গোপন সংবাদ মহারাজ মানসিংহ তাঁহাকে দিলেন। উপযুক্ত লোকের হস্তে উপযুক্ত সংবাদই প্রদত্ত হইল। কমল মনে মনে ভাবিলেন "হায় খসরু তোমার হৃদয়ে এ এ কুপ্রবৃত্তি কেন ? পিতা থাকিতে সিংহাসনাধিকার বাসনা কেন ?"

কমল মহারাজ মানসিংহের নিকট প্রতিশ্রুত যে খসরুক সংবাদ দিবেন, তাঁহাকে গৃহ হইতে গোপনে বাহির করিয়া আনিবেন কিন্তু উপায় ? প্রতি দ্বারে দ্বিগুণ প্রহরী নিযুক্ত, কাহাকেও রাজ প্রাসাদে প্রবেশ বা তথা হইতে বহির্গত হইতে দিতেছে না। তখন সেই বেগম প্রদত্ত অঙ্গুরীয়কের কথা মনে পড়িল। তিনি দ্বাররক্ষীদিগকে তাহা প্রদর্শন করিবা মাত্র ভিতরে প্রবেশ করিতে দিল। কমল খসরুর শয়ন কক্ষ জানিতেন, আরও জানিতেন তাঁহার মহিষী আজ কয়দিবস হইল পিত্রালয় গিয়াছেন সুতরাং দ্রুতপদে কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে দেখিলেন সাহাজাদা সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। বুঝিলেন বাদসাহের মৃত্যু সংবাদ

এখনও অন্তঃপুরে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু খসরুর সহিত কথা কহিতে যে আর প্রবৃত্তি নাই,—এতদিন আত্মগোপন করিয়া কি আজ ধরা দিব? কিন্তু উপায় ত নাই। এ সময় ত অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনার সময় নয়। কমল কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। খসরুর কানে কানে বাদসাহর মৃত্যু ও তাঁহার বন্দী হইবার কথা বলিলেন। খসরু সুপ্তোত্থিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া উঠিলেন, সংবাদ দাত্রী বিদ্যুৎ বেগে কোথায় চলিয়া গেলেন।

খসরু একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দ্রুতবেগে ঘরের বাহির হইলেন। মনে মনে বলিলেন "ইহা কি সম্ভব?" বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইবে? আজকাল আমার অদৃষ্টে তাহাই হইতেছে বটে, নতুবা কেন কণক কমল হারাইলাম। যাহা সংসারে নাই—স্বর্গে নাই, আমি এমন নিধি কেন হারাইলাম?

কমলের কানে এ কথাগুলি গেল, কমলের চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইল।

খসরু আবার বলিলেন "আমি কি স্বপ্নে বিশ্বাস করিতেছি, ইহা কি সম্ভব যে বাদসাহ নাই? কি—আমি বন্দী হইব?

সাহাজাদা খসরু আবার দ্রুতপদে ধাবমান হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিষ্ফল আশা।

সাহাজাদা খসরু জ্ঞান শূন্য। কোথায় বাদসাহ হইবেন, না বন্দী হইতে হইবে। কি ভয়ঙ্কর ভাগ্য বিপর্য্যয়! মানসিংহ বলিয়াছেন কমল তাহাকে বিবাহ করিয়া ধর্ম্মে পতিতা হইতে চাহেন না, তবে যদি তিনি কখন দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হন তাহা হইলে বিবাহ করিবে নতুবা নয়। ইহা কি সহ্য হইবার কথা, বাদসাহ যে না হইলেই নয়। বাদসাহ না হইলে যে কমলকে পাইব না। আজি কত কথা মনে হইতেছে। কেন কমলকে পূর্ব্বে বিবাহ করি নাই, কেন কাশ্মীর বিজয়ে গমন করিয়াছিলাম। কিন্তু সে সকল চিন্তার ইহাও সময় নয়।

সাহাজাদা একটী অন্ধকার স্থান দিয়া দ্রুতবেগে যাইতেছেন এমন সময়ে কমল তাঁহার হাত ধরিল।

খসরু সবেগে হস্তমোচন করিয়া কহিল "পথ ছাড়।"

কমল। সাহাজাদা দাসীর অনুরোধ রাখুন, এখন বাহিরে যাইবেন না। বাদসাহ আপনাকে কারারুদ্ধ করিবেন।

খসরু উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন "সে দেখা যাইবে, আমায় যাইতে দাও।"

কমল সেই অন্ধকারে খসরুর পদদ্বয় জড়াইয়া বলিলেন "আমি যাইতে দিব না, আমি যাইতে দিতে পারিব না।"

খসরু তখন প্রায় জ্ঞান শূন্য, সজোরে পদোন্মুক্ত করিলেন, কমল সে বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, পতিত হইলেন, মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিল। কিন্তু কমল তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না, পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া আবার খসরুকে ধরিল।

খসরু। আবার বিরক্ত করিতেছ?

কমল। বিরক্ত করিয়া থাকি ক্ষমা করুন, কিন্তু আমি আপনাকে ছাড়িব না, আপনি এখন বাহিরে যাইবেন না

খসরু আবার সজোরে-কমলকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন "তুমি কে?"

কমল। আমি বাঁদী।

খসরু। আমার রক্ষায় তোমার স্বার্থ কি?

কমল। আপনার অন্নে আমি প্রতিপালিতা।

খসরু। তোমার নিশ্চয় কোন দুরভিসন্ধি আছে।

কমল। সে কথা ঈশ্বর জানেন।

খসরু। তবে কেন আমায় যাইতে নিষেধ করিতেছ। এখানে কি আমি বন্দী হইতে পারি না।

কমল। উত্তর দিকের দ্বারদেশে মহারাজ মানসিংহের গুপ্তচর আছে, সেই খানে যান, আপনার বিপদ হইবে না।

খসরু ঘৃণা সহকারে কহিলেন "যে দিল্লীর সিংহাসন পাইবার উপযুক্ত তাহাকে বাঁদীর পরামর্শ অনুসারে চলিতে হয় না।"

এই বলিয়া খসরু সবেগে প্রস্থান করিলেন, হায় খসরু করিলে কি, এহেন রত্ন আজি হেলায় হারাইলে?

কমল ক্ষণেক পাগলিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়া খসরুর অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। সেই নৈশান্ধকারে যে খসরু কোথায় গেলেন, তাহার অনুসন্ধান হইল না।

এদিকে তিনি যেমন গৃহের বাহিরে আসিয়াছেন, অমনি দুইজন সৈনিক আসিয়া তাঁহাকে ধরিল, বলিল "সাহাজাদা, বাদসাহের হুকুমে আপনাকে ধৃত করিলাম।"

খসরু আরক্তিম চক্ষে কহিলেন, "কি, আমাকে ধৃত করিলে?"

সৈনিকদ্বয় অবনতশিরে বলিল "হাঁ।"

খসরু। কি অপরাধে বন্দী হইলাম?

সৈনিকদ্বয় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "তাহা জানি না।"

এতক্ষণে খসরুর জ্ঞান হইল, তিনি বুঝিলেন যে রমণীর বাক্য অবহেলা করা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে, বলিলেন "এপথে কেহ গিয়াছে জান?"

একজন উত্তর করিল "এপথে কাহাকেও যাইতে দিবার আদেশ ছিল না, কেবল বাদসাহ সেলিমের বাঁদী ইঙ্গিতসূচক অঙ্গুরী প্রদর্শন করায় যাইতে পাইয়াছে।"

খসরু। কোন্ বাঁদী?

উত্তর। তাহার কি একটা হিন্দু নাম আছে?

খসরু কয়েকবার মনে মনে হিন্দু নামের কথা ভাবিলেন, কিন্তু কাহারও নাম তাঁহার স্মরণ হইল না, তখন বলিলেন "কোথায় লইয়া যাইবে চল।"

সৈনিকেরা তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

কতকদূর যাইয়া খসরু জিজ্ঞাসিলেন "মহারাজ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি কি?"

জনৈক সৈনিক কহিল "সাহাজাদা ক্ষমা করিবেন, আমাদের প্রতি সে আদেশ নাই।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দী।

আজি বাদসাহ আকবর সাহের পৌত্র প্রতাপান্বিত মানসিংহের ভাগিনেয় সাহাজাদা খসরু বন্দী। মানসিংহের বহু দিবসাবধি ইচ্ছা ছিল যে আকবর সাহের মৃত্যুর পর তদীয় পৌত্রকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিবেন। আপনার ভাগিনেয় দিল্লীশ্বর হইবেন ইহা সুখের বিষয় বটে, কিন্তু পুত্রের পক্ষে পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করা কত দূর সঙ্গত তাহা সহজেই অনুমেয়। মান-

সিংহের উত্তেজনায় খসরুর যে সিংহাসনাধিকারের সাধ ও আশা বলবতী হইয়াছিল তাহা উল্লেখ বাহুল্য।

রাত্রি প্রায় একাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। এখনও খসরু চিন্তামগ্ন, কোথায় বাদসাহ হইবেন, না বাদী হইলেন! এ অবস্থায় প্রগাঢ় চিন্তা কি অসম্ভব? কিন্তু পাঠক তুমি কি ভবিতেছ আর সাহাজাদা খসরু কি ভাবিতেছেন। খসরু একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "এই পথে হিন্দুবাঁদী গিয়াছে—তবে কি কমল বাদী হইয়াছে? নিশ্চয়ই সে কমল, আমারই কমল, কমল না হইলে আর কে আমার জন্য অত করিবে? আর সে যে সেই স্বর—সেই স্বর্গীয় মধুর স্বর।"

"কমল, প্রাণাধিক কমল, আমি হাতে নিধি পাইয়া হারাইলাম। প্রাণেশ্বরী, আর কি তোমায় দেখিতে পাইব? হয়ত এই কারাগারই আমার সমাধি স্থান হইবে, তাহা হইলে তোমার সে মুখ শশী ত আর দেখিতে পাইব না, তোমার সেই অমৃত লহরী বাক্য সুধা ত আর আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবে না।"

খসরু বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। বিধাতঃ তোমার সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে প্রণয়ের তুল্য আর মধুর কিছুই নাই, কিন্তু তাহাতে নিষ্ঠুরতা কেন? প্রেমিকের পরিতৃপ্তি নাই কেন?

এমন সময়ে সহসা সেই অন্ধকার প্রকোষ্ঠের দ্বারোদ্ঘাটন হইল, একটী বৃদ্ধ দীপ হস্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। খসরু চমকিয়া বলিলেন, "আমীর খাঁ!"

আমীর খাঁ সসম্ভ্রমে কহিল "জনাব।"

খসরু। তুমি এখানে?

আমীর। আপনাকে মুক্ত করিতে।

খসরু। এত দিন কোথায় ছিলে?

আমীর। কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলাম।

খসরু। আমি বন্দী হইয়াছি তোমায় এ কথা কে বলিল?

আমীর। মহারাজ মানসিংহ, তিনিই আমাকে এখানে কৌশলক্রমে পাঠাইয়াছেন, আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিবার সময় নাই—আপনি শীঘ্র প্রস্থান করুন। প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে একটী লোককে দেখিতে পাইবেন, সে আপনাকে অশ্ব দিবে, লোক দিবে একেবারে জয়পুর পলায়ন করুন। যুদ্ধের

আয়োজন হইতেছে, আপনাকে বাদসাহ করিতে মহারাজ মোনসিংহ মহাব্যস্ত, আপনি তৎপর পলায়ন করুন, নতুবা সমস্তই বৃথা হইবে এবং আপনারও মহা বিপদ ঘটিবে।

খসরু। একটী কথা।

আমীর। আজ্ঞা করুন।

খসরু। কমল কোথায়?

আমীর। সে কথা পরে বলিব।

খসরু আপন গলদেশ হইতে বহু মূল্যের হীরক হার খুলিয়া আমীর খাঁকে প্রদান করিয়া বলিলেন "এখনি বল।"

আমীর খাঁ কহিলেন "সাহাজাদা আমি এ সামান্য কার্য্যের জন্য হীরক হার পাইবার অযোগ্য।"

খসরু। আমীর! আমি বন্দী বলিয়া কি একেবারে ফকির হইয়াছি যে আমার প্রদত্ত পুরস্কার গ্রহণেও কুণ্ঠিত হইতেছ?

আমীর। ঈশ্বর সাক্ষী যে আমি সে উদ্দেশ্যে বলি নাই,—হীরক হার আমি মস্তকে ধারণ করিলাম, অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

খসরু। আমীর ব'ল আমার কমল কোথায়, আমি কমলের জন্য অধীর হইয়াছি।

আমীর কহিলেন "আমি কমলকে নুৎফুল বেগমের বাঁদী করিয়াছিলাম। কিন্তু শুনিলাম তাঁহার মাতার মৃত্যু হওয়ায় বিদায় লইয়াছে।"

খসরু। কবে?

আমীর। অতি অল্প দিন হইল।

খসরু। কোথায় আছে?

আমীর। এখন কোথায় তাহা জানি না, আপনি যেখানে শরসন্ধান শিখিতেন তাহারই নিকটস্থ একটী সামান্য গৃহে বাসা ছিল।

খসরু একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আমীর কহিল "আর কেন বিলম্ব করেন।"

খসরু নিস্তব্ধ ভাবে প্রস্থান করিলেন।

হায় মানসিংহ! তুমি যাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসন দিবে বলিয়া এত করিতেছ, তিনি একবারও তাহা ভাবিতেছেন না, ভাবিতেছেন বাঁদীর কথা!

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মহারাজা মানসিংহ।

খসরু গোপনে মহারাজা মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। খসরু সকল কথার অগ্রেই জিজ্ঞাসা করিলেন "কমলের সন্ধান পাইয়াছেন কি?"

মান। এই কি তার সময়?

খসরু। এই তার সময়, আমার সকলই ফুরাইয়াছে, একবার তাহাকে দেখিব না।

মান। তোমার কিছুই ফুরায় নাই।

খসরু। আমার আশা অতি কম।

মান। সেটা তোমার কাপুরুষত্ব। আকবর সাহ যখন বাদসাহ হইয়াছিলেন, হুমায়ুন যখন তত বিপদ অতিক্রম করিয়াছিলেন, তখন তোমার আশা নাই কেন?

খসরু। তাঁহারা পুণ্যাত্মা, আমি পাপী,—তাই আমার আশা নাই।

মান। এখন কমলকে পাইলেই কি সকল পাপ মিটিবে?

খসরু। নিশ্চয়ই।

মান। তবে দেখা পাইয়াও তাহাকে চিনিতে পার নাই কেন? কমল যে তোমায় বাদসাহের মৃত্যু সংবাদ দেন, তোমার পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া তোমায় গৃহের বাহির হইতে নিষেধ করেন, তাহা কি জান না?

খসরু স্তম্ভিত হইলেন, তাঁহার প্রশান্ত নয়ন যুগল বহিয়া বারিধারা বহিল, বলিলেন "আমি পিশাচ, আমি নরাধম।"

মান। এখন সে অনুতাপ বৃথা।

খসরু। কি করিতে বলেন?

মান। ধৈর্য্য ধারণ।

খসরু। তাহাতে কি কমলকে পাইব?

মান। নিশ্চয়, তুমি বাদসাহ না হইলে কমলের আশা বৃথা।

খসরু সবিস্ময়ে কহিলেন "কেন?"

মানসিংহ গম্ভীরভাবে বলিলেন "তাঁহার অভিপ্রায় সেইরূপ। কমলের জাতিচ্যুতির ভয় বেশী।"

খসরু। বাদসাহকে বিবাহ করিলে কি জাতি যায় না?

মান। আমি তাহার কি উত্তর দিব কি করিয়া।

খসরু। চেষ্টাব ক্রটী করিব না, কিন্তু বলিয়া দিন কমল কোথায়?

মান। পাঞ্জাবে।

খসরু। পাঞ্জাবে কোথায় তাঁহাকে খুঁজিব?

মান। তুমি পাঞ্জাবে যাও, অতি সহজেই তাঁহার দেখা পাইবে। আমিও গোপনে সৈন্য সাহায্য করিব, তোমার শ্বশুরও করিবেন। সেখানে রাজ্য বিস্তার কর, পরে এদেশে দেখা যাইবে। তোমার রাজ্যাধিকার হইবামাত্র কমল তোমায় দেখা দিবেন।

খসরু। এখন দেখা দিবেনা কেন?

মান। এই কি দেখা দিবাব সময়, কমল তাই দেখা দেয় নাই।

খসরু। তবে কি তাহাকে পাইবার আশা আছে?

মান। আমার ত তাই মনে হয়।

খসরু। তবে আমি পঞ্জাব চলিলাম, যদি কখনও কমলকে পাই তবে আবার দেখা হইবে, নতুবা এইপর্য্যন্ত।

মান। শ্বশুবালয় যাইবে না?

খসরু। গোপনে—চোরেব মত? যাহাকে সদত প্রাণভয়ে থাকিতে হয়, যাহার জীবন পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর কবে, তাহার আবাব স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করা কেন?—আর স্ত্রী-পুত্রইবা কি?—আমি পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর, আর পিতা আমাকে বন্দী করিয়া হয়ত আমাব শিরশ্ছেদন করিতে ইচ্ছুক। তবে আর কে কার, কাহার জন্য প্রাণ কাঁদিবে?

মানসিংহ আর তাহার কোন উত্তর না দিয়া সাহাজাদা খসরুর পাঞ্জাব গমনের আয়োজন করিয়া দিলেন।

অল্পদিন মধ্যে পঞ্জাবে ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। খসরু লাহোর জয় করিয়া আর আর সমস্ত উপনগর জয় করিলেন। বাদসাহ সেলিম পুত্রের এই অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। পিতাপুত্রে মহা সংগ্রাম চলিতে লাগিল। আজি পিতা পরাস্ত কালি পুত্র পরাস্ত, কিন্তু বিজয়-লক্ষ্মী ক্রমে খসরুর প্রতি সমধিক অনুগ্রহ

প্রকাশ করিতে লাগিলেন, বাদসাহ সেলিম ভীত হইয়া উঠিলেন। বুঝিবা পরাজিতই হইতে হইল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

সকলই ফুরাইল।

এই মহা সংগ্রামের সময় একদিন অতি প্রত্যুষে সাহাজাদা খসরু রণ-ক্ষেত্রাভিমুখে অশ্বারোহণে গোপনে সৈন্য পরিচালনের স্থান নির্ণয় করিতে যাইতেছেন, এমন সময় একটী বৃক্ষমূলে দেখিলেন, যে একটী রমণী বসিয়া আছেন। সাহাজাদা ঘোটকের লাগাম টানিলেন, যেন সহসা কাহাকে মনে পড়িল, কিন্তু তাই কি সম্ভব? এমন দিন কি হইবে? তখন সাহাজাদা খসরু ধীরে ধীরে রমণীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। দেখিলেন কমলই বটে!

কমল সহসা সেই নির্জ্জন স্থানে খসরুকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন বটে কিন্তু সাহাজাদা ততোধিক বিস্ময়ান্বিত হইলেন। কমলের আর পূর্ব্ব শ্রী নাই—পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নাই—অঙ্গে গেরুয়া বসন, হস্তে কমণ্ডলু। খসরু মনে করিলেন "হায় কমল, তোমার এ দুর্দ্দশার কারণ এই নরাধম।" কিন্তু মনোমধ্যে সে দারুণ দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া বলিলেন, "কমল একি বেশ?"

কমল। আমার উপযুক্ত বেশ।

খসরু। কেন কমল?

কমলের চক্ষু সজল হইল, তিনি স্থির দৃষ্টে সাহাজাদা খসরুর প্রতি তাকাইয়া কহিলেন, "প্রতাপ, সাহাজাদা! এ পৃথিবীতে আমার একমাত্র সম্বল ছিলেন মা, তিনিও এ অভাগিনীকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তবে আর কাহার আশায় সংসারে থাকিব? তাই আজি সন্ন্যাসিনী হইয়াছি। ধর্ম্মচিন্তায় এই অসার জীবনের শেষ কাটাইতে ইচ্ছা করিয়াছি, আপনি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, আমাদিগকে অনাহার হইতে বাঁচাইয়াছিলেন, আপনি সাহা-জাদা, বাদসাহ আমার কি সাধ্য যে সেই অসীম উপকারের প্রত্যুপকার করি। তবে—"

খসরু কমলের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "কমল, প্রাণাধিক কমল, তুমি

তাহার যে প্রত্যুপকার করিয়াছ তাহার সীমা নাই ; আমি তোমায় চিনিতে পারি নাই,—আমি ঘোর পাষণ্ড—"

কমল। আমিত কিছুই করি নাই।

খসরু। কর'নাই? আমার ঘোর দুর্দ্দিনে রক্ষা করিতে প্রাণপণ করিয়াছিলে।

কমল। অধিনীর বাচালতা মার্জ্জনা করিবেন, ও সকল কিছুই নয়—তবে মনে করিয়াছিলাম যে আপনার পূজা করিয়া জীবন কাটাইব, কিন্তু আপনি কেন আমায় পূর্ব্বে আত্মপরিচয় দেন নাই, কেন সহায়হীনা অনাথিনীর কন্যাকে এত কষ্ট দিলেন?

কমল আর হৃদয়বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন, সেই মলিন নয়নযুগল হইতে দুইধারে মুক্তামালা ঝরিতে লাগিল।

সংজ্ঞাশূন্য প্রেমোন্মত্ত খসরু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু কমল দূরে সরিয়া গেলেন।

তখন খসরু হতাশ হইয়া কহিলেন "কমল, আমার আর অধিক কথা কহিবার সময় নাই, আমার পশ্চাতে শত্রু—আর যখন সকলই জানিয়াছ তখন আর অধিক কথার আবশ্যকই বা কি? মহারাজ মানসিংহ আমাকে বাদসাহ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারই অনুকম্পায় আমি কারামুক্ত হইয়াছি, আজি এই বিপুল বাহিনী লইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ। কিন্তু একটী কথা, কমল বল যে তুমি আমায় বিবাহ করিবে কি না? যদি বাদসাহ হই উত্তম, নতুবা আমার ধনের অপ্রতুল নাই। আগ্রার সুদূরস্থ কোন নির্জ্জন স্থানে বাদসাহের মত সুখে থাকিতে পারিব। তোমার উত্তরের উপর আমার অদৃষ্ট—আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য—নির্ভর করিতেছে। তোমাকে হারাইলে আমার ধন, সিংহাসন সকলই বৃথা হইবে। বল কমল, বল—"

তখন কমল গম্ভীর অথচ ধীরভাবে কহিলেন, "বালিকা বয়স হইতে অনেক কষ্ট পাইয়াছি, ক্লেশ আমার অঙ্গের অভরণ, প্রতাপ, ধন মানে সুখী হইব? তোমায় পাইব ইহা অপেক্ষা আমার অধিক প্রলোভন ইহজগতে আর নাই। কিন্তু প্রতাপ আমার অদৃষ্টে দুঃখ, তুমি কি করিবে ভাই। মা মৃত্যুকালে আমাকে বিধর্ম্মী হইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, তুমি কি আমার মাকে অনাহারে রাখিতে বল? তোমাকে বিবাহ করিলে মাকে আমার জলগণ্ডুষটুকু দিবার অধিকার পর্য্যন্ত যাইবে, প্রতাপ তুমি কি আমার মাকে অনাহারে রাখিয়া আমায় রাজ্যসুখ ভোগ কবিতে বল?"

খসরু কমলের সম্মুখে সেই নির্জ্জন জনশূন্যস্থানে জানু পাতিয়া বসিলেন। জগৎ দেখ যে প্রণয়ের কি অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা, সাহাজাদা খসরু আজি এক-জন সামান্য বাঁদীর সম্মুখে নতজানু!

খসরু শাশ্রুলোচনে কহিলেন, "কমল! তুমি মানবী নও দেবী,—আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে তোমায় পাইব? কিন্তু একটী প্রার্থনা, যেন মৃত্যুর সময় তোমায় দেখিতে পাই, তাহা হইলেই আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। আমাকে ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ কাবুলের কারাগারে দেখিতে পাইবে।"

খসরু আর কমলের দিকে চাহিলেন না, তাহার মুখের একটী কথাও শুনিবার অপেক্ষা করিলেন না, একেবারে পিতৃ-শিবিরাভিমুখে চলিলেন।

যতক্ষণ খসরুকে দেখা যাইতে লাগিল ততক্ষণ কমল একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। চক্ষের জলে এক একবার দৃষ্টিরোধ হইতে লাগিল, কমল চক্ষু মুছিয়া আবার খসরুর দিকে চাহিতে লাগিল। যখন আর দেখা গেল না তখন একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "সব ফুরাইল—এতদিনে সকলই ফুরাইল।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

সকলের শেষ।

খসরু বিমর্ষভাবে কতকদূর যাইয়া একস্থানে উপবেশন করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিলেন, মনে মনে বলিলেন "আর কেন, এ পাপ পৃথিবীতে থাকিবার আর স্পৃহা কেন? ধন মান যশ গৌরবে আর হতভাগ্য খসরুর বিন্দুমাত্র সুখ নাই। আর কাহার আশায় এ পৃথিবীতে থাকিব, আর কাহার সুখের জন্য পিতৃপদে ঋণী হইব! খসরু আর কোন কথা না কহিয়া চক্ষু মুছিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। আর জয়পুরে না গিয়া আগ্রায় যাইয়া নূতন বাদসাহের নিকট আত্ম সমর্পণ করিলেন। খসরু ঠিকই বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রকৃতই কাবুলের দুর্গে বন্দী হইতে হইল।

এদিকে কমল আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ আগ্রা পরি-ত্যাগ করিলেন, এবং যথাকালে জটাজুটধারিণী সন্ন্যাসিনী হইলেন। হরিদ্বার গয়া কাশী প্রভৃতি তীর্থ স্থানে ভ্রমণ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

একদিন সন্ধ্যাকালে কাবুলের দুর্গদ্বারে একটি সন্ন্যাসিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দ্বারী কহিল "মা—আপনি এখানে?"

দ্বারীদিগের নিকট সন্ন্যাসিনী পরিচিতা। সন্ন্যাসিনী কহিলেন "আমি কারাগার দেখিব।

দ্বারী। কারাগারে কাহারও প্রবেশ অনুমতি নাই।

সন্ন্যাসিনী। যাহার প্রবেশে তোমাদিগের স্বার্থের কোন ক্ষতি সম্ভব, তাহারই অনুমতি না থাকিতে পারে, আমার নাই কেন?

দ্বারী। কি করিব মা, বাদসাহের হুকুম, আমরা চাকর মাত্র।

তখন সন্ন্যাসিনী আপন অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরীয়ক দেখাইলেন, দ্বারী অবনত শিরে কহিল "আপনার প্রবেশে কোন আপত্তি নাই।"

সন্ন্যাসিনী কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে—এমন সময়ে কারাগারের একটী অন্ধকার গৃহে একটী জীর্ণ শীর্ণ ব্যক্তিকে লইয়া যাওয়া হইল। পাঠক, ইনিই আপনাদেব সেই সাহাজাদা খসরু। বহুদিন কারাবাসে ও অনিয়মিত আহার ও অনাহারে তাঁহার সে দেহ—সে লাবণ্য কিছুই নাই। যে গৃহমধ্যে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল তন্মধ্যে একটী সামান্য দীপ ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল। সম্মুখে দুইজন কৃতান্তসম লোক অসিহস্তে দণ্ডায়মান। হায় খসরু, তোমার জীবনদীপও কি ঐরূপ ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে?

খসরু কহিলেন, "কি বলিবে বল?"

"বাদসাহের আদেশ—আপনার মুণ্ডচ্ছেদন করা।"

খসরুর সেই বিশুষ্ক বদনে একটু মৃদুহাসি প্রতিভাত হইল, বলিলেন "এই! তা এ শুভ আজ্ঞা কেন পূর্ব্বে প্রদত্ত হয় নাই?"

"সে কথা বলিতে পারি না।"

"তবে আর বিলম্ব কর কেন?"

"আপনি ঈশ্বরের নাম লইবেন না? আপনার আদেশ মত আমরা অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি। বড় দুর্ভাগ্য যে এমন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি—আরও দুর্ভাগ্য যে আপনার হত্যায় আমরা আদিষ্ট হইয়াছি।"

"সে দোষ তোমাদের নয়—কিন্তু আমাকে হত্যা করার সংবাদ প্রকাশ পাইলে লোকে কি বলিবে?"

কে জানিবে? প্রচার হইবে আপনার পীড়ায় মৃত্যু ঘটিয়াছে।"

"এত প্রবঞ্চনা ?"

"শুনিয়াছি রাজনীতির অন্যতম নাম প্রবঞ্চনা।"

"হতে পারে—কিন্তু যিনি আবুল ফজেলের তুল্য মহাকবির জীবন নাশ করিতে পারেন, স্বামীহত্যা করিয়া মোহরেন নেছাকে নুরজাহান নাম দিয়া বিবাহ করিতে পারেন, আবার তাহারই পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যার সহিত আপন সন্তানের বিবাহ দিয়া, সেই মায়াবিনীর ইচ্ছামত অপর পুত্রদের কথা ভুলিয়া যাইয়া চতুর্থ সন্তানকে সিংহাসন দিবার চেষ্টা পান, তাঁহাকে যদি দেশের লোকে ধন্য ধন্য করেন, তাঁহার আদেশে যদি আমার হত্যা সাধিত হয়, তবে আর ধর্ম্ম কোথায় ?"

"সে কথার উত্তর আমরা দিতে পারি না।"

"তবে আর বিলম্ব কেন, আমি প্রস্তুত আছি স্বকার্য্য সাধন কর। যদি দেশে ধর্ম্ম থাকে, যদি প্রেতাত্মার মানবের উপর অলক্ষিত ক্ষমতা প্রকাশের ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতেছি দিল্লীর অত্যাচারী সিংহাসন শূন্য হইবে। মোগল সম্রাটের নাম ভারতের ইতিহাস হইতে শীঘ্রই উঠিয়া যাইবে।" খসরু নিস্তব্ধ হইলেন, ঘাতকদিগকে কার্য্যশেষ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

ঘাতকের অসি ঊর্দ্ধে উঠিল, দেখিয়া খসরু চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, এমন সময়ে কে বিদ্যুৎবেগে তথায় আসিয়া সেই অসিমুখে আপন বক্ষ পাতিয়া দিল, রুধিরধারায় ধরাতল প্লাবিত হইল।

খসরু চক্ষু উন্মীলন করিয়া আহতাকে রুধিরধারায় প্লাবিতা দেখিয়া বলিলেন "দেবী, আপনি কে ?"

আহতা জটাজুটধারিণী সন্ন্যাসিনী, মৃদু হাসিয়া বলিলেন "প্রতাপ, আজ আমাদের বিবাহ; চল যেখানে জাতিভেদ নাই সেই দেশে যাইয়া মিলিত হই।"

প্রতাপ "কমল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তদ্দণ্ডেই ঘাতকের অসি তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইল, সেই বিস্ময়সূচক বদন হইতে সজোরে—"ক—" এই কথাটী উচ্চারিত হইবা মাত্র ছিন্নকণ্ঠ ভূ-পৃষ্ঠে নিপতিত হইল।

কমলশ্যাও. সেই অনন্তধামে ঐ দেখ অপ্সরাগণ তোমায় আবাহন করিতেছে। সেই বিমল সুখের রাজ্যে যাও। সেখানে হয়ত সুখী হইতে পারিবে। মানবে সুখ দুঃখ ঠিক বুঝে না, যিনি সুখ দুঃখের নিয়ন্তা তাঁহার কাছে যাও,

তিনি তোমার সকল জ্বালা ঘুচাইবেন। তোমায় পূর্ণ সুখের অপূর্ব্ব আস্বাদন দানে হৃদয়ে শান্তিধারা ঢালিয়া দিবেন।

যাও যাও কমল, এ বিবাহের ফুল-শয্যা মর্ত্ত্যে শোভা পায় না, স্বর্গে যাও। যেখানে সুখ আছে দুঃখ নাই, শান্তি আছে অশান্তি নাই, সেই নিত্যধামে যাও। সেই নিত্যসুখ তোমাদের অতুলনীয় অক্ষয় প্রেমের ফল!

সমাপ্ত।

চঞ্চলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চঞ্চলা।

মহারাষ্ট্রে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। চতুর্দ্দিকে হাহাকার। কঙ্কালসার নর নারীতে গ্রাম, নগর, পথ, ঘাট পূর্ণ। যেন অস্থিগুলি পাতলা চামড়ায় ঢাকা আছে। বুকের পাঁজর গোনা যায়, চক্ষু কোটরগত, কেশ রুক্ষ, বদন বিবর্ণ, দেহ নির্জ্জীব। কত যুবক যুবতীর প্রেমপূর্ণ হৃদয় আজি অন্ধকারময়; কত আনন্দ পূর্ণ বালক বালিকা সমাকীর্ণ গৃহ প্রাঙ্গন আজি বিষাদময়। কত সোনার সংসার ছারখার হইয়াছে। কত উদ্যমপূর্ণ যুবক হৃদয় জর্জ্জরিত। কত স্বামী কত স্ত্রী, কত পিতা, কত মাতা, কত সন্তান, কত কন্যা, আজি সেই মহারাক্ষসীর করাল গ্রাসে নিপতিত হইয়া দারুণ যাতনায় অস্থির। যাঁহার অর্থ আছে, তাঁহারও ঘরে অন্ন নাই। পথে কাঙ্গালিতে চাল লুটিয়া খায়। ব্যবসায়ী ভয়ে ব্যবসা করে না, দূর হইতে চাউল আনিতে সাহস পায় না। ঘরে চাউল থাকিতে লোক ভিক্ষা দেয় না, পেট পুরিয়া খায় না চিন্তা, যদি আর চাউল না পাওয়া যায় তাহা হইলে কি হইবে? কত লোক অদ্ধাশনে, কত অনশনে দিন-পাত করিতেছে।

কাঙ্গালের কথা আর কি বলিব? দেশে ঘাস নাই, বট, অশ্বত্থ গাছে ফল নাই, পুকুরে শাক নাই—সব খাইয়া ফেলিয়াছে। পথে গোময়ে একটী শস্য পড়িয়া থাকিলে শত শত বালক বালিকা বৃদ্ধ যুবা তাহা আগ্রহ সহকারে খুঁটিয়া খায়। পথে ভদ্রলোক দেখিলে কাতর নেত্রে তাকায়, আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। গৃহস্থ ভাতের ফেন ফেলিয়া দেয় না ভিখারীকে দেয়, পাতের অবশিষ্ট দুই চারিটী অন্নের জন্য লোক লালায়িত। ঘরের দ্বার দিয়া আহার করিতে হয়, নতুবা কাঙ্গালীরা ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করে এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর দিয়া দাঁড়াইয়া কাকুতি মিনতি করিয়া আহারে নিবৃত্ত করে, অবশেষে ছুঁইয়া ফেলে।

পথে ঘাটে দিন নাই রাত নাই লোক পড়িয়া মরিয়া আছে। শিশু মৃত মাতার স্তনপান করিতেছে। গাভী তৃণাভাবে দুগ্ধ দেয় না, শিশু

সন্তানদিগের কষ্টের অবধি নাই। জলাশয় জলশূন্য। সেই পঙ্কিল জল খাইয়া রাশি রাশি লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া জীবনের দারুণ যাতনা হইতে অব্যাহতি পাইতেছে।

বলিব কি, বলিতে লেখনী চলে না, মাতা পুত্রের হাত ধরিয়া অন্ন কাড়িয়া খাইতেছে। শুনিয়াছি চীনদেশের মহা দুর্ভিক্ষের সময় মাতা জঠর জ্বালায় অধীর হইয়া আপন সন্তানকে আহার করিয়াছিল, ভারতেরও স্থানে স্থানে সে ভীষণ দৃশ্যও মানবের নয়নপথে পতিত হইয়াছে। আর কি হইবে? কত সতী ভীষণ উদরানলের জ্বালায় একমুষ্টি অন্নের জন্য আপন অমূল্য নিধির বিনিময় করিয়াছে, কত সংসারী স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া উদরানল নির্ব্বাপিত করিয়াছে!

সুখের বিষয় যে ভারতে সহানুভূতির অভাব নাই। সাধারণের যেমন দয়া, রাজারাও তেম্নি, কিন্তু যাঁহার সৃষ্টি তিনি নাশ করিতে বসিলে রাখে কে? দরিদ্রের আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু আহার দিবে কত লোককে? টিকিট পাইলে লোকে আহার পায়, সেই অন্ন পাইবার পাশের জন্য লোকের কি আগ্রহ! একটি পাশ যেন অমূল্য নিধি—বুঝি অমূল্য নিধি অপেক্ষাও অমূল্য। কহিনূর তুমি ছার! যাঁহাকে ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিতে হয় না, তাহার কাছে—ধনীর কাছে—তাহার আদর,—দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট কাঙ্গালির কাছে তাহা কিছুই নয়। অন্নই প্রাণ, কহিনুর বুকে বাঁধিলে ত জঠর জ্বালার নিবৃত্তি পাইবে না, ওষ্ঠাগত প্রাণ ত ফিরিয়া আসিবে না।

রাজার চক্ষু সকল দিকে। দরিদ্রের আহারের সঙ্গে সঙ্গে পীড়িতের জন্য হাঁসপাতাল খোলা হইয়াছে। চিকিৎসক দাস দাসী শুশ্রূষাকারিণী ধাত্রী প্রভৃতি নিযুক্ত হইয়াছেন। বাক্স বাক্স ঔষধ আসিয়াছে, আমাদের চঞ্চলা সেইরূপ একটী পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী।

চঞ্চলার বয়স অষ্টাদশ বৎসরের অধিক নয়। কায়স্থ কন্যা, দেখিতে দিব্যশ্রী, তায় আবার যৌবনের সুখ-সন্মীলনে তাহা উছলিয়া উঠিয়াছে।

চঞ্চলাকে সকলে ভালবাসেন। চঞ্চলার স্বভাব চরিত্র যেমন ভাল, তেমনি হৃদয় খানি দয়া, সৌজন্য, স্নেহ, বিনয়ে ভরা। রোগীর সেবায় চঞ্চলার আন্তরিক আনন্দ। আহার নাই, নিদ্রা নাই, আলস্য নাই, চঞ্চলা রোগী সেবায় নিযুক্তা। মুমূর্ষু রোগীর শিয়রদেশে চঞ্চলা একাকিনী বসিয়া সেবা করিতেছেন, কিন্তু মনে ভয় নাই। যেখানে সাহসী পুরুষে একা থাকিতে সাহস

পায় না সেখানে চঞ্চলা অনায়াসে থাকেন। ধন্য চঞ্চলা, ধন্য তোমার সহানুভূতি, ধন্য তোমার দয়াল হৃদয়ের স্বর্গীয় কমনীয়তা!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিপদ।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একটী যুবক অশ্বারোহণে মহারাষ্ট্র দেশের একটী পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত। আর বেলা নাই—নিস্তেজ সূর্য্যরশ্মি দূরে পর্ব্বৎ-অঙ্গে ঝিকি মিকি করিতেছে। বৃক্ষে পাখী বসিয়া কিচিমিচি আরম্ভ করিয়াছে, দুই একটা পেচক ইহারই মধ্যে কোটর ছাড়িয়াছে। পথে শৃগাল কুকুরের ছুটাছুটী লাগিয়াছে। দুর্ভিক্ষের দিনে যখন রাশি রাশি লোক মরিতে আরম্ভ হয় তখন সকল দেশেই শৃগাল কুকুব শকুনি গৃধিনীর বড় আনন্দ। আজ সেই পার্ব্বত্য প্রদেশে তাহারই প্রমাণ পরিদৃশ্যমান।

যুবকটীর বয়ঃক্রম আনুমানিক পঞ্চবিংশতি বৎসর, বঙ্গদেশীয় ভদ্রসন্তান বলিয়া মনে হয়। পরণে পেণ্ট্‌লেন, কোট, মাথায় কাল মখমলের টুপি। পায়ে ডসনের ব্রউনলেদার বুট, মুখে চুরুট। দুই পকেটে দুইটী ওয়েব্‌লীর ছয়নলা রিভল্‌ভার।

ভাবে বোধ হয় তাঁহাকে যেন অনেকদূর যাইতে হইবে। না যাইলেও যেন নয়, অথচ ভাবিতেছেন কি করিয়াই বা যাইব। রাত্রি ত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ধকার থাকিবে। সঙ্গে আলো নাই, লোক নাই। এ সময় পার্ব্বতীয় পথ দিয়া অশ্বারোহণে গমন কি অনায়াস সাধ্য? বিশেষতঃ এই দুর্দ্দিনে? যেখানে সেখানে দস্যুতা আরম্ভ হইয়াছে, প্রাণের দায়ে লোকে পরের যাহা পায় লুটিয়া লয়। কিন্তু তখনি কাঙ্গালের বিরস বদনের করুণ ছবি তাঁহার হৃদয়পটে জাগিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন "যাইতেই হইবে, না যাইয়া কি থাকিতে পারি?"

অশ্বটী খানিক দুল্‌কিতে গেল. শেষে ধীরে ধীরে পর্ব্বতে উঠিতে লাগিল, পথ শঙ্কীর্ণ, দক্ষিণ অঙ্গে পর্ব্বত ঠেকে, বামে গহ্বর, পড়িলে তখনই প্রাণ নাশ হইবে, এত বিপদ সত্ত্বেও যুবক একাকী চলিয়াছেন। শেষে ঘোড়াটী বড়ই ধীরে যেন কত সতর্কতার সহিত চলিতে লাগিল, অনেকক্ষণ এই ভাবে

গমন করিয়া হেষারব করিল, মনে হইল তাহার যেন কত আনন্দ হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহাই বটে, পথটী তাহার পরিচিত। প্রশস্ত সমতল পথে আসিয়াছে বলিয়া তাহার এই আনন্দ, এই হেষারব!

অশ্ব আবার টুটে চলিয়াছে, ইচ্ছা গ্যালপ্ ধরে, কিন্তু আরোহীর সে ইচ্ছা না থাকায় তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। ক্রমে পূর্ব্ব গগনে ধীরে ধীরে শশধরের মৃদু বিভা দেখা দিল, যুবক হৃদয় আনন্দ ও উৎসাহে প্রমত্ত হইল, কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় তাহাকে অধিকক্ষণ সে সুখানুভব করিতে হইল না, গগনে ধীরে ধীরে ঘন ঘটার সমাবেশ হইতে আরম্ভ হইল। সেই চন্দ্র তারকা বিহীন ঘোরান্ধকার আকাশ পথে দামিনী বিকট হাসিতে লাগিল। আকাশের যেন তখন সে হাসি ভাল লাগিতেছিল না, তাই যেন তিরস্কার ছলে হুঙ্কার রবে দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইতে ছিল। যুবক তখন ভাবিতেছিলেন, যাই কোথায়, থাকি কোথায়? নিকটে গ্রাম নাই, জনমানবের বাস নাই, যাহা আছে তাহা প্রায় এক ক্রোশ দূরে! সে এক ক্রোক যাইতে সময় হইবে কি?

অশ্ব একবার ইচ্ছামত ছুটিল, কিন্তু ছুটিলে কি হয়, দুই এক ফোঁটা চড়্‌বড় করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে তুমুল রঙ্গে প্রভঞ্জন ছুটিল, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে করকাপাত হইতে আরম্ভ হইল। যুবক শশব্যস্তে ঘোটক হইতে অবতরণ করিয়া একটী বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন, কিন্তু সেখানেও নিস্তার নাই, ডাল পাতা ভেদ করিয়া শিলাপাত হইতেছে। ঝড়ে শাখাগুলি যেন ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধে উঠিয়া অপরদিকে বাঁকিয়া যাইতেছে। পাতাগুলি ফর্ ফর্ করিয়া উড়িতেছে, কতক বা ছিঁড়িয়া উড়িয়া যাইতেছে। হায় কি? প্রাণ বাঁচে কেমন করিয়া?

অনেকক্ষণ পরে ঝড় জল অল্প থামিতে লাগিল, কিন্তু তখন কি অশ্ব, কি অশ্বারোহীর সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ সিক্ত, কলেবর শীতে কম্পিত। যুবক আবার অশ্বারোহন করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চলিলেন। কতকদূর যাইয়া একটী গ্রাম পাইলেন সেই গ্রামের জমিদার তাঁহার পরিচিত, তিনি তাঁহার আবাসে সেই ভীষণ রাত্রি যাপনের অভিপ্রায়ে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

জমিদারটীর নাম শিউশরণ। শিউশরণের দ্বিতল বাটী। খুব প্রকাণ্ড না হইলেও ছোট নয়। সম্মুখে বেশ বিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত ভূমি। যুবক বাটীর সম্মুখে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলেন দ্বারবান নাই। মনে করিলেন

কোথাও গিয়াছে! তিনি তখন একটী নিকটবর্ত্তী অশ্বশালার অশ্বটীকে বন্ধন করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ডাকিলেন "দর্‌বান, দর্‌বান।"

কোন উত্তর নাই। আবার ডাকিলেন, আবার উত্তর নাই।

তখন বলিলেন "বাটীতে কে আছ?"

আবার পূর্ব্বমত কোন উত্তর পাইলেন না। মনে করিলেন সকলে বুঝি ঘুমাইয়াছে, তাই কোন উত্তর পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু তখনি আবার মনে হইল তাই বা কেমন কথা, সকলে ঘুমাইলে এ দুর্ভিক্ষের দিনে এত রাত্রে সব দরজা খোলা থাকবে কেন?

শিউশরণের চারিটী দ্বারবান মাত্র ছিল, কিন্তু তিনি দুর্ব্বৎসর দেখিয়া আরও ৮টী দ্বারবান রাখিয়াছিলেন, সে শিউশরণের ঘর এমন খোলা পড়িয়া থাকিবে কেন? তবে ব্যাপার কি?

তখন তিনি ধীরে ধীরে উপরে উঠিলেন, দেখিলেন কেহ কোথাও নাই। জানালা খুলিলেন, চন্দ্রের কিরণজাল কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার সাহায্যে দেখা গেল, বাক্স, পেটড়া সব খোলা পড়িয়া রহিয়াছে, জিনিষ পত্র ছড়ান রহিয়াছে। এ কি? তবে ইহারা সব কোথায়?

মনে কেমন এক প্রকার আতঙ্ক হইল। সব ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন কেহ কোথাও নাই, একটী মূষিকও নড়ে না।

তখন যুবক আবার ডাকিলেন "শিউশরণ সাব।"

প্রতিধ্বনি হইল "শিউশরণ সাব" কিন্তু সে প্রতিধ্বনি যেন কেমন ভীতিপ্রদ। যুবক তখন একখানি বস্ত্র পরিধান করিয়া গা হাত মুছিয়া শীতের ভীষণ কম্প হইতে আত্মরক্ষা করিবেন বলিয়া ভাবিতেছেন এমন সময় ছাদে যেন কাহাকে দেখা গেল, কাহার যেন ছায়া, সে ছায়া যেন রমণীর। প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, শীত যেমন উড়িয়া গেল। বক্ষ দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল, নিশ্বাস সঘন বহিল, সেই শীতার্ত্ত কলেবরে যেন স্বেদবিন্দু দেখা দিতে লাগিল।

ওকে? মানবী না প্রেত যোনি? বাল্যকাল হইতে জুজুর ভয় দেখিয়া সেই সাহসী যুবকও প্রেত যোনির ভয়ে ভীত হইলেন। ভাবিলেন যখন বাটীতে কেহ কোথাও নাই তখন স্ত্রীলোকের একাকিনী থাকা অসম্ভব। একবার ইচ্ছা হয় দেখি, আবার তখনি মনে হয়, না, দেখিয়া কাজ নাই। এমন সময় সহসা বহির্দ্দেশে একটা কি ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। যুবকের তখন ভূতের ভয় গেল। বারেন্দায় যাইয়া দেখিলেন প্রায় শতাধিক লোক

অস্ত্র শস্ত্র লইয়া মশালের আলোক জ্বালাইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। এ আবার কি নূতন বিপদ!

তাহাদের একজন বলিতেছে "দেখ আর কেউ আছে কি না, সব মার, সব কাট।" আর একজন বলিতেছে "শিউশরণ গেল কোথায়?"

কেহ বলিতেছে "ঘর পোরা ধান থাকিতে পয়সা দিয়া ধান পাই না—আমরা দুই দিন অনাহারী। তাহাকে আগে কাট।"

তখন "মার্ মার্ কাট্ কাট্" বলিয়া বিকট রব উঠিল। এমন সময়ে একটি সুন্দরী যুবতী দ্রুত আসিয়া আমার অঙ্গ স্পর্শ করিল।

যুবক মৃদুস্বরে বলিল "আপনি কে?"

যুবতী। আমি শিউশরণের কন্যা। সকলে পলাইয়াছে আমি পলাইতে সময় পাই নাই, একটী গুপ্তঘরে লুকাইয়া আছি,—আমার সঙ্গে আসুন আপনাকে লুকাইয়া রাখিব।

যুবক তাঁহার সঙ্গে দ্রুতপদে চলিলেন।

ক্রমে দ্বিতলের একটী সোপান দিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া একটী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলেন। কক্ষটীতে একটী দেওয়ালের মধ্যে দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, যাঁহার জানা নাই তাঁহার সে পথ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত বটে। যুবক যাইতে যাইতে বলিলেন "ব্যাপার কি?"

"বাবা গ্রামের নিঃস্ব ব্যক্তিদের সাহায্য করেন নাই—অর্থ লইয়াও ধান বেচেন নি?

"কেন?"

"তাহা বলিতে পারি না।"

"উহারা কে?"

"গ্রামের লোক।"

"প্রকৃতই কি হত্যার অভিলাষ?"

"সম্ভব।"

যুবক আর কোন কথা কহিলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দুইটী হত্যা।

যুবতী যুবককে সেই গোপন স্থানে রাখিয়া বলিলেন "আপনি থাকুন আমি একবার দেখিয়া আসি।"

যুবক। একাকিনী যাইবেন?

যুবতী। হলেই বা।

যুবক। আমিও যাইব।

যুবতী। তা হইলেই বিপদ ঘটিবে, অন্ধকারে পথ চিনিতে না পারিয়া বিপদে পড়িবেন।

যুবক। তা বলিয়া আপনাকে একাকিনী যাইতে দিব?

যুবতী। আমার জন্য চিন্তা করিবেন না আমি এমন ভাবে যাব যে কেহ দেখিতে পাইবে না।

যুবক। যদি কোন বিপদ ঘটে তবে আর পরিতাপের শেষ থাকিবে না।

যুবতী। বিপদ ঘটিবার হইলে ঘটিবে, আপনি তাহার কি করিবেন?

যুবক। রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব।

যুবতী মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আপনার এ সৎসাহসের প্রশংসা করিতে পারিলাম না, আপনি একা, শতাধিক লোকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা কি সম্ভবে"?

যুবক আর কোন কথা কহিলেন না। যুবতী ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া বাহিরে কি হইতেছে দেখিতে গেলেন।

যুবতীকে অনেকক্ষণ না দেখিতে পাইয়া যুবকের মনে কেমন সন্দেহ হইল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ধীর পাদবিক্ষেপে তথা হইতে বাহিরে আসিলেন, কিন্তু যাহা দেখিলেন তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল।

বিপদ যখন ঘটিবার তখন বস্তুতঃই তাহা রক্ষা হয় না, সতর্কতায় কোন ফলোদয় হয় না। যে দিকে অন্ধকার, যুবতী সেই দিকে আত্মগোপন করিয়া ধীরপাদ-বিক্ষেপে যাইতেছেন। পথের ধারে ত চীৎকারধ্বনি হইতেছে, এখানে ভয় কি?—তথাপি যুবতীর সতর্কতার ত্রুটী নাই।

যুবতীর কোমর বেড়িয়া কাপড় বাঁধা। আলুলায়িত কেশদাম পৃষ্ঠদেশে অরচিতভাবে মৃদু-মন্দ বাতাসে দুলিতেছে। চক্ষু স্থির, মুখভাব গম্ভীর। যুবতী

বিস্ফারিতলোচনে বামে দক্ষিণে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে যাইতেছেন। এমন সময় কে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বলিল, "এই যে বুঁদিয়া।"

যুবতীর নাম বুঁদিয়া। তিনি চমকিয়া উঠিয়া পলায়নের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তখনি প্রায় ছয় সাত জন লোক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তৎকার্য্যে বাধা দিল। হরিণী পাশাবদ্ধ হইলেন।

যুবতী বলিলেন "আমায় ছেড়ে দাও।"

তাহাদের মধ্যে একজন উত্তরে বলিল "কেন তুমি কি?"

"সহায়হীনা বিধবা।"

"সধবা হইবার সাধ আছে কি?"

বুঁদিয়ার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল বলিল "পাপিষ্ঠ সাবধান।"

সে হাসিয়া কহিল "কেন শির নেবে নাকি? আজ আর চোক রাঙ্গানির কর্ম্ম নয়।"

"আমার না থাক আর কারও আছে ত?"

"তোমার বাপের?"

"তিনি তারও বড়।"

"কোম্পানীর?"

"তিনি কোম্পানীরও বড়।—তাঁর হাত থেকে পরিত্রাণ নাই।"

"ভগবানের কথা বল্‌চ?"

"তাঁর বড় আর আছে কে?"

লোকটা তখন হা হা করিয়া হাসিয়া কহিল "ভগবান আবার আছে কি, যদি থাকে তবে তাকে বড় বলিনে। তার আবার বিচার আছে কি? হা ভগবান হা ভগবান করে গুষ্টিশুদ্ধ কেঁদেছি—তার দয়া হয়নি। অন্নাভাবে ভগবানকে ডেকে মা আমার প্রাণ দিয়েছেন। ডাকাতি করে স্ত্রীকে ছেলেদের খাওয়াব মনে করিয়াছিলাম তা স্ত্রী বল্‌লে অমন কাজ করোনা, তাঁর চরণে মতি রাখ তিনি সব দুঃখ ঘোচাবেন। তা দুঃখ খুব ঘুচেছে। ভাতে কুলুতনা বলে সে না খেয়েও বল্‌তো খেয়েছি। নিজের ভাত ছেলেদের দিত, আমায় খাওয়াত, শেষে একদিন বসে বসে মরে গেল। দেখ্‌লে ভগবানের বিচার। আর তোমার পূর্ব্ব পুরুষ অধর্ম্ম করে পয়সা করেছে, সেই পয়সায় তোমার ঘরে দ্বারবান, হাতি, ঘোড়া। তোমার ঘর পোরা ধান—তোমার সুগোল দেহ। আর আমি হা ধর্ম্ম হা ধর্ম্ম করে দুর্ব্বল কৃশ। যখন ভগবানের ধোঁকা গেল, ধর্ম্ম ছেড়ে

অপদস্থ কর্‌লাম, পরের দ্রব্য লুট্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম ; তখন থেকে দুবেলা খেতে পাই, এই ত ভগবানের বিচার!—সে কাণা ভগবান আমার যা কর্‌তে পারে কর্‌বে, এখন তোমায় যা কর্‌বার তা করি এস।

"কি কর্‌বে ?"

"কি কর্‌বো ? সাদি কর্‌বো।"

"জান, এ ইংরাজের রাজ্য ?"

"খুব জানি, ইংরেজ সাদিতে কথা কয় না।"

বুঁদিয়া তখন ত্রাস্তহস্তে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী শাণিত ছুরিকা বাহির করিলেন, কিন্তু বাহির করাই সার। পাপিষ্ঠ হস্ত দ্বারা সেই হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল "এই দ্যাখ্‌ তোর ভগবানের কাজ দ্যাখ্‌।"

তখন সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া ফেলিল এবং এক প্রকার বিকট শব্দ করিয়া তাহাকে নীচে লইয়া গেল।

যুবক দেখিলেন যুবতী বন্দিনী হইয়াছেন। নির্দ্দয় নিষ্ঠুর সম্প্রদায় তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া ভূমিতে ফেলিয়াছে। অঙ্গের বসন নাই বলিলেও হয়। বক্ষোপরে একজন চাপিয়া বলিতেছে "বল্ তোর বাপ্ কোথায় ?"

যুবতী। জানি না।

দস্যু। নিশ্চয় জানিস্।

যুবতী দর্প সহ বলিলেন, "আমি বলিতেছি জানি না, আর জানিলেও বলিতাম না।"

দস্যু। বলতে হবে, বল্।

যুবতী। বলিব না।

দস্যু। প্রাণে মরিবি।

যুবতী হাসিয়া বলিলেন "উঃ! এই!"

বলিতে বলিতে একটী সুতীক্ষ্ন ছুরিকা তাহার বামহস্তে বিদ্ধ হইল। রুধিরপাত হইতে লাগিল। তখন একজন বলিল "এখনও বল্।"

যুবতী আবার বলিলেন "জানিনা, জানিলেও বলিতাম না।"

তখন একজন বলিল "যাহাকে পাইয়াছ তাহাকেই মার।"

বলিতে বলিতে অসংখ্য অস্ত্র দীপালোকে জ্বলিয়া উঠিল। সেই অসংখ্য অস্ত্র যুবতী অঙ্গে পতিত হইল, রুধির ধারায় ধরাতল প্লাবিত হইল। যুবতী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ভগবান আমি মরি তার দুঃখ নাই, আমার মা বাপ্‌কে বাঁচাও।"

যুবতীর আর কথা বাহির হইল না। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। তখন একজন বলিয়া উঠিল "এইবার ডাক্‌ তোর ভগবানকে, দেখি সে কেমন রক্ষা করিতে পারে।"

যুবক আর থাকিতে পারিলেন না। চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন রাশি রাশি লোক আলোক ও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া "ঐ শালা শিউশরণ, ঐ শালা শিউশরণ" বলিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। সোপানশ্রেণী সে পদভরে যেন কাঁপিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চারি পাঁচ জন লোক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। আত্মরক্ষার আর উপায় নাই। কি হয়, যুবক তখন একটী দেয়ালে ঠেস্‌ দিয়া দুই হস্তে দুইটী রিভলভার লইয়া ছুড়িলেন। দুই জন লোক ধরাশায়ী হইল, বাকি সকলে পিছাইল। তখন নিচেয় কি পরামর্শ হইল, উন্মত্ত শার্দ্দুলের ন্যায় প্রবল পরাক্রমে আবার সকলে ছুটিল। দুম্‌ দাম্‌ করিয়া রিভলভারের আওয়াজ হইল, পাঁচ সাত জন লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল, কিন্তু তাহাদের উদ্যম বিফল হইল না, তাহারা বীরদর্পে যুবককে আক্রমণ করিল, হস্তস্থিত রিভলভার কাড়িয়া লইল। উষ্ণীষ দিয়া তাহাকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া সিঁড়ি দিয়া টানিয়া নামাইতে লাগিল। ধরিবার উপায় পর্য্যন্ত নাই, মাথা ফাটিল, রুধিরপাত হইল। বদনমণ্ডল ক্ষত বিক্ষত হইল, সেই দারুণ যন্ত্রণায় যুবক জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলেন।

এমন সময় দূরে বন্দুকের শব্দ হইল। সকলে চমকিল। দেখিল সসজ্জ পুলিশ আসিতেছে। তখন সকলে আলোক নিবাইয়া অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যে যে দিকে ইচ্ছা পলাইল।

পুলিসের সঙ্গে শিউশরণ আসিয়াছেন,—কন্যার সেই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড দেখিয়া তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন সকলের দৃষ্টি যুবকের দিকে পড়িল। তাঁহার জীবনের কোন লক্ষণ নাই। শিউশরণ বলিলেন "এ শ্যামনীরদ বাবু যে।"

দারোগা বাবু বলিলেন "শ্যামনীরদ বাবু কে?"

শিউ। উনি আজ মাসাবধি এ দেশে অন্নসত্র খুলিয়া রাশি রাশি লোককে ভোজন করাইতেছেন।

দারোগা। ইনিই সেই দয়ালু যুবক?

শিউ। হাঁ।

দারোগা। এখানে কেন?

শিউ। সহরে চাউল খরিদ করিতে গিয়াছিলেন, যাইবার সময় আমাকে বলিয়া যান। বোধ হয় ঝড় জলে আমার বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

দারোগা। তাহাই ঠিক। বস্ত্রাদি এখনও সিক্ত রহিয়াছে।

তখন দারোগা বাবু যুবককে পরীক্ষা করিলেন, নাড়ী নাই। বক্ষে কোন শব্দ নাই। নাসিকায় নিশ্বাস প্রশ্বাসেরও চিহ্ন নাই। বলিলেন "ইনিও নাই।"

শিউ। এখন কি করিবেন?

দারোগা। লাস চালান দিব।

শিউশরণ তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য দারোগা বাবুকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন বাহক ডাকা হইল। পুলিস প্রহরী সমভিব্যাহারে লাস চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এ কি!

জেলার বড় ডাক্তার সাহেব সর্কিট আসিয়াছেন, দুর্ভিক্ষ হাঁসপাতাল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, সুতরাং লাস জেলায় না পাঠাইয়া দুর্ভিক্ষ হাঁস-পাতালে পাঠান হইল। পাঠাইতে বেলা প্রায় ৮ টা বাজিল।

হাঁসপাতাল বড় নিকট নয়, প্রায় ছয় ক্রোশ। সুতরাং লাস যখন পৌছিল তখন বেলা প্রায় নাই। ডাক্তার সাহেব বেড়াইতে গিয়াছিলেন, আসিয়া হাঁসপাতালের ডাক্তার বাবুকে বলিলেন "লাস পচিয়াছে কিনা দেখিয়া এস।"

তিনি ক্ষণেক পরে আসিয়া বলিলেন "মেয়েটী পচিতে আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু যুবকটী এখনও বেশ আছে।"

ডাক্তার সাহেব বলিলেন "তবে আজ লাসখানায় রাখিয়া দাও, কাল প্রাতে পরীক্ষা করিব।"

কার্য্য আদেশানুযায়ী হইল।

যে ঘরে লাস রাখা হয় সেটী হাঁসপাতাল গৃহ হইতে প্রায় এক পোয়া পথ দূরে। ঘরটীতে একটী মাত্র জানালা আছে, আর একটী দ্বার। ঘরটী

মাটীর, কিন্তু নিতান্ত অপ্রশস্ত নয়। বাহকেরা সেই কক্ষ মধ্যে লাস দুটীকে রাখিয়া বিদায় হইল।

শিউশরণ সন্ধ্যার পরই আসিয়া উপস্থিত। সে দিনও শবদাহ হইবে না শুনিয়া তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ডাক্তার বাবুকে কত বলিলেন শেষ ডাক্তার সাহেবকেও বলা হইল কিন্তু কোন ফল দর্শিল না। তখন একবার কন্যার মৃত দেহ দেখিবার জন্য বাসনা জন্মিল, ডাক্তার তাহাতে সম্মত হইয়া একজন লোকের সঙ্গে তাঁহাকে সেই লাস ঘরে পাঠাইয়া দিলেন।

শিউশরণের কন্যা বুঁদিয়া নাকি বড় সুন্দরী। বুঁদিয়া অল্প বয়সে বিধবা হইয়া পিতৃগৃহেই থাকিতেন, পিতা মাতাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, সুতরাং পিতা মাতারও বুঁদিয়া গত প্রাণ ছিল। শিউশরণের আর পুত্র কন্যা নাই, সুতরাং বুঁদিয়ার মৃত্যুতে তাঁহারা যে দারুণ শোক পাইয়াছেন তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে কেন? শিউশরণের দুঃখে আজি সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। তাই আজ সকলের মুখেই বুঁদিয়ার কথা। যেখানে দুই জন লোক একত্র হইয়াছেন, সেই খানেই তাঁহার কথা। কেহ পাষণ্ড হত্যাকাণ্ডের কথা কহিতেছেন, কেহ তাহার পিতা মাতার কি দারুণ শোক উপস্থিত হইয়াছে তাহাই ভাবিতেছেন। কেহ বা বলিতেছেন "বুঁদিয়া বড় সুন্দরী ছিলেন," এই শ্রেণীর লোকই অধিক। রূপবতী বুঁদিয়ার রূপের কথা আজ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যখন তারকেশ্বরে নবীন এলোকেশী ঘটিত মোকদ্দমা হয় তখন সেই মৃত এলোকেশীর রূপের যেমন বাহবা উঠিয়াছিল, আজি আবার ঠিক তাহাই হইয়াছে। বুঁদিয়া বস্তুতঃ তত সুন্দরী ছিলেন কিনা, এ সময়ে আমরা সে সম্বন্ধে কোন কথা কহিব না।

সকলের মুখে আজ বুঁদিয়ার কথা। দয়ার অবতার শ্যাম নীরদ নিজের ও সংগৃহীত অর্থব্যয় করিয়া এই দূর দেশে আসিয়া যে দিন দিন রাশি রাশি লোককে আহার্য্য দিয়া প্রাণ দান করিতেন, সে শ্যামনীরদের কথা বড় একটা শুনা যায় না। কিন্তু বুঁদিয়ার কথা আবাল বৃদ্ধে কহিতেছেন।

চঞ্চলা বুঁদিয়ার প্রশংসা শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। মনে করিলেন যাই না, এখন ত ঘর খোলা। শিউশরণ সেখানে আছেন এই সময় একবার বুঁদিয়ার রূপ রাশি দেখিয়া আসিনা। রমণী মহলে রমণীরূপের নিখুঁত প্রতিষ্ঠা লাভ বড় সহজ কথা নয়। খুঁত ধরিতে অমন আর

নাই। আজি রূপের খুঁত ধরিতে চঞ্চলা সন্ধ্যার সময় বুঁদিয়াকে দেখিতে চলিলেন।

যাইয়া দেখেন ঘর খোলা আছে বটে, কিন্তু শিউশরণ ঘরের বাহিরে কাঁদিতেছেন। চঞ্চলা ধীরে সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তুইটী শব স্থাপিত, অঙ্গে আচ্ছাদন নাই, জানালা উন্মুক্ত। বোধ হয় বাতাস লাগিয়া যাহাতে শীঘ্র মৃতদেহ নষ্ট না হয়, সেই অভিপ্রায়ে এইরূপ করা হইয়াছে। জানালায় লোহার রেল তায় লোহার জাফরী।

চঞ্চলা ধীরে ধীরে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজাটী ঠেসাইয়া দিলেন। তখন মৃদু আলোক সাহায্যে নির্নিমেষ লোচনে বুঁদিয়াকে দেখিতে লাগিলেন। বুঁদিয়ার দেহ ত ছিন্ন বিছিন্ন হয় নাই। যেমন তেমনি আছে, তবে অনেক অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন আছে। বুঁদিয়ার চক্ষু নিমীলিত, গায়ের বর্ণ খুব গৌর। চঞ্চলা প্রথমেই বলিলেন "বুঁদিয়া খুব ফরসা নয়, রক্তহীনতার জন্যই এমন দেখাইতেছে।" তাহার পর বলিলেন "চুলটী বেশ বটে, কিন্তু ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নয়, কপাল ছোট হইলেও মধ্যস্থলটী কিছু উচু। নাক টিকল বটে, কিন্তু ডগাটী কিছু মোটা। ঠোঁট তুটী বেশ পাতলা বটে,—চক্ষু যেমন করিয়া বুঝিব—লোকে যে বলে বড় খাসা চক্ষু" চঞ্চলা ক্ষণেক নিস্তব্ধথাকিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু পল্লব সরাইলেন, বলিলেন "ইস্ তাইত চোখ বড় সরেস বটে। কোমরটী বড় সরু। ওটা টেনে টেনে কাপড় পর্‌লে হয়। নিতম্ব—" চঞ্চলার আর কথা বাহির হইল না, কিন্তু একটী দীর্ঘ নিশ্বাস বহিল।

সাব্যস্ত হইল বুঁদিয়া মন্দ নয়, তবে যত ডাক উঠিতেছে তত ভালও নয়। ভালই হউক আর মন্দই হউক চঞ্চলার আবার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস বহিল। কেন? চঞ্চলা কি কুৎসিতা? চঞ্চল বুঁদিয়া অপেক্ষা কম রূপবতী হইলেও চঞ্চলার দীর্ঘ নিশ্বাস কেন?—দীর্ঘ নিশ্বাস চঞ্চলার বুঁদিয়ার মত সুন্দরী নন্ এই ভাবিয়া বুঝি। আমরা পুরুষ, রমণী চরিত্র ভাল বুঝি না। পাঠিকা হয় ত তাহা বুঝিবেন।

তখন শ্যামনীবদের দিকে দৃষ্টি পড়িল। আহা সে সুন্দর দেহখানি আজি কোথায় পড়িয়া আছে। চঞ্চলা ভাবিলেন "আজি বিদেশে বিধি বিপাকে কি ঘটনাই ঘটিল। এ সংবাদ পাইলে না জানি তাঁহার জনক জননী কি করিবেন। শ্যামনীবদের কি বিবাহ হয় নাই?" চঞ্চলার চিন্তা থামিল, ভাবিলেন "হওয়াই সম্ভব, যদি হইয়া থাকে তবে না জানি"—আর ভাবিতে

পারিলেন না। তাঁহার নয়ন কোণে বারি বিন্দু দেখা দিল। তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সেই অনিন্দ্য রূপরাশি আবার দেখিতে লাগিলেন। বেলা আর নাই, আর ভাল দেখা যায় না—তথাপি দেখিতে লাগিলেন, আহা কে বলে শ্যামনীরদ" মৃত? দেখিলে যেন নিদ্রিত বলিয়া মনে হয়। দেহের সর্ব্বত্র রূপরাশি যে এখনও উছলিয়া উঠিতেছে। তখন চঞ্চলা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "সব ভাল—সংসারের মরাটাই কেমন কেমন।"

চঞ্চলা মুখ ফিরাইলেন, ধীর পাদবিক্ষেপে যেন কত বিমর্ষ চিত্তে দরজার নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু এ কি দোয়ার খোলা যায় না কেন?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এ আবার কি?

ব্যাপার আর বুঝিতে বাকি রহিল না। চঞ্চলাকে সেই কক্ষ মধ্যে কেহ প্রবেশ করিতে না দেখিয়া তাহারা দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ। চঞ্চলা দুই হস্তে সজোরে দ্বারে আঘাত করিলেন, চিৎকার করিয়া ডাকিলেন। কিন্তু কোন ফল দর্শিল না। কাহারও উত্তর পাওয়া গেল না, কেবল মাত্র মনে হইল যে সেই চিৎকার শব্দে যেন মৃতগণ তাহাদের শয্যা হইতে বিদ্রূপ সূচক শব্দ করিয়া তাহার প্রতিউত্তর দিতেছে। চঞ্চলা জানুপাতিয়া বসিয়া পড়িয়া আপন হস্তদ্বারা চক্ষুদ্বয় আবরণ করিলেন। প্রাণ যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল, ইচ্ছা হইল আবার চিৎকার করেন কিন্তু সে ক্ষমতা হইল না, মুখ যেন কে চাপিয়া ধরিল।

এখন উপায় কি? এই খানে কি সমস্ত রাত্রি থাকিতে হইবে? বাটীতে তাঁহার খোঁজ হইতে পারে কিন্তু কে জানিবে যে চঞ্চলা এ হেন স্থানে বন্দিনী হইয়াছেন। এখানে রাত্রি বাস অসম্ভব কিন্তু বাহির হওয়া যে আরও অসম্ভব।

চঞ্চলা নির্ভীক হৃদয়ে রোগীর সেবা করেন, সকলে তাঁহার সাহসের প্রশংসা করেন। চঞ্চলা কখন কখন নিজ মুখে বলিতেন যে কিছুতে তাঁহার ভয় হয় না। ভয় আবার কি? কিন্তু এরূপ ঘটনার কথা যে কখন স্বপ্নেও মনে হয় নাই। ঘরের মাঝে বন্ধু বান্ধব পরিবৃত হইয়া সাহস প্রকাশ করা

এক, আর মৃতের সহিত রাত্রি যাপন করা অন্যরূপ। একথা চঞ্চলা পূর্ব্বে কখন ভাবেন নাই। চঞ্চলা মনে করিলেন "তাহারা কি ভাগ্যধর যাঁহারা বিপদ পাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, আর ভীতির কারণ তিরোহিত হইলে জ্ঞানের সঞ্চার হয়।" হায় আজ যদি সেই স্থানে চঞ্চলা নিদ্রিতা হইতে পারিতেন সে নিদ্রা যদি চির নিদ্রাও হইত, আব যদি কখন জাগিতেও না হইত তাহাও যে ভাল ছিল, চঞ্চলার যে তাহাতেও মহা আনন্দ হইত; কিন্তু তাহা হয় কই।

চঞ্চলা অন্য মনস্কা হইবার চেষ্টা করিলেন। ডাক্তার সাহেব, বাপ, মা ভাই, ভগ্নী প্রভৃতি কত লোকের কত কথা ভাবিয়া অন্য মনস্কা হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা কি হইবার? সে সকল তখনই হৃদয় হইতে দূরে যায় আর কেবল মনে হয় বুঁদিয়ার সেই ক্ষত বিক্ষত দেহ, আর সেই প্রশান্ত নয়ন। চঞ্চলার সাহস ছিল, না থাকিলে বুঁদিয়ার চক্ষু চিরিয়া দেখিতে পারিতেন না কিন্তু সে সাহস আর নাই—এখন থাকিয়া থাকিয়া সেই চক্ষুই মনে পড়িতেছে, আর সেই শ্যামনীরদ বাবুর মুখখানি। উঃ। প্রাণ যে শিহরিয়া উঠে, একি ভীষণ অবস্থা!

চঞ্চলা উৎকর্ণা হইয়া আছেন, সদাই মনে হইতেছে যেন কিসের বুঝি শব্দ হইতেছে, ঐ বুঝি মৃতকায়া গুলি নড়িতেছে। ঐ—ঐ বুঝি পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে তাহাদের শীতল হস্ত অর্পিত হইতেছে। বাপ্‌রে আর যে সহ্য হয় না। দুই একবার মনে হইতেছে হয়ত তাহাকে কেহ এ দিকে আসিতে দেখিয়া থাকিবে হয়ত কেহ খুঁজিতে আসিবে, কিন্তু ক্রমে সে আশাও গেল।

টং করিয়া কিসের শব্দ হইল। এক দুই-তিন করিয়া ৮ টা পর্য্যন্ত হাঁসপাতালের পেটা ঘড়িতে বাজিল। বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। কুল্লে আটটা!

তাহার পর কি হইল তাহা চঞ্চলা অবগত নহেন। সহসা যেন চমক্‌ ভাঙ্গিল। তখন ঘরে বেশ চন্দ্রালোক প্রবেশ করিয়াছে। ঝুর্ ঝুর্ করিয়া দক্ষিণের বাতায়ন দিয়া বাতাস বহিতেছে। ইচ্ছা নয় যে সে শব দেহের দিকে তাকান, কিন্তু পোড়া চক্ষু আগে সেই দিকেই যায়। বুঁদিয়ার আলুলায়িত কেশদাম যে উড়িতেছে। শ্যামনীরদ বাবুর মুখমণ্ডল যে চন্দ্রালোকে প্রদীপ্ত।

এমন সময় কে যেন কাতর কণ্ঠে "আঃ, মা;" করিয়া উঠিল। একি? কিসের শব্দ? শব্দ জানালার নিকট হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হইল, তবে সেখানে কেহ আছে নাকি? কিন্তু সেখানে

যাইবেন কি করিয়া। যাইতে হইলে সেই শব দুইটীর মধ্যস্থল দিয়া যে যাইতে হয়। কিন্তু না যাইয়া আর যে থাকা যায় না। এ যে মনুষ্য কণ্ঠ, আর যে কণ্ঠ স্বর প্রত্যহ শুনা যায় আজি তাহাই কত যেন মিষ্ট শুনাইল!

চঞ্চলা বলিলেন "কে ও?"

কোন উত্তর নাই। আবার কাতর ধ্বনিতে কে বলিল "উঃ।"

আর কি সন্দেহ আছে। চঞ্চলা জানালার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কাহার হস্ত তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিল, কি সর্ব্বনাশ এ যে শ্যামনীরদ বাবুর হাত। মরা মানুষ হাত বাহির করিয়া চঞ্চলাকে ধরিতেছে। জ্ঞান আর থাকিবার কথা নয় কিন্তু যায় না কেন? এ দৃশ্য—এ ভয়ানক দৃশ্য যে আর দেখা যায় না। মৃত্যু যে ইহা অপেক্ষা শতাংশে শ্রেষ্ঠ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দামিনী বিকাশ।

চঞ্চলা নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইলেন, মনে হইলে তাঁহার কেশদাম যেন কণ্টকিত হইয়াছে। কি সর্ব্বনাশ মরা মানুষ হাত বাহির করিয়াছে! তখন মৃত ব্যক্তির বদন প্রতি দৃষ্টি পড়িল, দেখা গেল যে তাঁহার নয়ন দুটী বিস্তারিত করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। সেই ভ্রমর কৃষ্ণ তারা দুটী তাহারই দিকে স্থির দৃষ্টে রহিয়াছে।

এই কি তবে দানো পাওয়া? বাঙ্গালীর মেয়ে শিক্ষা পাইলেও আগে সে কথা মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু তখন শ্যামনীরদ বাবু বলিলেন "আমি কোথায়?"

চঞ্চলার চট্‌কা ভাঙ্গিল। চঞ্চলা বুঝিলেন তবে শ্যামনীরদ বাবু মরেন নাই। মস্তিষ্কের বিকৃত ভাবই মৃত্যু লক্ষণের কারণ। মনে সাহস হইল, শিক্ষার কথঞ্চিৎ ফল ফলিল, সাহসে ভর করিয়া জড়িত স্বরে বলিলেন "ভয় নাই।"

শ্যাম। আমি কোথায়?

সে পরিচয় দিলে হয়ত তিনি বাঁচিবেন না, সুতরাং চঞ্চলা প্রকারান্তরে বলিলেন, "গৃহ মধ্যে।"

শ্যাম। আপনি কে?

চঞ্চলা। শুশ্রূষা কারিণী।

শ্যাম। একি হাঁসপাতাল?

চঞ্চলা। হ্যাঁ।

শ্যাম। অন্ধকার কেন?

চঞ্চলা। আলো নিবিয়া গিয়াছে।

শ্যাম। জ্বালিবার উপায় আছে কি?

চঞ্চলা। না।

শ্যাম। আমি যে আর অন্ধকারে থাকিতে পারিতেছি না। প্রাণ যে কেমন করিতেছে।

চঞ্চলা। ভয় কি?

শ্যাম। আমি তবে মরি নাই।

চঞ্চলা। না।

শ্যাম। শিউশরণের কন্যার অবস্থা কি?

চঞ্চলার হৃদয় প্রকৃতই চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনে হইল তাহার সহিত কোন প্রকার গুপ্ত প্রণয় ছিল নাকি?

চঞ্চলা কোন উত্তর দিলেন না।

শ্যামনীরদ বাবু আবার বলিলেন "আমি যে তাঁহার অতি শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াছি, আপনি কোন সংবাদ জানেন না?"

চঞ্চলা তখন বুঁদিয়ার দেহ খানি আড়াল করিয়া দাড়াইয়া বলিল 'না।"

শ্যামনীরদ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

চঞ্চলা বলিলেন "আপনি একটু স্থির হন।"

শ্যাম। আমার বড় গরম হইতেছে, ঘরের দরজাটা খুলিয়া দিতে পারেন?

চঞ্চলা। প্রাতে খুলিয়া দিব,—এখন নয়।

শ্যাম। কিসের গন্ধ আসিতেছে?

বুঁদিয়ার দেহ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল। চঞ্চলা সে কথা গোপন করিয়া বলিলেন "ঠিক বলিতে পারি না।"

শ্যাম। আমি একবার উঠিয়া বসিব কি?

চঞ্চলা এতক্ষণ শ্যামনীরদ বাবুর নাড়ী পরীক্ষা করিতেছিলেন, দেখিলেন, নাড়ীর অবস্থা মন্দ নয়, দেহও উষ্ণ হইয়াছে। তিনি সানন্দিত চিত্তে

বলিলেন "আমি বাতাস করিতেছি আপনি শুইয়া থাকুন, ডাক্তার বাবু আপনাকে উঠিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

এই বলিয়া স্বীয় বসনাঞ্চল দ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন।

শ্যামনীরদ বিরক্তিসহ বলিলেন "ডাক্তার,—ডাক্তারে সকলই বলে, আর তাহাদের কথা শুনিতে গেলে সংসারে বাস করা চলে না।"

চঞ্চলা। তাঁহারা কি অন্যায় বলেন?

শ্যাম। অনেক সময়। মুখের কথা বলা বইত নয়।

চঞ্চলা। অধিকাংশ সময়ই ঠিক বলেন।

শ্যাম। তাহা হইলেও আমি যে আর শুইয়া থাকিতে পারি না।

চঞ্চলা। রাত্রিটা কোন গতিকে যাক তাহার পর যাহা হয় হইবে।

শ্যামনীরদ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "কাল আমি বিদায় পাইব কি?"

চঞ্চলা। তাহা কি সম্ভব।

শ্যাম। তাহা হইলে চলিবে কেন, আমার মুখ চাহিয়া যে শত শত নর নারী রহিয়াছে। কে তাহাদের আহার দিবে?

কথা শুনিয়া চঞ্চলার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। মনে মনে বলিলেন "ভগবান উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন,—এমন লোক অকালে মরিলে দেশ যে হাহাকারে পূর্ণ হইবে। প্রকাশ্যে বলিলেন "তাহার ব্যবস্থা করা যাইবে।"

যুবক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি আবার নিদ্রাভিভূত হইলেন। চঞ্চলার আবার কেমন ভয় হইল ভাবিলেন "আবার মোহ হইল না ত?" তখন তিনি ভাল করিয়া শ্যামনীরদ বাবুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিতে লাগিলেন, দেখিলেন নিশ্বাস বেশ বহিতেছে। চঞ্চলার আজি আর আনন্দ ধরে না। চঞ্চলা ভাবিলেন "তিনি না থাকিলে আজ কি শ্যামনীরদ বাবু বাঁচিতেন? হয় ত আবার পড়িয়া যাইতেন, বুঁদিয়াকে দেখিয়া ভয় পাইতেন, আবার মূর্চ্ছিত হইতেন—সেই মূর্চ্ছাই হয়ত শেষ মূর্চ্ছা হইত।

ধীরে ধীরে প্রভাতের মৃদু মধুর সমীরণ প্রবাহিত হইল সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির ঘোরান্ধকার ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়া আসিল, আবার আকাশ পূর্ণ শশধরের মৃদু বিকাশ হইল। গৃহমধ্যে বেশ আলোক দেখা দিল। চঞ্চলা তখন তন্ময়ভাবে কি ভাবিতে ছিলেন, কিন্তু তখনি সে চিন্তা গেল, প্রকৃতির

অবাধ সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। মনে হইল এমন সুন্দর, এমন মধুর আনন্দপ্রদ প্রভাত ত আর কখন দেখি নাই। পাখির এমন সুমিষ্ট কণ্ঠ ত আর কখন শুনি নাই!

যে বদন প্রতি তাকাইতে ইচ্ছা হয় নাই, এখন সেই বদন প্রতি চঞ্চলা স্থির দৃষ্টে চাহিয়া আছেন। কি মুখ ভাব—কি নাসা, কি চক্ষু, কি ওষ্ঠ যুগল, আর কি সুন্দর ঘন কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম, দেহের গঠন পারিপাট্যই বা কি মনোহর। চঞ্চলা মনে মনে বলিলেন "দস্যু তোদের কি চক্ষু ছিল না, দয়া মায়া ছিল না, এহেন সৌন্দর্য্য রাশির বিলোপ সাধনে যে যত্নপর—সে নিষ্ঠুর, রাক্ষস—পিশাচ—তাহার অসাধ্য কাজ এ জগতে আর নাই।"

চঞ্চলা আরও ভাবিতে লাগিলেন "পাপের শাস্তি আছেই আছে। যাহারা এহেন হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল তাহাদের কি সাজা হইবে না? হইবে বই কি?"

এমন সময় ঘড়িতে টং টং করিয়া ৬টা বাজিল। চঞ্চলা ভাবিলেন আর কি এইবার এই ভয়ঙ্কর কারাগার হইতে মুক্ত হইব।

চঞ্চলার দুরাশার অন্ধকার হৃদয়ে আশার দামিনী যেন হাসিয়া উঠিল, তাঁহার দেহে যেন ক্ষণে ক্ষণে প্রাণের সঞ্চার হইল

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

ক্রমে সূর্য্য রশ্মি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন চঞ্চলার আর আনন্দের সীমা নাই, আনন্দের কথা বটে, প্রথমতঃ নিজে এই ভয়ঙ্কর স্থান হইতে ত্রাণ পাইবেন, দ্বিতীয়তঃ শ্রীমনীরদের সুচিকিৎসা হইবে। কার্য্যেও তাহাই ঘটিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। চঞ্চলাকে দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে কহিল "আপনি এখানে?"

"কাল তোমারাইত দ্বার বন্ধ করিয়া গিয়াছিলে।"

"আমরা জানতাম না মা।"

"তা জানি।"

"কাল সারারাত আমরা আপনার অনুসন্ধান করেছি। শীঘ্র ঘরে চলুন, আপনার জন্য সকলেই ভাবচেন।"

"যাব, কিন্তু একটা কাজ কর।"

"কি ?"

"একটা পাল্কী নিয়ে এস। আর ডাক্তার বাবুকে শীঘ্র এখানে পাঠিয়ে দাও।"

তাহাদের মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ প্রতিপালন কবিতে ছুটিল।

ডাক্তার বাবু আসিলেন, শ্যামনীরদ বাবুর অবস্থা শুনিলেন। যতদুর বিস্মিত হইবার তাহা হইলেন। তখন শ্যামনীরদ বাবুকে চঞ্চলার বাসায় লইয়া যাওয়া হইল। চিকিৎসা যতদূর হইবার তাহা হইল। ডাক্তার বাবু বিশেষ যত্ন সহকারে শ্যামনীবদ বাবুর চিকিৎসা করিলেন এবং যে সকল মৃত্যু লক্ষণ পরিদৃশ্যমান হইয়াছিল তদসম্বন্ধে মনোমধ্যে অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। চঞ্চলা ডাক্তাব বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন " আপনি কাল ইহাকে প্রকৃতই দেখিয়াছিলেন কি ?"

ডাক্তার। দেখিয়া ছিলাম বই কি ?

চঞ্চলা। অঙ্গে হাত দিয়া দেখিয়া ছিলেন কি ?

ডাক্তার। তাহা না দিলে লাস প্রকৃত পচিতে আরম্ভ হইয়াছে কিনা তাহা কি করিয়া বুঝিতাম।

চঞ্চলা। জীবনেব কোন লক্ষণ ছিল না কি ?

ডাক্তার। কিছু মাত্র না।

ডাক্তার বাবু ধর্ম্মনিষ্ঠ, মনে মনে বলিলেন "কাল শব পরীক্ষা না করায় ঈশ্বর আমায় বড় রক্ষা করিবাছেন। হয়ত একটী জীবিত ব্যক্তিকে চিরিয়া ফেলিতাম।" এই ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাঁহার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস বহিল, আবার ভাবিলেন "এমন যে আব কখন হয় নাই তাই বা কেমন করিয়া বলিব।"

শ্যামনীরদ বাবু অল্প আরোগ্য লাভ করিবা মাত্র আবার যাইয়া অন্ন ছত্রের কার্য্যে যোগদান করিলেন, প্রাণ পুরিয়া সাধ্যানুসারে সেই দুঃস্থ ব্যক্তিদের দুঃখ অপনোদনে যত্নবান হইলেন। দরিদ্রেরা তাঁহাকে অশ্রুপূর্ণ লোচনে দলে দলে দেখিতে আসিতে লাগিল এবং বাহু তুলিয়া সেই সর্ব্বভয়ত্রাতা বিপদভঞ্জন ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

হত্যাকারীরা ধৃত হইল বটে কিন্তু শ্যামনীরদ বাবু কাহাকেও চিনিতে না পারায় তাহারা দায়রাব বিচারে অব্যাহতি পাইল। ইহাতেও শ্যামনীরদের আনন্দ, তাঁহার ভয় ছিল পাছে তাঁহার ভ্রমে কোন নির্দ্দোষী ব্যক্তি শাস্তি পায়। সংসারে এ ভয় কয়জনার আছে ?

ইহার কিছুদিন পরে এক দিন চঞ্চলা আপন বাসার একটী কক্ষ মধ্যস্থ বাতায়ন পথে বসিয়া আকাশ পানে চাহিয়া আছেন। আকাশ যেমন তেমনি আছে, কিন্তু তথাপি চঞ্চলার সেই দিকে স্থির দৃষ্টি। কেহ দেখিলে ভাবিতেন তিনি আকাশে একাগ্র চিত্তে কি দেখিতেছেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কিছুই দেখিতে ছিলেন না। এমন সময় তথায় শ্যামনীরদ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন, চঞ্চলা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া চঞ্চলার সেই অপরূপ রূপরাশি নির্নিমেষ লোচনে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই রাত্রের কথা মনে পড়িল। অমনি চক্ষু দুটী অশ্রুনীরে পূর্ণ হইল। তিনি চক্ষের জল মুছিয়া ডাকিলেন "চঞ্চলা ?"

চঞ্চলা চমকিয়া উঠিলেন। স্থির দৃষ্টে শ্যামনীরদ বাবুর দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আমি আন্‌মনা ছিলাম, আপনাকে দেখিতে পাই নাই। আসুন।"

শ্যামনীরদ বাবু উপবেশন করিলে, চঞ্চলা বলিলেন "এখন ভাল আছেন ?"

শ্যাম। বেশ আছি।

চঞ্চলা। দুর্ভিক্ষ আর নাই বোধ হয়।

শ্যাম। ঈশ্বরেচ্ছায় এখন নাই।

চঞ্চলা। আপনি তবে নিশ্চিন্ত।

শ্যাম। আপাততঃ বটে।

চঞ্চলা। তবে দিন কতক এখানে থাকুন।

শ্যাম। এত ঘর থাকিলেই হইল

চঞ্চলা মস্তকটী ঈষৎ অবনত করিয়া বলিল "আপনি কি তাই ভাবেন ?"

শ্যাম। ভাবি বই কি, কিন্তু তুমি ভাব না।

চঞ্চলা। কেন ?

তখন শ্যামনীরদ বাবু বলিলেন "তাহা হইলে কিছুই কি নিতে নাই, বাবা কত দুঃখ করেন, তাই আবার বলি "হাঁ চঞ্চলা আমি কি পর ?"

চঞ্চলার দৃষ্টি ভূমির দিকে সংলগ্ন হইল, গণ্ডস্থল রক্তাভ হইল। কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

তখন শ্যামনীরদ বাবু বুকপকেট হইতে এক ছড়া মূল্যবান মুক্তার মালা বাহির করিয়া চঞ্চলার গলায় পরাইয়া দিলেন, বলিলেন "তুমি আমার জীবন দান দিয়াছ, তার তুলনায় এ অতি তুচ্ছ।"

চঞ্চলা এবার কাঁদিয়া ফেলিলেন।

তখন শ্যামনীরদ বাবু চঞ্চলার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিলেন "চঞ্চলা—চঞ্চলা।"

চঞ্চলা আবার তাঁহার দিকে চাহিলেন। শ্যামনীরদ বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "তুমি কেন কাঁদিলে জানি।"

চঞ্চলা ঘাড়টী হেঁট করিয়া বলিলেন "তবে কাঁদান কেন ?"

শ্যামনীরদ বাবু তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া নয়নের নীহার-মালা চুম্বন করিয়া বলিলেন "আর কাঁদাব না, বাবার মত করেছি।"

চঞ্চলা যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। শ্যামনীরদ বাবু যাহা বলিলেন কার্য্যেও তাহাই হইল। চঞ্চলা তাঁহার প্রাণাধিকা পত্নী হইলেন !

সমাপ্ত।

নারী-সঙ্গীত।

(১)

যে কুলে সাবিত্রী সীতা,
দময়ন্তী পতিরতা,
আজিও পূজিত সবাকার।
জননী ভগিনী জায়া,
মূর্ত্তিমতী স্নেহমায়া,
দুহিতা মায়ার অবতার।
সে নারীর স্তুতি গান,
কি আর গাহিবে প্রাণ,
সে গান যে মধুর অমিয়া,
নামে যার স্নিগ্ধ হয় হিয়া!

(২)

পুরুষ কঠিন, কিন্তু প্রকৃতি কোমলা,
একাধারে বিরাজিত,
তাই প্রাণ তিরপিত,
নতুবা অসহ্য যেন প্রখর তপন,
নর নারী উভয়ের তাই সে মিলন।
পুরুষ প্রকৃতি সনে,
গাঁথা যেন এক প্রাণে,
এক প্রাণে—দুই দেহ যেন,
এক প্রাণে পরাণ মিশান!

(৩)

যেখানে রমণী নাই,
সে বড় নিঠুর ঠাঁই,
কোমলতা রমণীর নাম,
যেখানে সুন্দর যাহা,
সেই নারী, সেই মায়া,
এ জগতে নারীই আরাম।

(৪)

পূর্ণিমার শশী শোভ',
নীরদে দামিনী প্রভা,
নিদাঘ তরুর ছায়া তৃষার সলিল,
আমার তারকা হার,
বৃক্ষে পুষ্প সুকুমার,
রমণী মাধুরীময় বসন্ত অনীল।

(৫)

ভীষণ কঠিন ভবে, কি থাকিত তবে,
নারী যদি না হ'ত সৃজিত,
তাপ দগ্ধ পুরুষ জীবন,
সদা হইত দহিত।
সাহারার দুর্জ্জয় পবন
স্নিগ্ধ তার কাছে,
নারী শূন্য বৃথা জীবন,
সুখ আশা মিছে।

(৬)

বিশাল আকাশ তুচ্ছ মনে,
রমণীর স্নেহ মায়া সনে,
কত যেন প্রাণ বেড়ে যায়,
ভালবাসা সুখ-কল্পনায়,
জেগে উঠে কত সুখ চিতে,
স্বর্গ শোভা হেরি অবনীতে।

(৭)

ফলে ফুলে হেরি যাহা,
লতায় পাতায় তাহা,
মহিরুহে দোলে লতা বিলাস বিভোরে,
আঁধারে চাঁদিমা খেলে,
বাতাসেতে ফুল দোলে,
গিরিবরে সংগোপনে নির্ঝরিণী ঝরে।

পুরুষ প্রকৃতি সতি,
রত্নাকর বসুমতি,
সবাই তুষ্ট, সবে সুখী নারীর মিলনে,
সুখ-শান্তি-স্বরূপিণী রমণী ভুবনে।*

(৮)

কারে বলে যোগ? আর তপস্যা কোথায়?
নারী সেবি পায় নর যেবা যাহা চায়।
জননীর শ্রীচরণ,
সে যে রে অমূল্য ধন,
দেশান্তরে যাবে কেন তপস্যার তরে,
প্রত্যক্ষ দেবতা তব বিরাজিত ঘরে!
যেখানে প্রেমের সৃষ্টি,
অপার করুণা বৃষ্টি,
বিনা সাধনায় সিদ্ধি সেখানে আবার।
তাই বলি রমণীই দেবী অবতার!

(৯)

পূজ নর, পূজ মন দিয়া,
সাধনায় সিদ্ধ কর হিয়া,
চাও প্রেম পাবে তাহা,
পাবে শান্তি পাবে মায়া,
পাবে করুণার ধারা অমৃত জিনিয়া,
চাও মুক্তি পূজ নারী, জননী ভাবিয়া।
সুধা মাখা "মা মা" বাণি,
যেন অমৃতের খনি,
মা-র নাম ভুলনা হেলায়,
অখিলের অতুল সহায়।

(১০)

নারী না থাকিলে পরে, কবির কল্পনা,
হ'ত না বিকাশ।

না জন্মিত সেক্ষপীর,
বহিত না প্রেমনীর;
জন্মিত না বিদ্যাপতি,
জন্মিত না ভবভূতি,
জন্মিত না সকলের প্রিয় কালিদাস।
সংসারে সুন্দর যাহা,
হারাত মানব তাহা
বাতাসে উড়িয়া যেত কল্পনার নাম,
কবির স্ফূরণ পেত অনন্ত বিরাম।

(১১)

কোথা পেতে বঙ্কিমের তর তর ভাষা,
কেমনে মিটাত মধু প্রাণের পিপাসা।
কেমনে গাহিত হেম,
দেখা যেত বিনা প্রেম,
দেখা যেত নবীনের ছাঁচুনির ছটা,
দেখা যেত অক্ষয়ের তাস খেলা ঘটা।
নারী হীন এ সংসার,
হতো যেন অন্ধকার,
কি ছাই পড়িতে নর, হইতে নিরাশ,
রহিত জ্ঞানের তিন ভাগ অপ্রকাশ!

(১২)

নারী না থাকিলে পরে—দয়ার কল্পনা
জানিত না নরে,
না থাকিত মর্ত্তভূমে—সুখের বাসনা
হৃদয় মাঝারে।
হ'ত তাহা মরুভূম মত,
বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, তৃণ হীন,
হ'ত তাহা আঁধারে নিহত,
অমানিশা মতন মলিন।

(১৩)

আকাশে উদিত ভানু ছায়া না থাকিত,
থাকিত কুসুম, কিন্তু সুবাস বঞ্চিত।
বিকট দামিনী হাসি মাধুরী বিহীন,
থাকিত বিমানে, কিন্তু তারা শোভা হীন।
নিথর জাহ্নবী স্রোত বহিত না আর,
তরঙ্গের প্রতিঘাত হ'ত অনিবার,
কুলায় থাকিত পাখি, নিরব ঝঙ্কার
প্রাবৃটে বহিত বারি শোণিতের ধার,
কারুণ্য বিহীন নর রাক্ষসের প্রাণ,
অশান্তি তাড়নে ঘুরে বেড়াত সবার।

(১৪)

বুঝিবে না বুঝিবে না তুমি,
হারায়েছে হৃদয়ের বল,
হারায়েছ উচ্চ-আশা যত—
ভিকতাই করেছ সম্বল।
দাসত্বই জীবনের আশা,
দাস্যবৃত্তি বীরত্ব তোমার,
অনুগতে নিষ্ঠুরতা তব,
মহিমার বিপুল প্রচার।
অবিশ্বাসী আত্মীয়ের কাছে,
অবিশ্বাসী রাজার দুয়ারে,
হীন প্রাণে হীনতার মত
জাগে সদা হৃদয় মাঝারে।
সে দিনের পরাজিত শিখ,
ইংরাজের সমর সহায়।
তুমি শুধু সে সুখে বঞ্চিত,
হৃদয়ের ভীরুতার দায়।
আঁধার জীবন তার,
সুখ হীন অনিবার,

যে হৃদয়ে করে না বিহার,
রমণী সুধাংশু মরি—করুণা অপার !

(১৫)

দূরে যাক বীরের বারতা,
বলি ভীরু শুন তবে ভাই,
সেই দিন সেই ক্ষণ,
প্রাণ যবে উচাটন
রোগে শোকে হইয়া আকুল,
বসিয়া শিয়র দেশে,
প্রিয়ে যবে তব পাশে,
লভ কিবা আনন্দ অতুল !

(১৬)

সারা দিন দাসত্ব যাতনা—
সহি যবে এস ফিরে ঘরে
জননীর অতুল যতনে,
কিবা সুখ লভবে অন্তরে ?
প্রেয়সীর সুধা সিক্ত হাসি -
মরমেতে গেঁথে যেন যায়,
অসার ক্ষণিক প্রাণ যেন—
স্বরগের উদ্দেশেতে ধায় !

(১৭)

জননীর স্নেহ মায়া অক্ষয় রতন, -
নিখিল মাঝারে,
সেই সুখী ভাগ্যধর জন,—
মাতা যার বিরাজে সংসারে।

(১৮)

মনে পড়ে বাল্য কাল, তব স্নেহ মায়া,
মনে পড়ে জননী গো, তোমার যতন ;
মনে পড়ে শৈশবের সেই সুখ ছায়া,
দুঃখের অবনী মাঝে স্বরগ স্বপন।

(১৯)

সকলে স্বার্থের দাস স্বার্থ ভরা মন,
জগতের যত জন স্বার্থ সবে মাগে,
কিন্তু জানি হায় তব স্নেহ ভরা মন,
নিঃস্বার্থ ভাবেতে ভরা স্নেহ অনুরাগে।

(২০)

রে বিধাতঃ কর মোরে বালক আবার,
জননী কোমল কোলে,
পশি গিয়ে কুতূহলে,
কুটিল সংসার মায়া ভুলি দুঃখ তার।
জ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ
প্রতিভার ক্ষর ভাতি,
চাহি নাক, কর মোরে অজ্ঞান আবার,
নাচি হাসি খেলা করি কোলে গিয়ে মার।

(২১)

না না তা হবে না আর;
সে দিন হয়েছে গত,
ইহ জনমের মত,
এখন সহিতে হবে অদৃষ্ট তাড়না,
সহিতে হইবে শত সংসার যাতনা।
দুরাশার ঝঞ্ঝাবাতে,
শত ঘাত প্রতিঘাতে,
সহিব মনেতে কত মনের বেদনা,
রহিবে মনেতে তাহা পরে জানিবে না।

(২২)

মরি মরি একি হেরি পুন ;—
মায়ের মমতা নিয়ে,
কে তুষিতে চায় হিয়ে,
কে হাসে স্নেহের হাসি মায়ের মতন।

সেই স্নেহ যত্ন নিয়ে,
কে তুমি মা দেখা দিয়ে,
আবার মায়ার ফাঁদ করেছ সৃজন,
নবীন স্নেহের ডোরে করিয়া বন্ধন।
যায় দিবা নিশা আসে,
তাইত মা ডরি ত্রাসে,
নিশ্বাসে বিশ্বাস হীন এইত জীবন,
জলের বুদ্বুদ নিয়ে সংসার সৃজন।
তাই বলি মহামায়া,
আর দেখাওনা মায়া,
মায়ার মোহেতে মত্ত হয়েছে জীবন,
জননী মমতাময়ী দুহিতার মন।

(২৩)

স্নেহময়ী ভগিনী রতন,—
কারুণ্যের যেন অবতার,
ভাগ্য দোষে অলীক স্বপন,
সেই স্নেহ কল্পনার সার।

(২৪)

না না দূরে ধীকি ধীকি জ্বলে—
দুইটী রতন,
দুটী তারা যেন ক্ষপা পরে—
পবিত্র জীবন।
স্বরগের পবিত্রতা মাখা,
স্নেহ মায়া মূর্ত্তিমতী তায়,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে আঁকা,
সে মাধুরী নিজ প্রতিভায়।
সোদরা প্রতিমা মম,
স্নেহময়ী নিরুপম,
আছে দুটী জানি মনে মনে,
সুখী হই সে স্মৃতি স্মরণে।

(২৫)

অন্ধকার ঘন ঘটা ভরে,
ভাবি যবে ধরা শূন্যময়,
নিবিড় হৃদয়াকাশে,
ধীরে ধীরে পরকাশে,
সুখদ-নীরদ-সনে সুচারু শোভায়,
তুইটী বিজলী ছটা ভুলাতে আমায়।

(২৬)

যত কাল রহিবে জীবন,—
ধীরে নাচিবে ধমনী,
বিরাজিবে হৃদে অনুক্ষণ,—
তুটী ত্রিদিবের মণি।
হৃদয়েতে রহিবে সে স্মৃতি,—
যত দিন রহিবে এ প্রাণ,
রমণীর স্নেহ মায়া কত,—
মনে মনে করিব ধেযান।

(২৭)

সংসার অরির বাণে,
ত্রাহি ত্রাহি যবে প্রাণে,
পাইয়াছি একটী রতন,
পূত প্রণয়ের ধার,
জানি যার প্রেমাধার,
যার তরে বুঝিয়াছি নারীর যতন।

(২৮)

বুঝিয়াছি রমণীর ভালবাসা কত,
বুঝিয়াছি বমণীর প্রেমভরা চিত,
বুঝিয়াছি মনে সার
নারী সুখে এ সংসার
শ্বাপদ শঙ্কুল ভবে নারী মাত্র সার।

নারী প্রেম, নারী নিধি
যতনে গড়েছে বিধি
নর হৃদি বেদনার করুনা আধার,
রচনা মহিমা তাঁর করিতে প্রচার।

(২৯)

এস তবে প্রেম ভবে করি আলিঙ্গন,
অমিয় এ নারী গীতি করি সমাপন।
এক দৃষ্টে শূন্য মনে,
চাহি তোর মুখ পানে,
দেখি সেথা কত সুখ কত ভালবাসা,
কত মায়া কত স্নেহ কত সুখ আশা।
গোপনে রয়েছে আঁকা,
দেখি প্রিয়ে, দেখা দেখা,
কবির কল্পনা সেথা পশিতে না পায়,
গায়রে নীরব কবি, নীরব ভাষায়।

সমাপ্ত।

রমণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রমণীর প্রেম।

এ নশ্বর জগতে এমন কি পদার্থ আছে, যাহা সরল হৃদয় রমণীর অতুলনীয় প্রেমের সহিত তুলনা করা যায়? যে প্রণয়ের মধুময় উৎসে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া পুরুষ পার্থিব সুখের চরম সীমা সন্দর্শন করেন, যে প্রেম উপভোগে কুটিল বিশ্ব সংসারকে স্বর্গের সহিত তুলনীয় জ্ঞান করেন, যাহার মধুর আস্বাদনে জগতের যাবতীয় দুঃখ বিস্মৃত হইতে হয়, সে প্রণয়ের তুলনীয় বস্তু এ বিশ্ব সংসারে আর কোথায়?

রমণীর অতুলনীয় প্রেম পরায়ণ মানবের তুল্য ভাগ্যধর নর এ জগতে আর নাই। এসংসারে এমন প্রাণী নাই যে প্রণয়ের দাস নহে। প্রণয় মনুষ্যকে অন্ধ করে এবং প্রণয়ের জন্যই পুরুষ রমণীর এত অনুগত। সুতরাং রমণীর প্রেম জগতের অতুলনীয় বস্তু।

যে প্রেমের উৎসব বসন্তে, যে প্রেমে যুবক যুবতীর সন্তোষ, যে প্রেমে বৃদ্ধ যুবা, বর্ষিয়সী যুবতী, যে প্রেমে পুরুষ পাগল, রমণী জ্ঞান বিরহিতা, যে প্রেমে সংসার, যে প্রেমে পৃথিবী পরিচালিত হইতেছে, সেই প্রেমে মুগ্ধ নয় কে?

বামাচরণ বাবু স্বগৃহে সস্ত্রীক উপবিষ্ট,—তাঁহার বয়স পচিশের ঊর্দ্ধ নহে, দেখিতে গৌরবর্ণ—সুন্দর চক্ষু, উন্নত নাসিকা, মনোহর ওষ্ঠ যুগল,—গঠন পরিপাটী। তাঁহার স্ত্রীর নাম রমণী, বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র, বর্ণ পূর্ণোজ্জ্বল, নিতম্বলম্বী কেশ, আকর্ণ চক্ষু, মনোহর কর্ণ, মনোমুগ্ধকর নাসিকা, বিম্বাধর—তাহা তাম্বুল রাগে রঞ্জিত হইয়া যুগল গোলাপ কলিকার ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। নয়নের জ্যোতিঃ যৌবনের ছটায় ফাটিয়া বাহির হইয়া যেন সংসারীকে সংসার ভুলিতে বলিতেছে, অপ্রণয়ীকে প্রণয় শিখিতে কহিতেছে, এবং যোগীর যোগ ভঙ্গের প্রয়াস পাইয়া রমণীর অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারই যেন জগতের সার পদার্থ, ইহাই জ্ঞাপন করিতেছে। বক্ষের উচ্ছাস পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের গরিমার অক্ষয় পোরকতা করিতেছে। অঙ্গের গঠন পরিপাটি,—যুবতী স্বামীর স্কন্ধে স্বীয় মস্তকটী রক্ষিত করিয়া দেয়ালের

একটী চিত্র প্রতি অনন্তমনে চাহিয়া রহিয়াছে। অধরে মৃদু হাসি চঞ্চল চপলার ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া মৃদু আলোক বিকাশ করিয়া নিবিতেছে। যুবক স্বীয় বাম হস্ত দ্বারা যুবতীকে বেষ্টন করিয়া স্থির অথচ বঙ্কিম দৃষ্টে সেই মনোহর বদনের অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিয়া, যেন সেই সৌন্দর্য্য সাগরে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছেন তাহার স্থিরতা নাই। প্রণয়ি! এ সুখের নিকট কি আর ইহ সংসারে কোন মনোরম পদার্থ আছে?

যুবক ক্ষণেক স্থির দৃষ্টে রমণীর সুন্দর বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার প্রাণ বড়ই বিকল হইল, চক্ষে জল আসিল, দেখিতে দেখিতে তাহা যুবতীর গোলাপি অধরে নিপতিত হইল।—যুবতী চমকিয়া উঠিল, দেখিল, স্বামীর চক্ষুর্দ্বয় জলে পূর্ণ, ত্রস্তভাবে উঠিয়া বসিয়া, মৃণাল দর্প-খর্ব্বকারী দক্ষিণ ভুজ স্বামীর স্কন্ধদেশে স্থাপিত করিয়া বলিল "তুমি কাঁদ্‌চো?"

পরস্পরের চক্ষে পরস্পরের চক্ষু সম্মিলিত হইল, যুবতীর সেই ইন্দীবর নয়ন যুগল হইতে অঝোরে সলিল সম্পাত হইতে লাগিল। দম্পতিদ্বয় রোদন পরায়ণ হইলেও সে ক্রন্দনে যে তাঁহাদের হৃদয়ে কি অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হইতে ছিল, তাহা বর্ণনা করিতে এই দুর্ব্বল ভাষার শব্দ নাই, ক্ষীণ লেখনীর ক্ষমতা নাই। সে সুখ হৃদয় বুঝে, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারে না;—সে কল্পনার সুখময়ী স্ফূর্ত্তি কবি হৃদয়ে সহজে জাগরুক হয়, কিন্তু বিকাশ হয় না। সে অনন্ত সুখ মন বুঝে, কিন্তু বর্ণনা করিতে পারে না, তাহা নীরব কবির নীরব ক্ষমতার আয়ত্বাধীন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ে বিচ্ছেদ।

বামাচরণ বাবু আপন বাহুযুগল দ্বারা রমণীর গলদেশ পরিবেষ্টন করিয়া সেই সুন্দর গোলাপী অধর চুম্বন করিয়া মৃদু অথচ কাতরস্বরে কহিলেন—"রমণি! দরিদ্রতাই সকল সুখের বিঘ্নকারক। আমার যদ্যপি প্রচুর অর্থ থাকিত, বা অর্থের অভাব না থাকিত, তাহা হইলে তোমায় ত্যাগ করিয়া—অর্থ উপাসনার জন্য বিদেশ যাইব কেন? ঈশ্বর আমার প্রতি নিতান্তই বাম, সেই জন্য তোমার ন্যায় স্ত্রী; যাহার অক্ষয় ভালবাসা আমার হৃদয়কে স্বর্গ তুল্য

করিয়াছে, যাহার প্রেমময় বদন মাধুরী বিলোকন করিলে নয়ন স্পন্দন রহিত হয়, যাহার মোহিনী মূর্ত্তি আমার হৃদয়পটে গাঢ় রূপে অঙ্কিত, যে আমার নিদ্রার স্বপ্ন, যাহাকে আমি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করি, আজি আমার সেই প্রেমরূপিণী জীবন সর্ব্বস্বকে ত্যাগ করিয়া বিদেশ যাইতে হইবে, প্রাণাধিকে। ইহা কি সামান্য দুঃখ।"

রমণী আপন মস্তকটী বামাচরণের বক্ষে ধীরে রক্ষিত করিয়া কহিল,—"না, তা হবে না, আমি তোমায় কোথাও যেতে দিব না, তুমি এই স্থানে কোন চাকরীর চেষ্টা কর—কম বেতন হয়, তাহাও ভাল।"

বামাচরণ ক্ষণেক নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, সে নিশ্বাসে যেন কত দুঃখ, কত যাতনা, কত ক্লেশ উচ্ছাসিত হইল,—তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—"তাহা কিরূপে হইবে, কার্য্য সমাধা হইতে অনেক বাকি, শেষ না হইলে টাকা পাওয়া যাইবে না। বিশেষতঃ বাটী বন্ধক দিয়া কর্জ্জ করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা ত তুমি জান।"

রমণী। কার্য্য শেষ হইয়া বিল পাশ হইতে কত দিন লাগিবে?

বামাচরণ। পাঁচ ছয় মাসের কম নয়।

রমণী। তবে তুমি এখন যাইলে আর পাচ ছয় মাস আসিতে পারিবে না?

বামাচরণ। বোধ হয় না।

রমণীর চক্ষে আবার প্রবল বেগে বারিধারা বহিল, বলিলেন—"না তাহা হইবে না, আমি থাকিতে পারিব না, তোমায় ছ-মাস না দেখিয়া বাঁচিব?"

বামাচরণ কাতর ভাবে কহিলেন "কি করিবে ভাই!"

রমণী। আমায় লইয়া চল।

বামাচরণ। সেখানে কখন কোথায় থাকি তাহার স্থিরতা নাই, নতুবা লইয়া যাইতাম।

রমণী আবার কাঁদিলেন। অনেকক্ষণ ক্রন্দনের পর আকুল ভাবে উদাস প্রাণে বলিলেন "তবে আজ যাওয়া হবে না।"

এই বলিয়া বামাচরণের বদন প্রতি দীন-নেত্রে চাহিলেন, দুই হস্তে স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া সজল চক্ষে বলিলেন—"বল যাবে না।"

বামাচরণ বাবু স্নেহ ভরে রমণীর চক্ষু জল মুছাইয়া দিয়া সেই শিশির

সিক্ত বদন কমল চুম্বন করিলেন এবং নির্নিমেষ লোচনে সেই অপরূপ মুখাবলোকনে আপন নয়ন পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন, কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

তখন রমণী বলিলেন "বল যাবে না।"

বামাচরণ। তাই হবে, না হয় কালই যাইব।

তখন রমণী যেন অনেক প্রকৃতিস্থা হইলেন, মনের দুর্ব্বিসহ যাতনা যেন অনেক লাঘব হইল। একটী দিনের জন্য আবার স্বামীকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইবে ইহা কি কম সুখ! রমণী আজ একটী দিন যে কত অমূল্য, তাহা মনে মনে বুঝিলেন।

তখন বেলা অবসান হইতে আর বিলম্ব নাই।—সূর্য্যদেব রক্তিমলোচনে পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে আকাশ পটে ভাসিতে ভাসিতে অদৃশ্য হইবার উপক্রম করিতেছেন। সূর্য্যদেবের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া যেন পক্ষীগণ উল্লাসসহ কোলাহল করিতে করিতে, তাহার প্রচণ্ড তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে ভাবিয়া আপনাপন আত্মীয়গণকে তৎসবাদ প্রদান করিতে নীড়াভিমুখে ধাবিত হইতেছে। জাহ্নবীর অমল বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা মৃদু বাতাসে সঞ্চালিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে; অথবা চন্দ্রদেবের আগমন উপলব্ধি করিয়া অনন্ত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া যেন এক দৃষ্টে আকাশ পানে চাহিয়া আছে। বৃক্ষগণ আপনাপন শাখা প্রশাখা নাড়িয়া যেন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে,—দূরে ঝিল্লি ঐক্যতান বাদনে শ্রুতি সম্মোহন করিতে কৃতযত্ন হইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিরহ।

সময় কাহারও বাধ্য নহে, সময় কাহারও মুখ চাহিয়া থাকে না। যথাসময়ে রাত্রি আসিল, ক্রমে সে রাত্রিও পোহাইল। বামাচরণের পশ্চিম যাইবার দিন উপস্থিত হইল। বামাচরণ বাবু এলাহাবাদে কণ্ট্রাক্টের কার্য্য করিতেন, এই তাঁহার প্রথম উদ্যম, সুতরাং তিনি পতি প্রাণা রমণীর প্রণয় সাগরে ভাসিয়া আর স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিলেন না।

তাঁহার এলাহাবাদ যাইবার সময় ক্রমশঃ নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল।

বেলা অবসান কালে বামাচরণ বাবু প্রণয়িনী রমণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। বিদায় কালে দম্পতি যুগলের শোক উচ্ছাসিত হৃদয়ের কিরূপ উদ্বেল হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। সেই ছল ছল চক্ষু, হৃদয়গত যাতনা জনিত মৃদু অধর কম্পন, হৃদয়ের বিদীর্ণ হইবার প্রবল বাসনা;—সে কথা, সে ভাব, সে যাতনা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বড় একটা বুঝিবে না।

মনুষ্যের সুখ চিরস্থায়ী নহে, ইহাই বড় দুঃখ। এত প্রেম, এত আহ্লাদ, এত সুখ কোথায় গেল; প্রেম নদীতে সুখের যে পূর্ণ জোয়ার স্থির ভাবে ছিল, আজি তাহা একে বারে কমিয়া গেল। যাঁহারা কয় দিবস আনন্দের উচ্চ শিখরে সমারোহণ করিয়াছিলেন, আজি তাঁহারা সহসা তথা হইতে নিপতিত হইলেন। প্রেমতরঙ্গে যে হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছিল, তাহা সহসা শান্তভাব ধারণ করিল।

মনুষ্যের চিরবিরহ সহ্য হয়, কিন্তু ক্ষণিক বিরহ সহ্য করা বড় ক্লেশ সাধ্য। আশা মনুষ্যকে উন্মাদ করিয়া তুলে, রমণী প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে বামাচরণ বাবুর ধ্যানে মগ্ন; তিনি কবে আসিবেন, কবে তাঁহার সহবাসে সুখী হইবে, কবে তাঁহার সহিত প্রাণ ভরিয়া কথা কহিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ইহা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

এইরূপেই দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে দুই মাস অতীত হইয়া গেল। এইরূপে স্বামীর ধ্যানে, স্বামীর অপরিসীম ভালবাসার আলোচনায় বিরহিণী রমণীর দিন কাটিতে লাগিল।

রমণী নিজে লেখা পড়া জানিতেন না, বামাচরণ বাবুকে কোন পত্র লিখিতে হইলে বা তাঁহার কোন পত্র আসিলে তাহা পাঠ করাইবার জন্য অপরের সহায়তা লইতে হইত। ইহা তাঁহার বড় দুঃখ। মনে হইত লেখা পড়া জানিলে তাঁহার পত্র পড়িতে ও লিখিতে কত সময় কাটিয়া যাইত, আর তাহা না জানি কি মধুর হইত। আমি প্রতিদিন আমার অন্তরের দারুণ যাতনার কথা লিখিতাম, সেই কোমল প্রাণে দুরন্ত দীর্ঘনিশ্বাস আর অশ্রু জলের প্রবল ছায়া অঙ্কিত করিতাম, আমার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকেও কাঁদাইতাম।

রমণী স্বামীর পত্র গুলি অতি যত্নে রাখিতেন, মধ্যে মধ্যে সে গুলিকে বাহির করিয়া বক্ষে ধারণ করিতেন কখন কখন উদ্ভ্রান্ত ভাবে চুম্বন করিয়া হৃদয়ের যাতনা ভার লাঘব করিতেন।

বামাচরণ বাবুর বাটী চুঁচুড়ার বড়বাজারে, বাটীটী ইষ্টক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, মধ্যে দুইটী পাকা ঘর ও একটী মেটে রন্ধন গৃহ। বামাচরণ বাবুর ইহ সংসারে সেই অনন্ত প্রণয়রূপিণী পতিপ্রাণা পত্নী ব্যতীত অপর কেহই নাই। সেই বাটীর মধ্যে রমণী ও একটী দাসী ব্যতীত আর কেহই থাকিত না। বামাচরণ বাবুর বাটীর পার্শ্বে তাঁহার অন্যান্য জ্ঞাতির বাস।

বাটীর দক্ষিণ পার্শ্বে বামাচরণ বাবুর এক খুল্লতাত ভ্রাতার বাটী, তাঁহার বাটীতে তাঁহার স্ত্রী, একটী শিশু পুত্র ও তাঁহার স্ত্রীর যুবা ভ্রাতা থাকিতেন। দুই জায়ে বিশেষ প্রণয় ছিল, উভয়কে এক মাতৃ-গর্ভজাত ভগ্নী বলিয়া প্রতীতি জন্মিত। বামাচরণ বাবুর খুল্লতাত ভ্রাতৃ পত্নীর ভ্রাতার নাম বসন্ত—বসন্ত সুবাদে রমণীর ভ্রাতা হইলেন, তিনিই বামাচরণ বাবুকে কোন পত্র লিখিতে বা তাঁহার নিকট হইতে সমাগত পত্রাদি পাঠ বিষয়ে রমণীকে সহায়তা করিতেন।

এই সকল বিষয়ের সহায়তা করিতে বসন্ত মধ্যে মধ্যে রমণীর নিকট আসিতেন। মনুষ্যের স্বভাব ও চরিত্রের বিষয় কে বলিতে পারে? সময়, সুযোগ এবং প্রলোভনে কাহার চরিত্র কিরূপ হয়, তাহা কে জানে? অতি যে অসৎ চরিত্র সম্পন্ন তাহারও চরিত্র উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, এবং যাহার চরিত্র দেবোপম তাহার চরিত্রও পিশাচের ন্যায় জঘন্য হইয়া যায়।

বসন্তের অন্তরের কথা আমরা এখনও জানি না, কিন্তু সে এখন রমণীর সহিত কিছু অধিক ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করিয়াছে, রমণীর নিকট প্রায় যায়, বাটীতে বসিয়া তামাকু খায়, এবং নানা রকমের নানা গল্প করে। রমণী প্রথমতঃ এত ঘনিষ্ঠতা ভালবাসিতেন না। বসন্ত সদত তাহার বাটীতে আসিত গল্প করিত, তামাকু খাইত, ইহা তাহার ভাল লাগিত না, অথচ তাহার বিরক্তির কারণও বসন্তকে বলিতে সাহস করিত না। একবার তাহার ভগ্নীকে বলিয়া তাহাকে সদত আসিতে নিষেধ করিয়া দিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু বলিতে পারিল না; মনে হইল—পাছে তিনি রাগ করেন, কিছু মনে করেন।

এইরূপ তদবস্থ ভাবেই কিছু দিন অতিবাহিত হইল, ক্রমে সময়ের ক্ষমতার প্রভাবে মনে হইল—"আসিলেই বা ক্ষতি কি, আমি ত ঠিক আছি, আমার মন খারাপ হইবার নয়, তাহা বিচলিত হইবার উপায় নাই। বসন্ত আসিয়া গল্প করে তাহাতে ক্ষতি কি, আমি একা থাকায় আমার সময় যেন অতীত হয় না, কেবল মন উদাস হয়,—না হয় বসন্তের সহিত গল্প করিলাম, তাহাতে মন অনেকটা ভাল থাকিবে।"

রমণী এত দিনে বসন্তের সমাগম ভালবাসিল, এত দিনে তাহাকে পান সাজিয়া দিল, বসন্ত তাহার পরদিন ঠিক সেই সময়ে আবার বলিল "কই আজ পান দিলে না।" রমণী আবার পান দিল সেই পর্য্যন্ত প্রত্যহ পান দিতে হয়।—ক্রমে জল খাওয়ান এবং কখন কখন রাত্রে লুচী ভাজিয়া খাওয়ানও চলিতে লাগিল।

পূর্ণিমা রাত্রে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে কি চন্দ্রের স্থায়িত্ব আছে একথা স্বীকার করিতে হইবেনা? মনের দৃঢ়তা আছে বলিয়া কি সে দৃঢ়তা বিদুরিত হইতে পারে, এ কথা চিন্তা করিতে নাই? যে রমণী এ কথা বুঝে না, তাহাকে সে নিমিত্ত নিশ্চয়ই অনুতাপ করিতে হয়, যে রমণী স্বামীর অনুপস্থিতে মানসিক প্রচণ্ড দৃঢ়তা সত্ত্বেও অপর পুরুষের সহিত একত্রে বসিয়া গল্প করে, সদত কথাবার্ত্তা কহিতে ভালবাসে, তাহার চরিত্র নিশ্চয়ই পদ্মপত্রস্থিত জলবৎ তরল। আমরা সে চরিত্রের প্রশংসা করি না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পুরুষের প্রাণ।

আজি দুই মাস অতীত হইল বামাচরণ বাবু এলাহাবাদে আসিয়াছেন। কণ্ট্রাক্টের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। কার্য্য যত শেষ হইয়া আসিতেছে, তাঁহার হৃদয় ততই আহ্লাদে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। কেননা কার্য্য শেষ হইলেই তিনি স্বদেশে যাইবেন এবং আবার তাঁহার প্রণয়িনীকে বক্ষে ধারণ করিয়া বিরহ-তাপ-দগ্ধ হৃদয় পরিতৃপ্ত করিবেন। তিনিও যে রমণীর ন্যায় অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছেন, তাহা কি আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে?

বামাচরণ বাবুর বাসার পার্শ্বে একটী কায়স্থের বাস ছিল, স্বজাতি বলিয়া

বামাচরণ বাবু তাঁহার বাসাতেই আহারাদি করিতেন, একদিন সন্ধ্যার পর তিনি আহারান্তে বসিয়া ধূমপান করিতেছেন, এমন সময় একটী ষোড়শ বর্ষিয়া অপরূপ-রূপ-শালিনী রমণী তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। বস্তুতঃ এরূপ রূপের বিকাশ, এরূপ নিখুঁত সুন্দরী, অতি অল্প নয়নই দেখিয়াছে। বিধি বিড়ম্বনায় যুবতী বাল্যকালেই বিধবা হইয়া পিতা মাতার অনন্ত দুঃখের কারণ হইয়াছেন। বামাচরণ বাবু যাঁহার বাসায় আহারাদি করিতেন, যুবতী তাঁহারই একমাত্র কন্যা, নাম—গোলাপ।

গোলাপকে দেখিয়া বামাচরণ বাবুর হৃদয় কেমন করিয়া উঠিল, বাল বিধবার দারুণ যাতনার কথা হৃদয় মধ্যে জাগিয়া উঠিল, তিনি মনে মনে বলিলেন, "অবলা বঙ্গবালা! তোমার কোমল ললাটে বৈধব্যের ঘোর মসীলেখা কোন নিষ্ঠুর দিয়াছিল? যুবতীর মধুর ওষ্ঠে বিষাদের ভীষণ চিহ্ন দেখিয়া যে নিষ্ঠুর সমাজের চিত্ত বিচলিত হয় না, যাহার কঠোর চক্ষে জল আইসে না, সে দেশে কেন কোমল কামিনীপদ্মের বিকাশ হয়? আমি বলি কামিনী কুলের মধ্যে বঙ্গের বিধবারাই মন্দ ভাগিনী। যদ্যপি কন্যার চক্ষের অশ্রুধারা দর্শনে পিতা মাতার হৃদয় বিচলিত না হয়, তবে আর কাহার হইবে? হা বিধাতঃ! বঙ্গের ভাগ্যে এমন সুপ্রসন্ন দিন কবে আসিবে, যে দিন বঙ্গ সমাজ অবলার দুঃখ বুঝিবে, বিধবার নয়ন জল মুছাইবে? সে অসপ্নকল্পিত সুখ আশা কি দগ্ধাদৃষ্ট বঙ্গ-ললনার ভাগ্যে ফলবতী হইবে? বিধাতা কি তাঁহার বঙ্গবালা-গণের প্রতি করুণনেত্রপাত করিবেন? মন্দ ভাগিণী বঙ্গীয় কামিনী কুলের অদৃষ্ট কি এত প্রসন্ন হইবে?"

যুবতী বামাচরণ বাবুকে পান দিয়া নিকটে দাঁড়াইল। সেই ক্ষীণ দীপালোকের সাহায্যে সে রূপের যে অপরূপ বিভা বিকাশ পাইল, তাহা বলা যায় না। বামাচরণ বাবু একবার যুবতীর প্রতি পূর্ণদৃষ্টি করিলেন, তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, তিনি তাহা সংযত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সক্ষম হইলেন না, নয়নবারি ধীরে ধীরে স্খলিত হইয়া অবাধে ভূমি চুম্বন করিল। সেই নয়নাসার এক একবার নাসিকাপ্রান্তে আসিয়া আলোক সাহায্যে হীরক খণ্ডবৎ শোভা পাইতেছিল, যুবতী নির্ণিমেষ লোচনে তাহা দেখিতেছিলেন, আর কত কি ভাবিতে ছলেন।

গোলাপ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ [illegible] থাকিয়া বলিলেন "বা[illegible]রণ! কথা কহিবে না?"

বামাচরণ বাবু একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "কি কথা কহিব গোলাপ!"

গোলাপের অধর প্রান্তে বিষাদ সূচক মৃদু হাসি দেখা দিল, বলিলেন "কি কথা,—কথার কি সীমা আছে!"

বামাচরণ। গোলাপ, বলিতে কি তোমার সহিত কথা কহিতে আমার ভয় হয়, তোমার অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখ হয়।

গোলাপ। বামাচরণ, আমার অবস্থা দেখিয়া তোমার দুঃখ হয় ইহাই আমার প্রীতির অপরিসীম পরিতোষ, দেখ ভাই, আমি কবে বিধবা হইয়াছি জানি না, যৌবনে পদার্পণ করিয়া এই কয়েক বৎসর যে কি দুর্নিবার যাতনাকে পদতলে বিদলিত করিতেছি, তাহা আমিই জানি। যখন প্রথম তোমায় দেখি, তখনই আত্ম সমর্পণ করি; কেন করিলাম জানি না। মনে হইল, তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী, হয়ত তোমার সহবাসে আমি সুখী হইব; তুমি আমার হইবে, আমি তোমার হইব। আমি তোমায় ভালবাসি, হয়ত তুমিও আমায় ভালবাসিবে, কিন্তু আশা বিফল হইল। কত কষ্টে, কত করিয়া মনোভাব নির্লজ্জ ভাবে তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম, কিন্তু ছিল এক, হইল আর! যে আশাটুকু ছিল তাহাও গেল। এখন নিরাশ হৃদয়েও তোমায় ভালবাসি। অনেক সময়ে মনকে বুঝাই যে নিষ্ফল ভালবাসিয়া লাভ আছে কি? মন বলে—নাই, কিন্তু ভালবাসিতেও ছাড়েনা। ভাই বামাচরণ, মনে করিও না, যে আমি তোমায় প্রতারণা করি, নানা কথা কহিয়া তোমার মনকে মুগ্ধ করি, তোমায় আমার প্রতি সমধিক অনুরক্ত করিতে কৃতযত্ন হই। না না, সে ভাব যেন তোমার হৃদয়ে স্থান পায় না। আমি সকল কথা সকল অপবাদ অবনত শিরে সহ্য করিতে পারি, কিন্তু আমার হৃদয় দুর্ব্বল একথা প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারি না; কেহ যদ্যপি আমার হৃদয়ে উত্তপ্ত সীসক ঢালিয়া দেয়, তাহা অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারি, কিন্তু প্রলোভন যে আমার ভালবাসা লাভের পথ প্রদর্শক এ কথা আমি সহ্য করিতে পারি না। আমি জানি, যে কোন ভাগ্যবতী তোমার হৃদয়-পটের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তোমার হৃদয় কাননের মন্দার কুসুম, তোমার প্রণয়-নদীর সুখ তরঙ্গ। আমি জানি, যে তুমি প্রাণ অপেক্ষা তাহাকে ভালবাস, তোমার সমস্ত ভালবাসা তাহার চারু করতলে সমর্পণ করিয়াও তোমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় নাই, যেন তাহা অপূর্ণ রহিয়াছে, যেন কিছুতেই মন উঠে না।—যদি প্রণয় আকাঙ্খা [illegible]

হইত, যদি তাহা সমুদ্রের ন্যায় প্রশস্ত হইত, যদি তাহা সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃ সম্পন্ন ও প্রকাণ্ড হইত, যদি নক্ষত্রের ন্যায় অগণ্য হইত, তাহা হইলেও তোমার মন তৃপ্ত হইত না, তথাপি তুমি আকাঙ্ক্ষাদগ্ধ হইতে, তোমার হৃদয়ে যে অপূর্ণতা সেই অপূর্ণতাই বহিয়া যাইত। সে দেবতা বাঞ্ছিত প্রেমময় হৃদয়ের অধিকারিণী হইব, এমন কি ভাগ্য করিয়াছি ভাই? আমি হতভাগিণী আমার কপালে সে সুখ হইবে কেন?—আর মনে করিও না যে, আমি তোমার স্ত্রীর ন্যায় পতিব্রতা রমণীর সুখাধার বঞ্চনা করিয়া আত্মসাৎ করিব। আমার সে বাসনা নাই—এক জনার সুখের কণ্টক হইয়া আপন সুখ বৃদ্ধি লালসা যাহার হৃদয়ে আছে, তাহার তুল্য নৃশংস জীব ইহ জগতে আর নাই। সে মনুষ্য নয় —পশু! বামাচরণ, বলিতে কি আমি যাহাই হই না কেন, ভালবাসিয়া, না বুঝিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া আমি যদি কোন গর্হিত কার্য্যও করিয়া থাকি, তথাপি আমি যে সেরূপ পশু হইতে অনেক উন্নত একথা দম্ভ করিয়া বলিতে পারি। ঈশ্বর আমার কষ্ট ও দুর্নিবার যাতনা ভোগ করিতে দিয়াছেন, আমাকে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় তাহা ভোগ করিতেই হইবে, কে তাহার ব্যতিক্রম করিবে ভাই? তবে তোমায় ভালবাসি, তোমায় দেখিতে ভালবাসি, কথা কহিতে ভালবাসি, তোমার কথা প্রাণ ভরিয়া শুনিতে ভালবাসি,—তাই আসি, তাই কই, তাই শুনি, নতুবা অন্য আশা নাই; যত দিন শরীরে এক বিন্দু শোণিত থাকিবে, তত দিন আমার সে ইচ্ছা, সে আশাকে কে প্রতিনিবৃত্ত করে? ইহাতে যদ্যপি পাপ থাকে উপায় নাই—ইহার জন্য যদ্যপি অনন্ত নরক কুণ্ডে পতিত হইতে হয়, কি করিব,—কিন্তু তুমি তাহাতেও বাদ সাধ, যেন অনিচ্ছা সত্ত্বে কথা কও।

বামাচরণ। না গোলাপ, আমি তাহা ভাবি না, আমি ভাবি পাছে ঘনিষ্ঠতায় তোমার মন সমধিক বিচলিত হয়, পাছে তুমি আরও কষ্ট পাও, সেই জন্য অধিক কথা কহি না, মনে করি হয়ত তুমিও কহিবে না।

গোলাপ। কথা না কহিতে এক একবার ইচ্ছা করি, কিন্তু মন মানে না, প্রাণ জ্বলিয়া উঠে, বড় কষ্ট হয়,—তাই আবার কত ছলে কত কৌশলে, ছুটিয়া আসি। আর কি বলিলে,—আমার হৃদয় সমধিক বিচলিত হইবে,—বামাচরণ ছি ছি! তুমি আমাকে এত দুর্ব্বল হৃদয় বলিয়া জ্ঞান কর? আমি কি তোমার নিকট অভিসারে আসি বলিয়া বিবেচনা হয়?

বামাচরণ বাবু কিছু লজ্জিত হইয়া বলিলেন "না গোলাপ, আমি তাহা

ভাবি না, যদি এ সংসারে কিছু পবিত্র থাকে তবে তাহা তোমার হৃদয়—কিন্তু মনের ভাবকে বিশ্বাস কি; আমার মনও ত চঞ্চল হইতে পারে।"

গোলাপ। ছি বামাচরণ, তোমার এ কথায় আমি বড় লজ্জিত হইলাম, তোমার স্ত্রী শুনিলে আরও লজ্জিত হইতেন। যাহা হউক, তোমার হৃদয় যে এত দুর্ব্বল তাহা জানিতাম না, আমি তোমার হৃদয়গত দুর্ব্বল অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিব না,—আমি চলিলাম।

গোলাপ আর কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেলেন। বামাচরণ বাবু পুত্তলিকাবৎ নিশ্চেষ্ট ভাবে ক্ষণেক বসিয়া রহিলেন; পরে গোলাপের মনোহর পবিত্রতা সম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—হৃদয়ের অজস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, আর সঙ্গে মনে হইল "কে বলে রমণী হৃদয়ে বল নাই?—রমণী, কতবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কত কথা মনে করিয়াছি, কত পাপ করিয়াছি, তখন নারী হৃদয় বুঝি নাই, এখন বুঝিতেছি তাহা স্বর্গীয়া! পবিত্রা! তেজসম্পন্না!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিরহ ঘুচিল।

উক্ত ঘটনাটীর কয়েক দিবস পরে বামাচরণ বাবু বিল পাশ করিয়া টাকা লইলেন; তাঁহার সমস্ত খরচ খরচা বাদ চারি সহস্র টাকা লভ্য হইল। তিনি যখন টাকা গণিয়া লন, তখন, একটী হিন্দুস্থানি সতৃষ্ণ নয়নে টাকা গুলির প্রতি চাহিয়া ছিল। বামাচরণ বাবু অর্থের জন্য বড় লালায়িত হইয়াছিলেন, বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন তাই অর্থ যে দরিদ্রের পক্ষে কি অমূল্য ধন তাহা তিনি বেশ বুঝিতেন। অর্থের জন্য তিনি না করিয়াছেন কি? জীবনের এক মাত্র সম্বল প্রাণ সমা পত্নীকে একাকিনী রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহার হৃদয়ে দারুণ শেলাঘাত করিয়াছেন, নয়নের অজস্রধারা মুছাইবার অবকাশ পান নাই, সে সকলই সর্ব্বনাশী অর্থের জন্য। আজি অনেকগুলি অর্থ তাঁহার হস্তগত হইল, তিনি মনে করিলেন হিন্দুস্থানীটীর হয়ত টাকার বিশেষ অভাব তাই এমন করিয়া টাকার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। একবার মনে করিলেন, জিজ্ঞাসা করি, যদি স্বীকার করে তাহা হইলে সাহায্য

করিব, কিন্তু সহসা জিজ্ঞাসা করিতে কেমন যেন লজ্জা করিতে লাগিল, এদিকে লোকটীও সহসা কোথায় চলিয়া গেল। ব্যস্ততায় কথাটাও চাপা পড়িল। মানব হৃদয়ে অনেক সময় পর-দুঃখ-কাতরতা এমনি করিয়া জাগিয়া উঠিয়া আবার তখনি নিবিয়া যায়।

তিনি যত্নপূর্ব্বক টাকা গুলি বাসায় লইয়া আসিলেন, সেখানকার যে সমস্ত কার্য্য ছিল তাহা তৎপর সম্পন্ন করিয়া পর দিবস স্বদেশ যাত্রা করিতে স্থির সঙ্কল্প হইলেন, মনে কতই আনন্দের উদ্রেক হইতে লাগিল;—প্রিয়তমার সাক্ষাৎ পাইবেন, যাহাকে দেখিয়া আশা মিটে না তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রাণ জুড়াইবেন, যে টাকার জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, আজি তাহার হাতে চারি হাজার টাকা দিবেন, যাহাকে কখন একখানি ভাল কাপড়, ভাল গহনা দিতে পারেন নাই, তাহার কত কাপড়, কত গহনা হইবে। বামাচরণ বাবু এইরূপ কতই ভাবিতে লাগিলেন।

কত লোকের কত দিন কাটিয়া যায়, কিন্তু আমাদের বামাচরণের সেই দিনটী যেন আর কাটিতেছে না। তাহার মধ্যে যেন কত মাস, কত বৎসর গোপন ভাবে অতীত হইতেছে! বামাচরণ বাবু প্রায়ই ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিতেছেন. কখন বা ঘটিকা যন্ত্রের সময় নিরূপণে অবিশ্বাস জন্মিতেছে, মধ্যে মধ্যে ঘড়ি চলিতেছে কি না, জানিবার জন্য সেটীকে শ্রুতি বিবরের কাছে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

ক্রমে দিন কাটিল, রাত্রি আসিল, বামাচরণ বাবু সকাল সকাল শয়ন করিলেন। শয়ন মনুষ্যের ইচ্ছামত বটে, কিন্তু নিদ্রা নহে। সুতরাং তাহা-তেও তাঁহাকে প্রতারিত হইতে হইল। অনেক কষ্টে রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইলে তিনি নিদ্রিত হইলেন।

পরদিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিলেন, গোলাপের সেই স্বর্গীয় ছবি বিদায়কালে একবার দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল। মনে করিলেন কয় রাত্রি গোলাপ আসে নাই, অদ্য আসিবে এখন। ক্রমে সে আশাও নিষ্ফল হইল। আহারের সময় হইল, তথাপি গোলাপ আসিল না। বামাচরণ বাবু ভাবিলেন, এখন না আসিলেও যাইবার সময় নিশ্চয়ই দেখা করিবে। তিনি আহারাদির পর গোলাপ কিরূপে দেখা করিবে, কি বলিবে, কি উত্তর দিবেন এইরূপ নানা বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু ভাবাই সার হইল—গোলাপ আসিল না।

বামাচরণ বাবুর এত উৎসাহে, এত সুখে, যেন অল্প দুঃখ কণা প্রবেশ করিল, তিনি একটু বিষাদিত হইলেন। ক্রমে তাঁহার বিদায়ের সময় নিকট-বর্ত্তী হইল, তিনি অগত্যা গোলাপকে না দেখিয়াই, বিদায় হইলেন। বাসা হইতে বাহির হইবার কালে দেখিলেন, একটী বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া গোলাপ তাঁহাকে দেখিতেছে, উভয়ের চক্ষু—পরস্পরের চক্ষে মিলিত হইবামাত্র গোলাপ তথা হইতে অপসৃত হইল। তখন বামাচরণ বাবু একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। মনে হইল আর বুঝি গোলাপকে দেখিতে পাইব না।

সন্ধ্যার সময়ে তিনি এলাহাবাদ ষ্টেসনে উপনীত হইলেন, হুগলীর এক-খানি টিকিট কিনিয়া বাষ্পযানে আরোহণ করিলেন, এবং যথা সময়ে আপনার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি সকল ভুলিলেন, গোলাপ ভুলি-লেন, আর ভুলিলেন নিজের অস্তিত্ব, মনে হইল রমণী ছাড়া আমি আবার কে? রমণী ছাড়া জগৎ আবার কেমন? যে রমণীর ন্যায় স্ত্রী পায় নাই তাহার জীবন অসার!

রমণীকে দেখিয়া বামাচরণ বাবুর অতুল আনন্দ হইল, তিনি সেই ভুবন ভুলানি মুখখানি দেখিয়া সমস্ত জগৎ সংসার ভুলিলেন, যেন অকস্মাৎ কি অসীম স্বপ্ন-সুখ অনুভব করিলেন। মনে করিলেন না জানি আজ রমণীর কি অভাবনীয় সুখের দিন, না জানি আজ রমণী কি অপরিসীম সুখানুভব করিবে, তাই তিনি বিনা সংবাদে সহসা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন,কিন্তু তাঁহাকে সহসা দেখিয়া যেন রমণীর বদন শুকাইল, বক্ষঃস্থল দুর্ দুর্ করিতে লাগিল, কেন, তাহা এখনও বলিতে পারি না। পরে বামাচরণ বাবু সহসা টাকা পাইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া সে ভাব তিরোহিত হইল, বক্ষে যে একটী পাষাণ চাপিয়া-ছিল, তাহা অপসৃত হইল, বামাচরণ বাবুর বদন প্রতি চাহিতে রমণীর যে চক্ষের কি এক বিকৃত ভাব হইয়াছিল, তাহা আবার অন্যভাব ধারণ করিল। তিনি রমণীকে একটী গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিলেন, এবং অর্জ্জিত অর্থ সেই চারু করতলে সমর্পণ করিলেন। রমণী পুলক প্রাণে সে গুলিকে আপন বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া সোৎসুকে বলিলেন "আর ত যেতে হবে না?

বামা। না।

রমণী। আঃ বাঁচলাম।

রমণীর হৃদয় যেন আনন্দ উছলিয়া উঠিল, অন্ততঃ বামাচরণ বাবু তাহাই বুঝিলেন।

তখন বেলা প্রায় একাদশ ঘটিকা সুতরাং রমণী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পতির আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এতদিনে বুঝি বিরহ ঘুচিল!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুখের সীমা।

দেখিতে দেখিতে সুখ সন্ধ্যা দেখা দিল। যে মোহিনী সন্ধ্যা সমাগমে আকাশমণ্ডল অসংখ্য তারাহার পরিয়া উজ্জ্বল শোভায় সুশোভিত হয়—প্রণয়ী—নব আনন্দে উৎসাহিত হয়—পুষ্প সৌরভে দশদিক আমোদিত হয়, প্রকৃতি শান্ত ভাব ধারণ করে, আর কবি—জগতের অভিনব শোভা সন্দর্শন করিয়া আপন কল্পনারথে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, সেই সুখদ সন্ধ্যা আজি বামাচরণ বাবুকে সন্তোষ পারাবারে পরিনিমগ্ন করিতে সমাগত।

বামাচরণ বাবু সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আপন-বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবামাত্র বাটীতে আগমন করিলেন। দেখিলেন তখন তাঁহার মনোমোহিনী রন্ধন কার্য্যে ব্যস্ত, অগ্নিতাপে ঘর্ম্মাবলী সেই সুগোল সুন্দর কপোলে মুক্তাবলীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই সুন্দর সুচারু বদন-মণ্ডল ঈষৎ রক্তাভ হইয়াছে। বসন অসাবধানতার সহিত স্খলিত হওয়ায় বক্ষ শোভা স্বীয় যৌবন গরিমার অক্ষয় কীর্ত্তি জ্ঞাপন করিতে প্রকাশ মান। বামাচরণ অনেকক্ষণ অনিমেষ লোচনে দীপালোকের সাহায্যে রমণীর যে অলৌকিক রূপ-বিভা তরঙ্গায়িত হইতে ছিল তাহাই অতৃপ্তনয়নে দেখিতে ছিলেন, এমন সময়ে সহসা রমণীর চক্ষু তদ্দিকে গেল, প্রথমে চমকিয়া উঠিল, পরে মৃদু হাসিয়া বলিল "কখন এলে?"

বামা। এই আসৃচি।

রমণী। কি দেখ্‌চ?

বামাচরণ। তোমায় দেখছি?

রমণী হাসিয়া কহিল "আমায় কি কখন দেখনি?"

বামাচরণ। যত দেখি ততই যেন নূতন শোভা দেখিতে পাই।

রমণী মৃদু হাসিয়া কহিল, "এখন খাবার দেব কি ?"

বামাচরণ। দাও, কদিন রাত্রে ঘুম হয় নাই· আজ সকাল সকাল আহার করে ঘুমুই—বিশেষতঃ বড় মাথা ধরেছে।

রমণী যেন চমকিয়া উঠিল, বলিল "অসুখ করেনি ত ?"

বামাচরণ। না !

রমণী আহার্য্য আনিয়া দিল, বামাচরণ বাবু আহারাদি করিয়া শয্যায় বসিয়া তামাকু খাইতে লাগিলেন। রমণী গৃহান্তরে আহার করিতে গেল। বামাচরণ বাবুর তামাকু খাওয়া শেষ হইলে হুঁকা রাখিয়া শয়ন করিলেন, কয়দিবসের সাতিশয় শ্রান্তি নিবন্ধন নিদ্রা আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার শ্রান্তি বিদূরিত করিতে কৃতযত্ন হইল।

আহারাদি ও গৃহকার্য্য সম্পন্ন হইলে রমণী সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল বামাচরণ অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিলেন, গৃহ মধ্যে একটী দীপ ধিকি ধিকি জ্বলিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত হইল, তথাপি রমণীর চক্ষে নিদ্রা নাই, থাকিয়া থাকিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছে। আজি কি রমণীর আনন্দ হইয়াছে বলিয়া চক্ষে নিদ্রা নাই ? না তাহা নহে। তবে কি চক্ষে নিদ্রা আসিতেছে না, না স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য রমণী চঞ্চল হইতেছেন ? না তাহাও নহে। রমণী বরং স্বামী যাহাতে গাঢ় নিদ্রাভিভূত হন, তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে বাতাস করিতেছেন।

রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে গৃহের দ্বারে "ঠুক ঠুক্" করিয়া কিসের শব্দ হইল, তখন রমণী সতর্কতার সহিত শয্যা হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া বাহিরে গেলেন। বহির্দ্দেশে একটী যুবক দণ্ডায়মান ছিল, যুবতী বাহিরে যাইবামাত্র উভয়ে উভয়ের বাহুপাশে আবদ্ধ হইলেন। ঘন ঘন চুম্বনে উভয়ের প্রণয়ের গভীরতা জ্ঞাপন করিল। হায়, স সারে কি সয়তানেরই বাস !

ক্ষণেক পরে রমণী যুবককে বলিলেন "এত মদ খেলে কোথা ?"

যুবক। গঙ্গাতীরে।

রমণী। এত খেলে কেন ?

যুবক। তোমার জন্য মন বড় খারাপ হতে লাগ্‌ল বলে।

রমণী। তবে আজ এস।

যুবক। এখনি !

রমণী। আবার টের পাবে।

যুবক। টের পেলেই বা, রমণী, তুমি আমায় ভালবাস না, আমি তোমার জন্য মরি, আর তুমি আমায় দেখ্‌তে পার না? আজ্‌ আমি মরব? তোমার সকল যন্ত্রণার অবসান কর্‌ব।

এই বলিয়া সজোরে ললাটে মুষ্ঠাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

রমণী "বালাই—চুপ কর" বলিয়া যুবককে আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন।

যুবক। না, তুমি আমায় ভালবাস না।

রমণী। তোমায় ভালবাসি কি না, তা তুমি কি জান্‌বে, ভালবাসা যদি দেখাবার হত তা হলে দেখাতাম।

যুবক। যদি ভালবাস তবে এখনি যেতে বল্‌লে কেন?

রমণী। কি জানি যদি টের পায়।

যুবক। পেলেই বা।

রমণী। দেখ, ও না জানায় আমাদের অসুখ কি, আমরা প্রতিদিন একত্রে থাকি। প্রতিদিন অতুল আনন্দ উপভোগ করি। ও কত কষ্ট করে টাকা উপার্জ্জন করে পাঠায়, আমরা উভয়ে খরচ করি। আর ও জোর পাঁচ সাত দিন আছে।

যুবক। বল কি? তুমি আমায় মেরে ফেল্‌তে চাও? আমি কি আত্মঘাতী হব না কি, রমণী—তোমাকে ছেড়ে পাঁচ সাত দিন থাক্‌তে পারবো? তুমি পার্‌বে? এই তুমি আমায় ভালবাস? এই তোমার ভালবাসা? তুমি না বল্‌তে আমি তোমায় এক দণ্ড না দেখে থাক্‌তে পারি না, রমণী! এই তোমার কথা?

রমণী নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। যুবকও কাঁদিতে লাগিল, অনেকক্ষণ পরে যুবক বলিল, "এবার কত টাকা এনেছ।"

রমণী। চার হাজার।

যুবক। আমায় দাও।

রমণী। সে ত তোমারি, ও গেলেই তোমায় দেব

যুবক। না আজই দাও।

রমণী। না আজ নয়, আমি তোমার গাছুঁয়ে দিব্বি কচ্চি যে ও যেদিন যাবে সেই দিনই দেব।

যুবক ক্ষণেক কি চিন্তা করিয়া বলিল "না রমণী আমি টাকা চাইনা, পরিহাস করছিলাম মাত্র। তুমি বড়, না টাকা বড় ?"

রমণী। তবে কি চাও।

যুবক। তোমায় চাই।

রমণী। আমি ত তোমারই।

যুবক। একেবারে চাই—আমি ও কণ্টক রাখিব না। রমণী, তুমি যদি আমায় ভালবাস তা হলে আমার কণ্টক শেষ কর,—যে টাকা আছে তাতে আমাদের এক রকম বেশ চলবে, আমরা কাশীতে গিয়ে থাকব।

রমণীর শরীর কণ্টকিত হইল, কোন উত্তর দিতে পারিল না।

যুবক আবার বলিল "রমণী কথা কহিতেছ না যে ? যদি আমার কথা না শুন তাহা হইলে আমি শপথ করছি যে তোমার সম্মুখে এখনি আত্মহত্যা করবো।"

রমণী। তা কিরূপে হয় ?

যুবক। কেন হয় না, এত নূতন ঘটনা নয়, আর ভালবাসায় কি না হয়, তুমি ত আমায় কতবার বলেছ যে ঐ একমাত্র আমাদের সুখের পথে কাঁটা, তবে কাঁটা সাফ করতে দোষ কি ?

রমণী। কি করে ?

যুবক। কেটে।

রমণী। পুলিস টের পেলে কি হবে ?

যুবক। পুলিস টের পেয়ে কি করবে, তুমি সকাল উঠে চীৎকার করে কাঁদবে, লোকে কিছু আর মনে করবে না যে তুমি তোমার স্বামীকে কেটেছ।

রমণী। আমি——

যুবক। তুমি নয় ত কে ?

রমণীর আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল, বলিল "আমি পারব না।"

যুবক। কেন পারবে না, খুব পারবে। আমি আলো ধরব আর তুমি কাটবে।

রমণী ধীরে জড়িত স্বরে কহিল,—"তা—"

যুবক তাহাতে বাধা দিয়া বলিল "তা—টা জানি না। হাঁ কি না বল, ও যদি আমার স্ত্রী হতো, আর তুমি যদি কাটতে বলতে তা হলে দেখতে এতক্ষণ সাফ্ হয়ে যেত। তোমার কাছে আবার আমার আছে কে ?"

রমণী অগত্যা বলিলেন "কি দিয়ে কাট্‌ব ?"

যুবক। বঁটী দিয়ে।

রমণী। বঁটী দিয়ে কাট্‌বে ?

যুবক। খুব কাট্‌বে, আর বঁটী কেন, সেদিন যে একটা ভোঁজালে কিনেছিলাম, সেটা কোথায় ?

রমণী। তা জানি না।

যুবক। জান না, আমায় প্রবঞ্চনা, না না তোমার কেটে কাজ নাই, আমার মরাই ভাল, ওর কণ্টক শেষ হোগ, তোমারও হোগ। ও কত টাকা দেয়, আমি ত পারি না, আমি কিসে তোমার মনের মত হব বল।

যুবক এই কথা বলিয়া গমনোদ্যত হইল, যুবতী বলিল "না না যেও না, আমার মাথা খাও, আমি এখনি ভোঁজালে আন্‌ছি।"

এই বলিয়া রন্ধন শালা হইতে ভোঁজালিয়া আনিয়া দিল, যুবক তাহাতে একবার ধার করিয়া লইয়া বলিল "এই নাও চল, খুব জোরে গলায় মারবে।"

যুবক ও যুবতী উভয়েই যে গৃহে বামাচরণ বাবু গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। যুবতী একবার স্বামীর প্রতি চাহিল, সেই মুহূর্ত্তে, সেই দণ্ডে, যেন তাহার হৃদয়ে বামাচরণের সমস্ত প্রেম ভালবাসা প্রভৃতি প্রতিভাত হইল। সেই অকৃত্রিম প্রেম, বাল্যের সেই বঞ্চনা পরিশূন্য ভালবাসা, সেই দেখিবার আকাঙ্ক্ষা, সেই আগ্রহ, সেই সমস্তই হৃদয় মধ্যে আবির্ভূত হইল। রমণীর হৃদয় যেন প্রেমবশে অভিভূত হইল, রমণী আবার যুবকের বদন প্রতি চাহিল, যুবক ভ্রূকুটী করিল, যুবতী অনন্যোপায় হইয়া যেন ভোঁজালয়া উত্তোলন করিয়া সেই এক দিনের—অতি যত্নের—অতি সাধের, অতি ভালবাসার—স্বামীর, ইহ-জীবনের লীলা সাঙ্গ করিতে কৃত নিশ্চয়!

বামাচরণ! এই সময় যদি তোমার নিদ্রাভঙ্গ হইত, তাহা হইলে সংসার বুঝিতে, যে স্ত্রীকে তোমার ইহ-জীবনের সমস্ত সুখের আকর বলিয়া জান, যে স্ত্রীর তুল্য পতিপ্রাণা স্ত্রী আর ইহ-জগতে নাই বলিয়া ধারণা আছে, একবার চক্ষু উন্মুক্ত কর, সকলি প্রত্যক্ষ দেখিবে। আঁর সাংসারিক মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকিও না, নিদ্রাঘোরে সময় কাটাইও না। তোমার জীবন শেষ প্রায়, আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব নাই।

কিন্তু ধন্য রমণী, ধন্য তোমার পতিপ্রেম, ধন্য তোমার সরলতা! যে এক দিন এই সংসারকে অমরাবতী বলিয়া প্রতীয়মান করাইয়াছিল, আজি আবার

তাহার এই কাজ!

রমণী যুবকের ভ্রূকুটিতে সকল মায়া মোহ ছেদ করিল, দুই হস্তে ভোঁজালিয়া উত্তোলন করিল,আর বিলম্ব নাই,স্বামী—ছিন্নকণ্ঠ ও রুধির ধারায় প্লাবিত হইয়া এখনি ইহলোক ত্যাগ করিবে। ডাকিনী প্রেতিনী নৃত্য করিতেছে, অট্টহাস্যে উত্তেজনা দিতেছে,দূরে—অন্তরীক্ষে কে যেন বলিতেছে "ভয় কি,কাটনা।" রমণীর চক্ষু ঘূর্ণায়মান, উন্মাদিনী ভাব, দেহে অসীম বল—স্বামীঘাতিনীর অসীম সাহস! আর কি?—যবনিকা পড়ে পড়ে—পরজন্মের অন্ধকারের আবরণ উন্মোচন হয় হয় হইয়াছে, এমন সময় খাটের নিম্ন হইতে একজন বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানি বাহির হইয়া তাহাদের দুই জনকেই দৃঢ়রূপে ধরিয়া "বাবু বাবু বাবু" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জ্ঞানের উন্মেষ।

বামাচরণ বাবু প্রগাঢ় নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন, সুতরাং দুই একবার ডাকিবামাত্র তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না, তিন চারিবার উচ্চৈস্বরে "বাবু বাবু" বলিয়া ডাকিবার পর তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি স্তম্ভিতের ন্যায় "অ্যাঁ—অ্যাঁ—বসন্ত—বসন্ত—কি—কি" বলিয়া উঠিলেন।

হিন্দুস্থানি বলিল "আগে একগাছি দড়ি দিন, পরে বলিতেছি।"

বামাচরণ বাবু এক গাছি দড়ি দিলেন, তাঁহার হৃদয় ভয়ানক ভাবে প্রকম্পিত হইতেছিল। হিন্দুস্থানি উত্তমরূপে বসন্তকে বান্ধিয়া একখানি বসন দ্বারা স্ত্রীলোকটীকে বন্ধন করিল, তাহার হস্তস্থিত ভোজালিয়া নামাইয়া রাখিল। রমণী যেন এতক্ষণ জ্ঞানশূন্যা হইয়াছিল, সে যে কিরূপ গুরুতর কার্য্য করিতে রত হইয়াছিল, তাহা এতক্ষণে বুঝিল।

লোকলজ্জা, স্নেহ, মায়া, ভালবাসা, যাহা এতক্ষণ কোথায় গিয়াছিল, আজি তাহা আবার নবীন বেশ ধারণ করিয়া রমণীর হৃদয়ে আগমন করিল! রমণী লজ্জায় অধোবদন হইল, তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বামাচরণ। ব্যাপার কি?

হিন্দুস্থানি "বলিতেছি"—বলিয়া স্ত্রীলোক ও যুবকটীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল "ইহাদিগকে চিনেন কি?"

বামাচরণ। চিনি—এটী আমার স্ত্রী, আর এটী আমার খুল্লতাত ভ্রাতার শ্যালক—বসন্ত।

হিন্দুস্থানি। না, এটী আপনার স্ত্রীরূপিণী রাক্ষসী, আর এটী আপনার স্ত্রীর জার!

বামাচরণ বাবু চমকিয়া উঠিলেন।

হিন্দুস্থানি বলিল "চমকিবেন না, অনেক কথা আছে শুনুন;—আপনি আমায় চিনিতে পারেন?"

বামাচরণ। বোধ হয় যেন কোথাও দেখিয়াছি।

হিন্দুস্থানি। আপনি যে দিন এলাহাবাদ কালেক্টরি হইতে চারি হাজার টাকা গণিয়া লন, তখন আমায় দেখিয়াছিলেন কি?

বামাচরণ। হাঁ দেখিয়াছি, বেশ স্মরণ হইতেছে।

হিন্দুস্থানি। বলিতে কি আপনার টাকাগুলির উপর আমার অত্যন্ত লোভ হইয়াছিল, আপনার নিকট হইতে টাকাগুলি আত্মসাৎ করিবার জন্য আমি বিব্রত হইয়া উঠি, কিন্তু কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। আপনি বাসায় গেলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, কিন্তু কোন সুযোগ পাইলাম না, আপনি বড় সতর্ক রহিলেন, পর দিবস আপনি বাটি আসিবেন, আমিও আপনার সহিত ষ্টেশনে গেলাম।

বামাচরণ। আপনি এক গাড়িতে আমার সহিত আসিয়াছিলেন না?

হিন্দুস্থানি। হাঁ বলিতেছি শুনুন;—দেখিলাম আপনি হুগলির টিকিট ক্রয় করিলেন, আমিও হুগলির টিকিট কিনিলাম। মনে করিলাম গাড়িতে আপনি ঘুমাইলে আপনার টাকাগুলি লইয়া পলাইব, আপনি বাক্স মধ্যে টাকাগুলি রাখিয়াছিলেন তাহা আমি দেখিয়াছিলাম। আপনি যে গাড়িতে উঠিয়াছিলেন, আমিও সুতরাং সেই গাড়িতে উঠি—কিন্তু আপনি বড় সতর্ক থাকায় সেখানেও কিছু করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ অপরাপর গাড়িতে লোক থাকায় আরও পারি নাই, নতুবা হয়ত আপনাকে হত্যা করিয়াও টাকাগুলি লইয়া পলাইতাম! ট্রেণের মধ্যে হত্যা করিলে কে বা আমায় ধরিত! যাহাই হউক, আমি অনন্যোপায় হইয়া আপনার সহিত হুগলীতে নামিলাম; দেখিলাম আপনি একটি ভাড়াটিয়া গাড়ি ভাড়া করিলেন. কিন্তু আমিত

আর সে গাড়িতে উঠিতে পারি না, সুতরাং দ্রুতপদে অগ্রগামী হইলাম, অনতিবিলম্বেই গাড়ি আমাকে অতিক্রম করিয়া গেল, আমিও গাড়ির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম। অবশেষে দেখিলাম, এই আপনার বাটি, আপনি গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন, আমি এই নিকটেই একটী দোকানে আহারাদি করিলাম। লোক পরম্পরায় জানিলাম যে, বাটীর মধ্যে আপনার স্ত্রী ও একটি দাসী ব্যতীত আর কেহ নাই।—আপনি সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে গেলেন, দাসী দোকানে গেল, আমি সেই অবসরে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তখন আপনার স্ত্রী রন্ধনশালায় থাকায়, আমায় দেখিতে পাইলেন না, আমি বরাবর আপনার শয়ন কক্ষে—এই ঘরে প্রবেশ করিয়া এই খাটের নিচেয় রহিলাম। ক্ষণেক পরে আপনি আসিলেন, ঘরে আলো আসিল, আমি দেখিলাম যে বাক্সটা সিন্দুকের উপর রহিয়াছে—বড়ই আনন্দ হইল, মনে করিলাম, আপনারা স্ত্রী পুরুষে নিদ্রা যাইলে, আমি বাক্সটা লইয়া পলাইব। আপনি আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন, শয়ন করিয়াই নিদ্রাগত হইলেন, ক্ষণেক পরে আপনার স্ত্রী আসিয়া আপনার পার্শ্বে শয়ন করিল।

বসন্ত রমণীর যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, হিন্দুস্থানি আভাসে তাহার অনেক বুঝিতে পারিয়াছিল, ক্রমে আনুপূর্ব্বিক সে সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিল "এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত উদাস হইল, পরে দেখিলাম যে প্রকৃতই এই পাষণ্ড যুবক আলোক ধরিয়াছে, এবং এই সয়তানী দুই হস্তে সজোরে শাণিত ভোজালিয়া উত্তোলন করিয়াছে, তখন আমার মনে হইল "তবে আর কেন? কাহার জন্য টাকা—এইত সংসার—ইহার জন্য এত!" এই ভাবিয়া আমি আর থাকিতে পারিলাম না, ইহাদের উভয়কে দৃঢ়রূপে ধৃত করিয়া আপনাকে উঠাইয়াছি। এখন যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সংসার না নরক?

বামাচরণ বাবু অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন, তাঁহার হৃদয় মধ্যে যে কি ভয়ঙ্কর শোক তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইতেছিল, তাহা বর্ণন করা যায়না। তিনি মনে মনে কত আশায় হৃদয়কে উন্নত ও আশান্বিত করিয়াছিলেন,

আজি সে সমস্ত ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল,—সে যাতনা, সে অসীম যাতনা, তাঁহার হৃদয়কে যে কতদূর ব্যথিত করিতেছিল, তাহা বলা যায় না। এক একবার রমণীর মুখাবলোকন করিয়া তাঁহার হৃদয় রাগে জ্বলিয়া উঠিতেছিল, আবার তখনই শোকে তাপে জর্জ্জরিত হইতেছিল, হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

বামাচরণ সজল চক্ষে বলিলেন "রমণী! তোমার প্রতি আমার অচল ভালবাসা ছিল,—রমণী কূলের প্রতি প্রবল ভক্তি ছিল, আজ তুমি তাহা তিরো-হিত করিলে। আমি উন্মত্তের ন্যায় তোমায় ভাল বাসিতাম, মনে মনে পূজা করিতাম, কত আশা করিতাম, কিন্তু সে সকল আজি স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। রমণী! তুমি আজি ইচ্ছা করিয়া আমার জীবনের সকল সুখ নষ্ট করিলে, আমায় অকূল দুঃখ সাগরে ভাসাইলে।"

বামাচরণ আর কথা কহিতে পারিলেন না, নিরবে কাঁদিতে লাগিলেন, রমণীও আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগিল। হিন্দুস্থানি রাগভরে বসন্তকে একটী চপেটাঘাত করিতে উদ্যত হইল। বামাচরণ তাহা নিষেধ করিয়া কহিলেন—"উহাকে মারিবেন না, মারিয়া ফল নাই। বসন্ত! তুমি আমার হৃদয়ে যে অনল কুণ্ড জ্বালিয়া দিয়াছ, তাহা আর বলিবার নহে, যদি হৃদয় দেখাইবার হইত, তাহা হইলে দেখাইতাম যে সেখানে কি প্রবল বেগে হু হু করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে—অনন্ত মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপ তাহাতে বর্ত্তমান! প্রাণ পুড়িয়া খাঁক হইয়া যাইতেছে! কিন্তু ঈশ্বর কি নাই, দুস্কৃতি সুকৃতির ফলভোগ কি করিতে হয় না?"

রমণীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন "তোমায় আর কি বলিব, আমি যেমন প্রশান্ত প্রাণে তোমায় ভাল বাসিয়া ছিলাম, তাহার বেশ প্রতিফল দিয়াছ, তোমায় আমি কিছু বলিলাম না, কিন্তু রমণী! ঈশ্বরের নিকট হইতেও কি পরিত্রাণ পাইবে, তাঁহার চক্ষেও কি ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিবে?"

রমণী নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া স্থির দৃষ্টে বসন্তের দিকে তাকাইয়া রহিল, একটী কথাও কহিল না। কিন্তু আমরা জানি যে, অনুশোচনা ও বিবেক তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল, তাহার নিকট বামাচরণের যাতনা সমধিক নহে। ঈশ্বর বুঝি রমণীকে ঘোর শাস্তি দিলেন, পৃথিবীতে নরক যাতনা দেখাইলেন, —বস্তুতঃ অনুশোচনার তুল্য গুরুতর শাস্তি ইহ জগতে আর কি আছে?

হিন্দুস্থানি বলিল "বাবু আপনি কি বলিতেছেন, পুলিস ডাকুন।"

বামাচরণ। পুলিস ডাকিয়া কি করিব, সেই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট যেরূপ তুলাদণ্ডে বিচার হইবে, পুলিস কি তাহা পারিবে? আমার যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, যাহা না হইবার তাহাও হইয়াছে, আর কেন? এখন আমার যেখানে ইচ্ছা সেই স্থানে যাইব। সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধ্যান পরায়ণ হইয়া অন্তিমের কার্য্য করিব। আর কেন এ সংসার মায়ায় মুগ্ধ হইব, ইহা কি সংসার না নরক!

হিন্দুস্থানি। তাহাও কি হয়, এরূপ নরহত্যাকারী ঘোর বিশ্বাসঘাতক পাপীদিগকে কি ছাড়িয়া দিতে আছে, আমি পুলিস ডাকি।

এই সময়ে পুলিস ইন্সপেক্টর ও দুই জন প্রহরী রাউণ্ডে বাহির হইয়াছিলেন। গোলমাল শুনিয়া তাঁহারা দ্বারদেশ হইতে সমস্ত কথা শুনিতে ছিলেন, পুলিস ডাকিতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া বলিলেন "দরজা খোল।"

হিন্দুস্থানি বলিল "কে?"

উত্তর- "পুলিস।"

হিন্দুস্থানি স্বয়ং দ্বার খুলিয়া দিল, পুলিস জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি?"

হিন্দুস্থানি আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিল।

ইন্সপেক্টর বাবু বলিলেন "স্ত্রীলোকটীর বন্ধন খুলিয়া দাও, আমি উহাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব?"

একজন কনষ্টেবল রমণীর বন্ধন উন্মুক্ত করিবামাত্র, রমণী ভোজালিয়া খানি লইয়া সজোরে বসন্তকে আঘাত করিল; এক আঘাতেই বসন্তের ইহসংসারের সকল কার্য্য শেষ হইল। সকলে তাঁহাকে ধরিতে না ধরিতে সে সজোরে আবার সেই ভোজালিয়া দ্বারা আপন বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। প্রবল রক্ত প্রবাহ হইতে লাগিল, পুলিস, আহত দুই জনকেই হাঁসপাতালে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কোন ফল দর্শিল না, উভয়েরই কিয়ৎক্ষণ পরে ভবলীলা সাঙ্গ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

পুলিসের কার্য্য শেষ হইল,—অনন্তধামে অপরাধীদিগের বিচার হইবে। অনেক গুরুতর পাপ করিয়া এ সংসার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেখান হইতে অব্যাহতি পাইবার কোন উপায় নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট হিন্দুস্থানির এজাহার লই
তাহার অভিসন্ধি ভাল ছিল না, ত
করিয়াছে বলিয়া কোন শাস্তি পাইল ন

বসন্ত রমণীর হস্তে শাস্তি পাইল,
তর শাস্তি পায় নাই, তাহা কে বলিবে ?

বামাচরণ বাবু হিন্দুস্থানিকে অতি য
করিলেন। তাঁহার যে কিছু টাকা কড়ি
"আমি যাহা তোমায় দিতেছি তাহা অ
করিয়াছ, তাহার নিকট এ পুরস্কার কিছু

হিন্দুস্থানি বলিল "ভাই তোমার অব
হইয়াছে, আর আমার কিছুতেই স্পৃহা
এক কপর্দ্দকও লইব না,—সংসারের গ
পরলোকের পথে কাঁটা দি কেন? এ
শতাংশে শ্রেয়।"

বামাচরণ অনেক জিদ করিলেন, কি
পীড়াপীড়ির পর একশত টাকা মাত্র লই

বামাচরণ বাবু তাঁহার বাটী ইত্যাদি
পশ্চিম যাত্রা করিলেন। একবার
যাইবেন না, ভয়—পাছে গোলাপ আবা
কি রমণীতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হই
সেই মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইতে হইবে
তাহাকে দেখিলেত ক্ষতি নাই।"

আশা তুমিই ধন্য !

সমা